



আহি লাড কুরআন



মুহাম্মাদ আতিক উল্লাহ

আই লাভ কুরআন

রচনা

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

হাফিজ

I LOVE QURAN



যখনই কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে বসতাম, তিনি চুপটি করে শুনতেন। কুরআন কারীমের প্রতি তাঁর অপরিসীম মহকাত ছিলো। একবার আবেগের বশে ঘোষণা দিয়েছিলেন, হিফযের খতম শেষ করতে পারলে, মোটর সাইকেল কিনে দেবেন। খুশিমনে দ্রুত খতম শেষ করতে উঠেপড়ে লেগেছিলাম। এমন সময় খতম শেষ হলো, যখন তার একটুও আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না। এ-নিয়ে সেই ছোট বয়েসেও মনের কোথাও বিন্দুমাত্র হাশ্বাকার ছিল না। ওটা ছিল কুরআনের প্রতি ভালোবাসায় আপ্ত এক গরীব পিতার আবেগ-থরথর উক্তি! একজন কুরআনে হাফেযের পরিতৃপ্ত পিতা হতে চাওয়া মানুষের ব্যাকুল মনের আকুল উক্তি!

এক ঈদী সকালে, ঈদের জামাতের পর, ক্বারী আবদুল বাসেত রহ.-এর কেরাত শুনছি। সেই প্রাচীনকালের তিন ব্যাটারির ফিলিপস টেপরেকর্ডারে। সূরা তাকভীর তিলাওয়াত করছিলেন তিনি। ছোটবোন হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, আবু কাঁদছেন! বিচলিত হয়ে আবুর কাছে ছুটে গেলাম। ঈদের দিন পিতার কান্না সন্তানের জন্যে মোটেও সুখকর বিষয় নয়। না, অন্য কিছু নয়, কুরআন কারীমের তেলাওয়াত শুনে কাঁদছেন। শুধু কান্না বললে, পুরোটা বলা হয় না, তিনি আসলে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। মাঝেমধ্যে হেঁচকিও উঠছিল।

কুরআন কারীম শুনে কেউ কাঁদে, তাও এভাবে আকুল হয়ে, সেটা আবুকে দেখেই প্রথম জানলাম। দৃশ্যটা সারাজীবনের জন্যে হৃদয়পটে আঁকা হয়ে গেলো।

আব্বার কথা মনে পড়লেই সূরা তাকভীর শুন। হব্ব সেই কেরাত। পাখরদিল সহজে নরম হতে চায় না। তবুও কেন যেন দু'চোখ ভিজে ওঠে। বাবার স্মৃতি? কুরআন কারীমের প্রভাব?

বাবার নেক সন্তান হতে পারিনি। কুরআন কারীম হিফয করলেও, আখেরাতে সুপারিশ করতে পারার মতো আমল নেই। রাব্ব কারীম আব্বাকে জান্নাতবাসী করবেন, এটাই জীবনের পরম চাওয়া। তারপরও যদি সন্তান হিশেবে সুপারিশ করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতাম, ভালো লাগত। আমলের দরজা দিয়ে এই যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। একটা পথই বাকী থাকে: শাহাদাহ। স্বীনের পতাকাকে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্যে, কুফরের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় রক্তাক্ত শাহাদাহ। রাব্ব কারীমের কাছে, কায়মনোবাক্যে কুফরের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত শাহাদাহ তলব করছি। সবার মাতা-পিতার জন্যে জান্নাত ও 'হাসানাহ' কামনা করছি আমি।

বিসমিল্লাহ।

প্রথমেই একটা কথা বলে নেই, আমাদের এই সংকলন সবার জন্যে নয়। যারা কুরআন কারীম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন, জানাশোনা রাখেন, তারা এই সংকলনে নতুন কিছু পাবেন না। মুহতারাম আলিমগণেরও এই সংকলনে পাওয়ার মতো নতুন কোনও ইলম নেই। এই সংকলন শুধুই আমি ও আমার মতো, যাদের কুরআন কারীম নিয়ে জানাশোনা-পড়াশোনা কম, তাদের জন্যে। এই সংকলনে অভিনব কিছু নেই। নিজস্ব কোনও উদ্ভাবন বা গবেষণাও নেই। গভীর কোনও তত্ত্ব-তালাশও নেই। পুরো বইয়ের প্রায় সব লেখাই এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে নেয়া। আমরা চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে। তারপরও ভুল থেকে গেলে, সেটা আমাদের কুড়িয়ে নেয়ার অযোগ্যতা। আমাদের মনের সুগু বাসনা, এই 'কুরআনিয়্যাত' সিরিজের বইগুলো পড়ে কুরআনবিমুখ মানুষ হয়তো একটু হলেও কুরআনের প্রতি আগ্রহী হবে। কৌতূহলী হবে। হয়তো হেদায়াতের উসীলাও হয়ে যাবে! হতে পারে বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত মানুষগুলোর নাজাতের উপায়!

নিজের যোগ্যতার কথা বলে বেড়ানোতে লজ্জার বিষয় থাকতে পারে। নিজের ভালোবাসার কথা বলে বেড়ানোতে কোনও লজ্জা নেই। আমরা সুযোগ পেলেই কুরআন কারীমের প্রতি ভালোবাসার কথা বলি। 'কুরআন কারীমের প্রতি সীমাহীন দুর্বলতার কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করি। তবে কথা আছে, ভালোবাসার কিছু দাবী থাকে। কুরআন কারীমকে ভালোবাসলে, আমার প্রতি কুরআন কারীমের কিছু দাবী থাকবে। আমি কি সেই দাবী আদায় করি? দাবীগুলো কি, সেটাও কি জানি? না জেনে থাকলে, জানার চেষ্টা করি? অক্ষম অকার্যকর ফলাফলহীন ভালোবাসার কোনও মূল্য আছে?

এ-বইয়ে অসংখ্য আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা আয়াতগুলো তরজমা করিনি। আমরা প্রয়োজনে শুধু ভাবটা লিখেছি। ভাব লেখার সময় আমরা সাধারণত 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' রেখেছি। আবারও বলি, আমরা নিজেরা কোথাও আয়াত ও হাদীস শরীফের তরজমা করিনি। করার কথা ভাবিওনি। আমাদের সে যোগ্যতাও নেই। তাই বইয়ের যত জায়গায় আরবী আয়াতের পর, তরজমার মত বাঙলা লেখা দেয়া হয়েছে, সেগুলো মূলত তরজমা নয়, মর্মকথা।

কুরআন কারীম বিষয়ক লেখা মানেই গম্ভীর গবেষণামূলক কিছু, এমন একটা চিন্তা আমাদের কারো কারো মধ্যে বিরাজ করে। এটা গবেষক বা অভিজ্ঞজনের ক্ষেত্রে প্রজোয়া হতে পারে। আমরা যারা ছোট, স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী, তাদের লেখাও কি গুরুগম্ভীর বা জ্ঞানগর্ভ হবে? উহু না। আমরা যেমন সাধারণ, আমাদের কথা বা কাজও হবে সাধারণ। সহজ। সরল। প্রশ্ন উঠতে পারে, -অসাধারণ কুরআন কারীমকে সাধারণ হালকা ভঙ্গিতে প্রকাশ করা কি ঠিক? বেয়াদবি হয়ে যায় না?

-হালকা মানে তুচ্ছ নয়। হালকা মানে কঠিন ভাব ও ভঙ্গি বর্জিত বোঝাতে চেয়েছি। গুরুগম্ভীর একাডেমিক কেতা অনুসরণ করে কুরআন কারীম সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের মতো সাধারণ কিছু পাঠক গুরুগম্ভীর ভঙ্গির লেখা পড়তেও আগ্রহী নন। তাদের কী হবে? আমরা তাদের কথা চিন্তা করেই কিছু কথা বলতে আগ্রহী হয়েছি। বড় ভয়ে ভয়ে কথা বলেছি। পাছে কোনও কথা যদি সালাফ ও খাইরে কুর্রনের বিপরীত হয়ে যায়?

এক সময় গল্প-উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই পড়তে ইচ্ছা করত না। তবে এখন (আলহামদুলিল্লাহ!) কুরআন কারীমের তাদাক্বুর পেলে, গল্প-উপন্যাসের চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আবার সব তাদাক্বুর পড়তে ইচ্ছে করে না। চিন্তা করে দেখেছি, বিশেষ ধরনের তাদাক্বুর পড়তে ভাল লাগে। বিশেষ তাদাক্বুর মানে?

ক. সহজ সরল ভঙ্গিতে কুরআন কারীমের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

খ. জটিল কোনও আলোচনা নেই, ব্যাকরণ-বালাগাত নেই। শুধু শিক্ষাটা বলা হয়েছে।

গ. লম্বা-চওড়া কোনও আলোচনা নয়। কয়েক লাইনেই কথা শেষ করে দেয়া হয়েছে।

ঘ. তাদাক্বুরটা জীবনঘনিষ্ঠ। অলীক কোনও তাত্ত্বিক দুর্বোধ্য আলোচনা নয়।

ঙ. তাদাক্বুরটা নির্ভরযোগ্য কোনও আলেমের কলম বা মুখ থেকে বের হয়েছে।

আপাতত আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছি, তা তুলে আনতে গেলে, কুরআনিয়াত সিরিজের ব্যাণ্ডিটা দশ খণ্ড পর্যন্ত যেতে পারে। রাব্বের কারীম তাওফীক দিলে আরও বাড়তে পারে। আমরা পরিষ্কার করে বলে রাখতে চাই, আমাদের এই সিরিজটা কোনও তাফসীর নয়। এই বইয়ের কোনও লেখাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এ-বই রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মানে উত্তীর্ণ নয়। এ-বইয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণও ইলম ও আমলে শতভাগ গ্রাহ্য নন।

আমরা পুরো বইয়ের কোনও লেখাতেই সূত্র উল্লেখ করিনি। আসলে করতে চাইনি। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করার কারণে সূত্রের কথা মনেও ছিল না। এটা নিছক ঘরোয়া ভঙ্গির কথোপকথনের লিখিত রূপ। বইটা আমরা অভিজ্ঞজনকে দেখিয়েছি। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কেউ ধরিয়ে দিলে, কৃতজ্ঞ থাকব। কিছু লেখা দেখে মনে হবে, এসব আমাদের চিন্তা বা মেধার বদৌলতে হয়েছে। জি না, এই বইয়ে, কুরআন কারীমের যা কিছু আছে, বেশিরভাগই সংগ্রহ করা। আমরা শুধু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি।

আমাদের এই সংকলন সাহিত্যচর্চারও অংশ নয়। সাহিত্যচর্চা করতে গেলে যোগ্যতা লাগে। আমাদের সে যোগ্যতা নেই। এই সংকলনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল, কুরআন কারীমের সাথে আমাদের মাদরাসার তালিবে ইলমদের পরিচয় করে দেয়া। একজন ওস্তাদ বা পিতা, শিক্ষাদীক্ষায় অন্যদের তুলনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারেন। কিন্তু শিষ্যের প্রতি, সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ ও স্নেহ-মমতায় খুব একটা পিছিয়ে থাকেন না। আমরাও চেষ্টা করি, যোগ্যতায় না হলেও, দায়িত্ববোধ ও মমত্ববোধে যেন পিছিয়ে না পড়ি। আমরা চাই, আমাদের ছাত্ররা, সন্তানেরা কুরআন কারীমের ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠুক। এ-তাকিদকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রয়াস। এই ফাঁকে কুরআন কারীমের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কয়েকটা কথা বলে নিই!

আশ'আরী ঘরানা!

এক আলিমের স্মৃতিচারণ।

ঘটনা প্রায় পনের বছর আগের। এক আত্মীয় বেড়াতে এলেন। দু'জন মিলে কথা বলছি। তিনি একটা গল্প শোনালেন। তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। শুনেছি সেই কবে, এত বছর পরও কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই ঘটনাটা মনে পড়ে,

-আমি প্রতি বছর কিছুদিনের জন্যে, শহর ছেড়ে দূরের এক পল্লী এলাকায় চলে যেতাম। উদ্দেশ্য ছুটি কাটানো। সেখানে জায়গা কিনে মনোরম এক ভিলা বানিয়ে রেখেছি। নিরিবিলি এলাকা। শহরে কোলাহলমুক্ত। নির্বাঞ্ছাট নিস্তরঙ্গ জীবন। ব্যস্তসমস্ত 'লাইফ' ছেড়ে এখানে এসে কয়েকটা দিন থাকতে, বেশ লাগত। ভিলার অদূরে স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকটা বাড়ি আছে। ছোট্ট একটা মসজিদও আছে। এখানে এলে ঘর ছেড়ে বড় একটা বের হতাম না। মসজিদেও যাওয়া হত না।

সেবার অবকাশাপেক্ষে গেলাম। ঘুমুতে ঘুমুতে অনেক রাত হয়ে গেল। শুয়েও ঘুম আসছিল না। এপাশ-ওপাশ করে সময় রাতের নিরব প্রহরগুলো কেটে যাচ্ছে। রুমের আবহাওয়া কেমন গুমোট আর ভ্যাপসা মনে হতে লাগল। এসি বন্ধ করে, জানালা খুলে দিলাম। চারদিক অন্ধকার। দূর থেকে ক্ষীণ এক আওয়াজ ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। কেউ একজন কান্দছে। মানুষটা কি বিপদে পড়েছে? দ্রুত ছাদে গেলাম। আওয়াজ আরও পরিষ্কার, একজন কুরআন কারীম পড়ছে। বৃদ্ধ মানুষ। গ্রামীণ ঢঙে তিলাওয়াত করছে। অদূরের মসজিদ থেকেই মন কেমন করা আওয়াজটা ইথারে ভেসে আসছে। প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে। উচ্চারণে ভুল থাকলেও, বৃদ্ধ মানুষটা অত্যন্ত দরদ নিয়ে পড়ছে। কান্নার সুরে। একটানা। ভেঙে ভেঙে। শুনতে থাকলাম। সময় পেরিয়ে যেতে লাগল। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে তার তেলাওয়াত শেষ হল।

সারাদিন এটাসেটা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটালেও, মনের গহীনে কিছু একটার অধীর প্রতীক্ষা ছিল। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কেন মনটা উদাসী হয়ে আছে! মনটা কিসের অভাব বোধ করছে? খোঁজাখুঁজি করলাম। কিছুতেই মনে পড়ল না। মনোভাবনার সুলুকসন্ধানেই দিন কেটে রাত ঘনাল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শোয়ার আয়োজন করতে গিয়েই চট করে মনে পড়ে গেল, গত রাতের অপূর্ব সুরের কথা। নিরব সুনসান নিস্তব্ধ রাতের অপার্থিব মূর্ছনার কথা। ও আচ্ছা! মন আমার ভেতরে ভেতরে কুরআনী সুরের প্রতীক্ষায় ছিল? ঘুম আর এল না। শুরু হল প্রতীক্ষা। কখন রাতের তৃতীয় যাম আসবে আর আমি সেই অচীন সুরে আচ্ছন্ন হবো!

ঠিক করলাম বাড়ির ছাদ নয়, সরাসরি মসজিদের কাছাকাছি গিয়ে তাকে দেখব। চিন্তা এল, আজ কি তিনি তিলাওয়াত করবেন নাকি গতকালই শুধু কোনও কারণে তিলাওয়াত করেছিলেন? এটা কি তার নিয়মিত অভ্যেস নাকি অনিয়মিত? অপেক্ষার পালা শেষ। কানে ভেসে এল সেই হৃদয় শীতল করা 'নাগমা'। লাহান। তারতীল।

ত্রস্তপদে চুপিচুপি কাছে গেলাম। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধ, মসজিদের বারান্দায়, খোলা আকাশের নিচে, লাখো তারার টিমটিমে আলো আঁধারিতে, মৃদুমন্দ হাওয়ায়, আত্মগম্ব হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করছেন। কিছুক্ষণ পরপর দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন। মনে হচ্ছে বেশি সূরা মুখস্থ নেই। ঘুরে ফিরে কয়েকটা সূরাই পড়ছেন। যা হোক, তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম সেই সুর। এরপর থেকে প্রতি রাতে তার কেরাত শোনা আমার কেমন

যেন নেশায় পরিণত হয়েছিল। শহরে চলে এলেও সুযোগ হলেই ছুটে যেতাম সেই সুরের দুর্নিবার টানে। এমন রুহানি তিলাওয়াত আর কোথাও শুনি নি। তার কিরাতে তাজভীদ ছিল না, তবে ভালোবাসা ছিল। ভক্তি ছিল। গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একীন ছিল। নূর ছিল।

কুরআন কারীম এক অফুরন্ত শক্তির আধার। কুরআন কারীমের তিলাওয়াতে, শ্রবণে, তাদাব্বুরে অকল্পনীয় শক্তি অর্জিত হয় কলবে। কুরআন কারীম দ্বারা যে কেউ প্রভাবিত হয়। মুমিন ও কাফির সবাই। ঘটনাটা শোনার পর আরেকটা বিষয় মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছে,

দিনের চেয়ে রাতের বেলা কুরআন কারীম তুলনামূলক বেশি প্রভাববিস্তারী। রাতের প্রথম ভাগের চেয়ে রাতের শেষ আরও বেশি প্রভাববিস্তারী। রাতের নিরবতা কুরআন কারীমের তিলাওয়াত ও শ্রবণে নিয়ে আসে ভিন্ন মাত্রা। অন্য এক জান্নাতী আমেজ। বান্দার মধ্যে সৃষ্টি করে আখেরাতী আবহ। তিলাওয়াতকারীকে একটানে নিয়ে যায় ভিন্ন জগতে। একটি আয়াতে রাব্বের কারীম এদিকেই বোধ হয় ইঙ্গিত করেছেন,

إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমন যা কঠিনভাবে প্রবৃত্তি দলন করে
এবং যা কথা বলার পক্ষে উত্তম। (মুযযামিল ৬)

সেই কুরআনি বৃদ্ধ মারা গেছেন অনেক আগে। তার গল্প এখন মনে পড়ার উপলক্ষ্য কি? বুখারি শরীফ পড়ছিলাম। একটা হাদীস পড়তে গিয়ে বৃদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাই যেন বুখারিতে অন্যভাবে বিমূর্ত হয়ে আছে! হাদীসটা এই,

إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفَقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ
مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ تَزَلُّوا
بِالنَّهَارِ

নবীজি সা বলেছেন, রাত নামলে, আশ'আরীদের কুরআন কারীম পড়ার সুমিষ্ট স্বর থেকে, আমি তাদের ঘরবাড়ি অন্ধকারেই চিনতে পারি। দিনের বেলা আর তাদের বাড়ির সঠিক অবস্থান ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারি না। (আবু মুসা আশ'আরী রা. বুখারি)

রাত গভীর হলে, মদীনায় বসবাসরত, ইয়ামানের আশ'আরী কবীলার লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করত। তাদের তিলাওয়াতের সমধুর ধ্বনি নবীজি সা.-কে মুগ্ধ করত। আঁধার সত্ত্বেও আশ'আরীদের ঘরবাড়ি চিনে ফেলতেন। নবীজি কুরআনের সুরে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। পবিত্র তারতীল (ধীরস্থির তিলাওয়াত)

তাকে মুক্ত করত। তিনি আদর করে তাদের পাড়ার নামই দিয়ে ফেলেছেন 'আশ'আরীদের বাড়ি'।

নবীজির কথা থেকে কেমন যেন ভালোবাসামাখা উষ্ণতা বারে পড়া অনুভূত হয় না? সেই কুরআনি বাড়িগুলোর প্রতি নবীজির কেমন দরদমাখা আকৃতিও চুইয়ে চুইয়ে পড়ে না? দিনে চিনতে না পারলেও, তিনি রাতের বেলা কুরআনি 'লাহন' বেয়ে ঠিক হৃদিস বের করে ফেলতে পারতেন!

দৃশ্যটা কল্পনা করতেই কেমন রোমাঞ্চ অনুভব হয়। মদীনায় আঁধার নেমে এসেছে। ঈশার সালাত শেষ। যে যার বাড়িতে গিয়ে বিশ্বামের আয়োজনে ব্যস্ত। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। জীবনের কোলাহল আস্তে আস্তে থেমে আসছে। নির্দিষ্ট একটা পাড়ায় অন্য রকম জীবনের আয়োজন শুরু হতে চলেছে। রাত যত গভীর হচ্ছে, তাদের প্রস্তুতি বেগবান হচ্ছে। এক বাড়ি দু'বাড়ি থেকে তারতীলের পবিত্র ধ্বনি বেরোতে শুরু করেছে। মৌমাছি যেমন ফুলের সৌরভে মধু আহরণে উড়ে আসে, আঁধার রাতের চাদর গায়ে জড়িয়ে একটি একজন মানুষ ধীরপায়ে এই পাড়ার দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের অপার্থিব সুর শুনছেন।

তাদের এই কুরআনি আয়োজন, নবীজিকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল, তিনি দিনের বেলা ভর মজলিসেও তার আলোচনা টেনে এনেছেন। মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। আহা, কত বড় সৌভাগ্যবান সেই আশ'আরী সাহাবীগণ! তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে খুশি করতে পেরেছেন। তিলাওয়াত দিয়ে নবীজিকে তাদের কাছে টেনে আনতে পেরেছেন। তাদেরকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছা করে। বড্ড জানতে ইচ্ছে করে, তাদের রাত্রিকালীন তিলাওয়াতে কী এমন বিশেষ উপাদান ছিল, যা আল্লাহর রাসূলকে আকৃষ্ট করেছে? তারা তাদের তিলাওয়াতে কী মেশাতেন? সুর? তাদাব্বুর? তাকওয়া? আল্লাহর ভালোবাসা? নবীজির ভালোবাসা?

সুন্দর গল্প শেষ হওয়ার পরও, শ্রোতা বলে ওঠে, উমম! তারপর? তারপর? আমারও বলতে ইচ্ছে করছে, তারপর কী হল? তারা নবীজির কথা শুনে, প্রশংসা শুনে, কতটা খুশি হয়েছিলেন? কেমন বাগবাগ হয়ে উঠেছিলেন? নবীজি কি ভালো লাগাটা জানানোর পরও নিয়মিত কুরআন পাড়ায় যেতেন? নবীজির প্রশংসা শুনে মদীনায় বসবাসরত অন্যদেশী ঘরানাগুলোতেও কি আশ'আরীদের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল? জান্নাতি প্রতিযোগিতা? তাদের তিলাওয়াত শুনেও কি নবীজি রাতের বেলা বের হতেন? তাদের তিলাওয়াত আশ'আরীদের মতো তাকে মুগ্ধ করত? হাদীসের বিশাল ভান্ডারে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাইনি। অভূতি রয়েই গেল।

নবীজি দিনের বেলা কুরআন শিক্ষা দিতেন। নিজে তিলাওয়াত করতেন। অন্যদের তিলাওয়াত শুনতেন। তারপরও রাতের বেলা কে কোথায় তিলাওয়াত করছে, সেদিকে নজর রাখতেন। রাতের বেলার তিলাওয়াতে কি তবে বিশেষ কিছু আছে? বিশেষ কোনও আবেদন অনুভব করতেন? বিশেষ কোনও ভালোলাগা ছিল নবীজির? উত্তর জানা নেই। তবুও বলতে ইচ্ছা করছে, রাতের বেলা কুরআন আলাদা ব্যঞ্জন নিয়ে হাজির হয়। মেঘলা দিন অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন মাত্রা রাখে। আলাদা একটা ভাবের সৃষ্টি করে। কবিদের মনে দোলা দেয়। রাতটাও 'আশ'আরী'দের মনকে নবদোলায় আন্দোলিত করে। এ-মর্মে হাদীসে আরেকটি ঘটনা আছে। মেঘলা দিনে আকাশ থেকে বাদল ঝরে। রাতের তিলাওয়াতেও কি পেঁজা তুলার মতো আকাশ থেকে রহমত ঝরে?

আরেক রাতে নবীজি রাতের বেলা আবু মুসা আশ'আরি রা.-এর তিলাওয়াত শুনেছিলেন। দিনে নিজের ভালোলাগা জানাতে গিয়ে বলেছেন,

لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتُ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ
آلِ دَاوُدَ

(আবু মুসা!) তুমি যদি গতরাতে আমাকে তোমার তিলাওয়াত শুনতে দেখতে (তাহলে তোমার কেমন লাগত বলতো). তোমাকে দাউদী সুর থেকে কিছুটা দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

নবীজির এমন অকল্পনীয় প্রশংসা শুনে, আবু মুসা রা.-এর অনুভূতি কেমন হয়েছিল? তিনি তিলাওয়াত আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন? পরের রাত থেকে আরও বেশি সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করতেন? আরও বেশি মমতা দিয়ে তিলাওয়াত করতেন? সাধ্যের সবটুকু ঢেলে? তিলাওয়াতের সময় কি তার মনের জাগরুক থাকত, নবীজি হয়তো তার তেলাওয়াত শুনছেন?

নবীজি নিজে তিলাওয়াত করতে পেরেও অন্যের তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। শুধু তাই নয়, অন্যের তিলাওয়াত শোনার জন্যে রাতের আঁধারে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। খুঁজে খুঁজে বের করতেন, কোন ঘর থেকে তিলাওয়াতের সুমধুর সুর ভেসে আসছে! কেন? তিনি নিজের ঘরে অবস্থান করে তিলাওয়াত করলেন না? তার মানে কি, রাতের বেলা অন্যের তিলাওয়াত শুনতে বেশি ভালো লাগে? নাকি মাঝেমধ্যে বের হতেন? এমনটাই হবে। তবে এটা বলতেই হবে, রাতের তিলাওয়াতে, বিশেষ করে রাতের তৃতীয় যামের তিলাওয়াতে জান্নাতি আমেজ থাকে। এই আমেজে শুধু মানুষ নয়, ফিরিশতা পর্যন্ত আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. রাতের বেলা সূরা বাকার তিলাওয়াত করছিলেন। পাশেই তার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটা (جَالَتْ) ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে অস্থির আচরণ করতে শুরু করল। উসাইদ তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন। ঘোড়াটা শান্ত হয়ে গেল। আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন, ঘোড়াটা আগের মতো আচরণ করল। পড়া বন্ধ করলেন, ঘোড়া শান্ত হল। আবারও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অদূরেই ছেলে ইয়াহয়া ছিল। আশংকা হল ঘোড়া ছেলেকে মাড়িয়ে দেবে। ছেলেকে টেনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে, আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘের মতো কিছু একটা দেখলেন, সে মেঘের মধ্যে বাতির মতো কিছু ছিল। আরো ভালো করে দেখার জন্যে, বাইরে এলেন, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন না। পরদিন সকালে নবীজিকে ঘটনা খুলে বললেন। নবীজি ঘটনা শুনে বললেন,

-তুমি কি জানো ওটা কি ছিল?

-জি না।

-তারা ছিল ফিরিশতামণ্ডলী। তোমার তিলাওয়াত শুনে কাছে এসেছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত করতে থাকতে, তারাও সকাল পর্যন্ত সকাল পর্যন্ত থেকে যেত, অদৃশ্য হতে পারত না। লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত (বুখারী)। যখনই কাউকে সূরা বাকার তিলাওয়াত করতে দেখি, মাথায় চট করে কিছু চিন্তা ধরা দেয়। সূরা বাকারায় মানব মনকে নাড়া দেয়ার মতো, অসংখ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ক. সবচেয়ে চমৎকার আয়াত হল, আয়াতুল কুরসি। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অপূর্ব ভঙ্গিতে কিছু কথা বলা হয়েছে।

খ. কিবলা পরিবর্তনের জন্যে নবীজি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতেন। ওই সময়কার ব্যকুলতার কথা বলা চিত্রিত হয়েছে।

গ. কিছু কালিমা দ্বারা ইবরাহীম আ.-কে পরীক্ষা করার কথা, তাকে ইমামত বা নেতা বানানোর কথা আলোচিত হয়েছে।

ঘ. একদল বনী ইসরাঈলের কথা আলোচিত হয়েছে। তারা নিজ থেকেই আল্লাহর কাছে কিতাল/জিহাদের বিধান চেয়েছিল। আবার নিজেরাই গড়িমসি করে পদে পদে ঝরে পড়ার কথা আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া আরও অনেক বিষয় মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

কাউকে সূরা বাকার তিলাওয়াত করতে দেখলে, কল্পনার পর্দায় উসাইদ বিন হুদাইর রা.-এর ঘটনা চলে আসে। আশেপাশে, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি, আজো কোনও ফিরিশতা নেমে এল কি না! চর্মচক্ষে তাদের দেখা

সম্ভব নয় জেনেও মন শুধু খুঁজে বেড়ায়। শেষে মনকে প্রবোধ দেই, হয়তো অদৃশ্য নুর তিলাওয়াতকারীকে বেঁটন করে আছে। আমার চোখে ধরা পড়ছে না। ফিরিশতাটি সেদিন কেন নেমে এসেছিলেন? কুরআনি সুর শুনে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি? তারাও নিশিরাতে তিলাওয়াতের সমঝদার? নবীজি সা. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কেরামকে রাতের বেলা কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। নবীজি সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথা বলার সময়ও, অগোচরে রাতের তিলাওয়াতের গুরুত্ব বুঝিয়ে বার্তা দিয়ে দিতেন। তাদের মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করতেন, রাতের তিলাওয়াতের গুরুত্ব।

এক মজলিসে নবীজির কাছে 'শুরাইহ হাদরামি' রা.-এর কথা আলোচিত হল। নবীজি তার প্রশংসা করলেন। প্রশংসাবাক্য খেয়াল করলেই বোঝা যায়, নবীজি কী বার্তা আমাদের দিতে চেয়েছেন। বাক্যটা পড়ি,

ذاك رجل لا يتوسد القرآن

সে কুরআনকে বালিশ বানায় না। (নাসাদি)

হাদীসটা প্রথমবার পড়ে, বুঝে উঠতে পারিনি। নবীজি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন। প্রশংসা করেছেন নাকি নিন্দা? কেউ কি কুরআন কারীমকে বালিশ বানায়? পরে অর্থটা জেনেছি,

-তিনি (শুরাইহ রা.) দৈনিক নির্ধারিত পরিমাণ (হিযব) তিলাওয়াত না করে ঘুমুতে যেতেন না। মানে তিনি কুরআন কারীম তিলাওয়াতে যত্নবান ছিলেন। নবীজি অপূর্ব ভাষায় বিষয়টা ফুটিয়ে তুলেছেন। কুরআন কারীম হিফয করে, পড়তে শিখে, তিলাওয়াত না করে, অবহেলা করে ঘুমিয়ে যাওয়া মানে, কুরআন কারীমকে বালিশ বানিয়ে নেয়া।

হাদীসের ভাবার্থে প্রশংসা ও নিন্দা উভয় দিকই আছে।

ক. নবীজি কথাটা বলে সাহাবীর প্রশংসা করেছেন। তিনি কুরআন কারীমকে বালিশ বানান না।

খ. যারা কুরআনকে বালিশ বানায়, নবীজি পরোক্ষভাবে তাদের নিন্দা করছেন। কুরআন কারীম তিলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে পড়াকে যদি নবীজি 'বালিশ' বানিয়ে নেয়া বলে আখ্যায়িত করেন, তাহলে বলতে হবে, আমাদের বালিশ অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন কারীমেও রাতের বেলা ওহীর পাঠকে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অপূর্ব প্রশংসার ভঙ্গিতে,

﴿أَفَلَا فَعِلَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾

কিতাবীদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা (সঠিক পথে) প্রতিষ্ঠিত, যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে। (আলে ইমরান ১১৩)

আল্লাহ তা'আলাও রাতের বেলা তার কিতাব পড়াকে পছন্দ করেন। তিনি আগের যুগের লোকদের এই বৈশিষ্ট্য গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। আমাদেরকেও এমন হতে বলছেন। আয়াতটা পড়ার পর নিজের মধ্যে কি একটু কষ্ট জাগে না, আমি যে রাতের বেলা তিলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে থাকি! একটুখানি হলেও কি তিলাওয়াত করতে পারি না? একটুখানি বললে, আমার ফাঁকিবাজ মন বলে ওঠে,

-কেন আমি সালাতে তিলাওয়াত করেছি না?

আল্লাহ তা'আলা রাতের বেলার তিলাওয়াতকে কেন গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করলেন? এর কি কোনও ব্যাখ্যা আছে? কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের দিকে তাকালে, সামান্য ইশারা মেলে।

ক. রাতকে বলা হয়েছে (سَكَن) প্রশান্তিলাভ বা বিশ্রামের সময়।

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾

(তিনিই) ভোরের উদঘাটক। তিনিই রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামের সময়। (আনআম ৯৬)

খ. কথাটা আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন নি। বেশি কিছু জায়গায় রাতের প্রশান্তিময়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

﴿الْمُرُوءَاتُ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ﴾

তারা কি দেখেনি আমি রাত সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা তখন বিশ্রাম নিতে পারে। (নামল ৮৬)

আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও বেশিরভাগ সৃষ্টির স্বভাবের মধ্যেই রাতের বেলা বিশ্রামের ব্যাপারটা বুনে দিয়েছেন। রাতের নিরবতা থেকে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। বিশ্রাম লাভ করে। আর আল্লাহর ওহী সবচেয়ে বড় ও কার্যকর প্রশান্তির কারণ। রাতের প্রশান্তি আর ওহীর প্রশান্তি, দুই প্রশান্তির সম্মিলনে বান্দাহর প্রাপ্তিটা হয় কল্পনাতীত।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসা যে কোনও শিক্ষামূলক নিদর্শনের মাঝেই প্রশান্তির উপকরণ থাকে,

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালুতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তির উপকরণ। (বাকারা ২৩৮)

যারা কুরআন কারীমকে অস্বীকার করে, কুরআন কারীমকে অবহেলা করে, তারা নানা মানসিক সমস্যায় ভোগে, চিন্তাবৈকল্যের শিকার হয়, তাদের জীবনে সুখ থাকে না,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। (তোয়াহা ১২৪)

প্রকৃত সুখী জীবন ঈমানদাররাই যাপন করতে পারে। ঈমানবিহীন জীবনে সুখপাখি এসে ধরা দেয় না।

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّبَنَّهُ حَيَاةَ طَيِّبَةٍ﴾

যে ব্যক্তিই মুমিন থাকাবাস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব। (নাহল ৯৭)

নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামের কথা-ঘটনা-উক্তি থেকে প্রতীয়মাণ হয়, রাতের আঁধার আর নির্জনতাই হল কুরআন কারীম তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময়। কুরআন কারীম থেকে উপকৃত হওয়ার মোক্ষম মুহূর্ত। চব্বিশ ঘণ্টাই কুরআন কারীম তিলাওয়াত-তাদাব্বুর করা যায়। তবে গভীর রাতের একান্ত আপন সময়টা অন্য এক দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়।

বন্ধুদের সাথে কাটানো উদ্দাম রাতগুলো কি থাকবে? ইউটিউব-টিভি চ্যানেলে ঘুরে বেড়ানো ইন্দ্রিয়সুখময় ক্ষণগুলোও কি থাকবে? আমার বেশির ভাগ সময় কি অপ্রয়োজনীয় পড়া-লেখা-কথায় কেটে যাচ্ছে? আমার সিংহভাগ সময় কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই চলে যাচ্ছে? প্রতিদিনই আমার চারপাশে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। আমি কি চিরকাল বেঁচে থাকব? আমি আর কতকাল কুরআন কারীমের মধুময় সঙ্গ এড়িয়ে থাকব? আমি আর কতকাল কুরআন কারীমময় রাত কাটানো থেকে বঞ্চিত থাকব?

সাহাবীর মতো এমন কুরআনমাখা আশ'আরী হতে পারলে, জীবনে আর কি লাগে। দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই কামিয়াব।

কুরআনী কাণ্ডা।

সালাফ-সালেহীনের কথা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। কুরআন কারীমের প্রতি তাদের ভালোবাসা আর আমাদের ভালোবাসায় কত পার্থক্য! সম্মান ইহতিরামে কত পার্থক্য! বুঝ-সমঝে কত পার্থক্য! শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণে কত পার্থক্য! তাদের জীবন আর আমাদের জীবনেও কত পার্থক্য!

তারা কুরআন কারীম পড়তেন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন নিয়ে। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। তারা কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন জীবন্ত অনুভূতি নিয়ে। তারা যষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে কুরআন কারীম অনুভব করতেন। কুরআন কারীমের যা কিছু শুনতেন, যা কিছু তিলাওয়াত করতেন, সাথে সাথে মানতেন। কুরআন কারীমের শিক্ষার বিপরীত কিছু করার কথা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতেন না। কুরআন কারীম তিলাওয়াত ছিলো তাদের জন্যে রোগের উপশম। মানসিক অস্থিরতার প্রশান্তি। পাপ থেকে বাঁচার মাধ্যম। সামাজিক সমস্যার সমাধান।

কুরআন কারীম শুধু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যেই নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যেও শিক্ষার মাধ্যম ছিলো। আল্লাহ তা'আলা নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবেই আমি আমার নির্দেশে আপনার প্রতি ওহীরাপে নাযিল করেছি এক রূহ। ইতঃপূর্বে আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং (জানতেন) না ঈমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দান করি। নিশ্চয়ই আপনি মানুষকে দেখাচ্ছেন হেদায়াতের সেই সরল পথ। (সূরা ৫২)

কুরআন কারীম নাযিল হওয়ার আগে নবীজির অবস্থা একরকম ছিল, নাযিল হওয়ার পরে আরেক অবস্থা। কুরআন কারীমের ছোঁয়ায় নবীজি আরও বেশি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

(হে নবী!) আমি ওহী মারফত এই যে কুরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আপনাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি, যদিও আপনি এর আগে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এ ঘটনা সম্পর্কে) বিলকূল অনবহিত ছিলেন। (ইউসুফ ৩)

নবীজিও কুরআন কারীমের প্রভাবে বদলে যেতেন ।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল, বিশেষকরে রমযান মাসে। (তাঁর দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রমযান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি রাতে জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণকর ব্যাপারে প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। (ইবনে আব্বাস র.। বুখারী)

কুরআন নাযিল হওয়ার আগে কেমন ছিলেন সে বিষয়ে আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর, কুরআন কারীমের সংস্পর্শও নবীজিকে আন্দোলিত করত। পাক কালামের ছোঁয়ায় নবীজি হয়ে যেতেন আরও দানশীল। আরও মুক্তহস্ত। মুক্তবায়ুর মতো উদার। কুরআনি নূরে তার দানশীলতা বৃদ্ধি পেত। ইয়াকীন ও ঈমান বেড়ে যেতো। কর্মোদ্যম বৃদ্ধি পেতো। নবীজির অবস্থা যদি এমন হয়, আমাদের মতো দুর্বল ঈমানদারের অবস্থা কেমন হবে? তাহলে নিজের ঈমান বৃদ্ধির জন্যে আমি কুরআন কারীমের প্রতি কতোটা মুখাপেক্ষী? নবীজির অনেক বৈশিষ্ট্য ছিলো, একটা বৈশিষ্ট্য রাব্বের কারীম এভাবে বলেছেন,

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾

আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একজন রাসূল, যিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনান। (বাইয়িনাহ ২)

আগের যুগের আহলে কিতাবের ঘটনা বলে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেক ভালো মানুষও ছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত,

﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾

যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে। (আলে ইমরান ১১৩)

আল্লাহ তা'আলা নানা ভঙ্গিতে, নানা আঙ্গিকে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আমরা যেন কুরআন কারীমের সাথে সম্পর্ককে গভীর করি। সুদৃঢ় করি। কখনো তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদাব্বুর করার প্রতি মনোযোগী করে,

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾

তারা কি কুরআন কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? (মুহাম্মাদ ২৪)
কখনো উদ্বুদ্ধ করেছেন, চুপচাপ তিলাওয়াত শুনতে বলে,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾

যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ
থাক। (আ'রাফ ২০৪)

কখনো আদেশ করেছেন মনোযোগ দিয়ে আকর্ষণীয় সুরে তিলাওয়াত করতে,

﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

ধীরস্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত করো। (মুযযামিল ৪)

কখনো বলেছেন, তিলাওয়াতের আগে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। আল্লাহর
কাছে, শয়তান দূরভিসন্ধি থেকে পানাহ চাওয়ার মাধ্যমে। যাতে কুরআন
তিলাওয়াতের সময় দিল সাফ থাকে। কুরআনের প্রভাব অন্তরে বেশি রেখাপাত
করে,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান
থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (নাহল ৯৮)

কখনো সতর্ক করার ভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরআন কারীম থেকে দূরে সরে
থাকলে, কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করে,

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

আর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ
কুরআনকে বিলকূল পরিত্যাগ করেছিল। (ফুরকান ৩০)

কখনো বান্দাকে অভয় দিয়ে বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ يَنْزِلُ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾

বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি।
(কামার ১৭)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের কসম দিয়েছেন। কুরআন কারীমের ভাষাকে
প্রশংসার ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমকে শ্রেষ্ঠতম আসমানী কিতাব
বানিয়েছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের উপর কুরআন কারীম নাযিল
করেছেন। কুরআন কারীমের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের দায়িত্বে তুলে
নিয়েছেন। এতসব গুরুত্ব নিয়ে কুরআন কারীম কি সাধারণ কোনও কিতাবের
মতো হতে পারে?

গভীর রাত। সুনসান নিরব এক স্থান। পিনপতন নিস্তব্ধতা। মাঝেমধ্যে শুকনো পাতা ঝরে পড়ার আওয়াজ আসছে। বিঁ বিঁ পোকারাও ঘুমিয়ে গেছে। রাতজাগা নিশিপ্রাণীরাও সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। এমন নিঝুম সময়ে একজন মানুষ জেগে আছে। রবের মহব্বতের মুরাকবায় ডুবে আছে। দূর থেকে ভেসে এল সমুদ্রের এক লাহান। এক অপার্থিব তারতীল। কুরআন কারীম তিলাওয়াতের অনির্বচনীয় এক নাগমা! মানুষটার কেমন লাগবে? তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় কতোটা উন্মুক্ত হয়ে সে সুরের ভেলায় ভাসতে শুরু করবে?

কুরআন কারীমকে যারা ভালোবাসেন, তাদের কাছে কুরআনী সুর কেমন করে ধরা দেয়? কুরআনের জান্নাতী সুর তাদের হৃদয়ে কেমন করে পশে? মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব!

একটা কারখানা। বিকট আওয়াজে কারখানার মেশিন চলছে। কানে তালা লাগার যোগাড়। ভেতরে যারা কাজ করছে, তারা সবাই অভ্যস্ত। নতুন কেউ এমন প্রচণ্ড শব্দময় পরিবেশে এল, তার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম, বের হওয়ার উপায় নেই। পেটের দায়, তাই কাজ করে যেতে হবে। নইলে মাহিনা শেষে মাইনে মিলবে না। আচানক কোনও কারণে মেশিন এক লহমায় থেমে গেল। নেমে এল মৃত্যুশীতল নিরবতা! নতুন রোজগার করতে যোগ দেয়া মানুষটা এক বর্ণনাতিত প্রশান্তি অনুভব করবে। কুরআন কারীমও মুমিনের মনে এমনই সুখস্পর্শ নিয়ে আসে।

সভা এখনো শুরু হয়নি। সভাস্থলে শুধুই কোলাহল। যে যার মতো গলা উঁচু করে গল্প করে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি উপস্থিত হলেন। আচানক পুরো হল নিরব হয়ে গেল। হলজুড়ে কেমন একটা শান্তি শান্তি বিরাজ করতে লাগল। কুরআন কারীমও মুত্তাকীদের হৃদয়ে এমন শীতল বায়ুর সুখদ আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আশেপাশের সবাই ঘুমিয়ে আছে, রাতের তৃতীয় যাম শুরু হয়েছে। পাশের কামরা থেকে কুরআন কারীম তিলাওয়াতের মনকাড়া সুর ভেসে আসছে। এমন সুর যে কারও মনে দাগ কাটবে।

রাতের গাড়ি চলছে। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাস লাগছে। অনেকক্ষণ হল, বিজন একস্থানে জানজটে আঁটকে আছে গাড়ি। জানালা খোলা যাচ্ছে না ছিনতাইকারীদের ভয়ে। গাড়ির অন্যরা ঘুমে তলিয়ে আছে। চালক মৃদু আওয়াজে তিলাওয়াত ছেড়ে দিলেন। নিমেষেই সমস্ত বিরক্তি উধাও।

একজন বুঝের মানুষ। পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞানও রাখেন। অনেক বোঝানোর পরও কাজ হয়নি। মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। কথায় কথায় মায়ের সাথে রেগে যান। বড় বড় মনীষীর উক্তি দিয়ে বোঝানো হল। মায়ের মর্যাদার সপক্ষে অকাট্য যুক্তি দেয়া হল। উঁহু, কোনও কাজ হল না। আরেকদিন মায়ের সাথে

দুর্বাধার করার সময়, এলাকার হজুর এলেন। তিনি এসে মানুষটার হাত ধরে শুধু একটা আয়াত পড়লেন,

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾

এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়বতন করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন। (ইসরা ২৪)

আয়াতটা শোনার সাথে সাথে, মানুষটা ফনা নামানো সাপের মতো শান্ত হয়ে গেল। আর কোনও দ্বিধা করল না। কুরআন কারীমের আয়াতের শক্তি কেমন, মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

আরবী জানেন। কুরআন কারীমও বোঝেন। তার মা মেজাজী। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রাগ। ছেলেও মায়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মেজাজ দেখাতে কসুর করে না। দৃশ্যটা তার এক ওস্তাদের কানে গেল। ওস্তাদ তার শিষ্যকে একান্তে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত শুনলেন। শিষ্য নিজের আচরণের সাফাই গাইতে গিয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে শুরু করল। ওস্তাদ প্রথমে তার কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেলেন। বাধা দিলেন না। শিষ্য তার মনে যত খেদ ছিল, সব উগড়ে দিল। ওস্তাদ চুপ করে রইলেন। অস্বস্তিকর নিরবতা কামরায়। শিষ্য কিছুটা অবাক! সে ভেবেছিল হজুর তাকে থামিয়ে পাল্টা যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবেন। ধারনার বিপরীত আচরণের সম্মুখীন হয়ে, সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আরও কিছুকাল পর, হজুর শান্তস্বরে একটা আয়াত পড়লেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّكَ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَخَذَهُمَا ۚ

كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করো, মাতা-পিতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। (ইসরা ২৩)

আয়াতটা শোনার সাথে সাথে, শিষ্যের মনে কী হলো, আল্লাহ তা'আলাই ভালো বলতে পারবেন, সে হু হু করে কেঁদে দিল। কুরআন কারীম পাথর দিলকে গলিয়ে মোম করে দিয়েছে।

একজন দা'ঈ লিখেছেন,

আমি যখন পশ্চিমে পড়াশোনা করতে গেলাম, একটা কৌতূহল আমাকে সব সময় ভাড়িয়ে বেড়াত। এখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা ইসলামের কী

দেখে ঈমান আনছে? ইসলামের কোন বিষয়টা তাদেরকে প্রভাবিত করেছে? কারণটা জানতে পারলে, অন্যদের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালানো সহজ হবে। খুঁজে খুঁজে নবমুসলিম বের করলাম। তাদের সাথে একে একে কথা বলে গেলাম। তাদের লিখিত বই পড়লাম। তাদের সাক্ষাতকারগুলো দেখলাম। আগে ধারণা ছিল, তারা জটিল দার্শনিক কোনও তত্ত্বের কারণে ঈমান এনেছে। বিজ্ঞানের কোনও সূত্রের সমর্থন পেয়ে মুসলমান হয়েছে। মুসলমানদের আখলাক দেখে মুগ্ধ হয়ে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। মুহাম্মাদ সা.-এর আদর্শ দেখে তার অনুসারী হয়েছে।

ভুল ভাঙতে দেবী হলো না। আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, তাদের অনেকেই ঈমান এনেছে, কুরআন কারীম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। কেউ আরবী তিলাওয়াত শুনে। কেউ অনুবাদ পড়ে। তাদের বক্তব্য, -কুরআন কারীমের মধ্যে কী যেন একটা আছে, যা বাকি আর দশটা সাধারণ বই এমনকি বাইবেলেও নেই। এক সম্বোধনী শক্তি আছে কুরআনে। ব্যক্ত করা যায় না এমন চৌম্বকীয় শক্তি!

আসলেই তাই। কুরআন কারীমে অবিশ্বাস্য এক শক্তি আছে। সরল দৃষ্টিতে যা দেখা যায় না। কাছে এলে অনুভব করা যায়। উপলব্ধি করা যায়। এই কুরআন কি শুধু মানুষকে গলিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে? জি না।

﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোনও পাহাড়ের উপর, তবে আপনি দেখতেন তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (হাশর ২১)

এই আয়াত বলছে, কুরআন কারীমের প্রভাবে, পাথর পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে যেতো। তাহলে মানুষের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে? আরবের বাইরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা প্রায় সবাই আরবী বুঝতো না। কুরআন কারীমের অর্থ বুঝতো না। না বুঝেই তারা এতটা প্রভাবিত হত।

কুরআন কারীম মানুষকে কতোটা বিহ্বল করে দেয়, তার আদর্শ নমুন হল আবু বাকর সিদ্দীক রা.। মক্কী যুগ। তাজা তাজা কুরআন কারীম নাযিল হচ্ছে। মুমিনগণ এই আসমানি নেয়ামত লুফে নিচ্ছেন। তাদের সময় কাটছে কুরআনি রঙে রঙিন হয়ে। চারদিক থেকে থেকে নির্যাতনের স্টিমরোলার নেমে আসছে, সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই। বনু হাশেম শে'বে আবি তালেবে বন্দী। নবীজিও সেখানে অন্তরীন হয়ে আছেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নবীজি মক্কার অসহায় মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। আবু বকরও হিজরতের

প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আয়েশা রা.-এর বর্ণনায়, পিতার সেই দিনগুলি ফুটে উঠেছে, তার বর্ণনার সারাংশ ছিলো,
-আবু বাকর হাবশায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে মালিক বিন হারিস (ইবনুদ-দাগিনাহ)-এর সাথে দেখা! ইবনুদ দাগিনাহ সবকথা শুনে আবু বকরকে নিরাপত্তা দিতে সম্মত হলো। আবু বাকর মক্কায় অবস্থান করেই তার রবের ইবাদত করতে পারবে এই মর্মে। আবু বকর ফিরে এলেন। নিজ ঘরে বসেই আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে শুরু করলেন।

فابتنى مسجداً بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه
نساء المشركين وأبنائهم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلاً بكَاءَ لا
يملك دمه حين يقرأ القرآن فأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين

কিছুদিন পর আবু বকর নিজ বাড়ির আগিনায় একটা মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (তার সালাত-কেরাত শোনার জন্যে) মুশরিকদের নারী ও সন্তানের চারদিক থেকে (يتقصف) ভেঙে পড়তো! আবু বকর ছিলেন নম্র दिलের মানুষ। কুরআন তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না। এমন বেগতিক পরিস্থিতি দেখে, মুশরিক নেতারা ভয় পেয়ে গেল (ভাবার্থ বুঝারি)

এই হাদীসে অনেক লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে। আমরা শুধু তিনটি দিককে আলাদা করি,

১: আবু বকর শুধু কাঁদতেন না, কান্নায় ভেঙে পড়তেন। আদরের কন্যা বাবার কান্নার অবস্থা বোঝানোর জন্যে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেননি, করেছেন (بَكَاءَ) শব্দটি। অনেক বেশি কাঁদতেন।

২: কান্নার এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য মুশরিক নারী-শিশুদের চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করত। কুরআন তিলাওয়াতের সুর শোনার জন্যে, তারা পতঙ্গের মতো সম্মোহিত হয়ে ছুটে আসতো। মুশরিক স্বামী ও সমাজপ্রভুদের রক্তচক্ষু উপশ্ক্ষো করে।

৩: কুরআন কারীমের মধ্যে রাব্বের কারীম কী এমন শক্তি দিয়ে দিয়েছেন, যা মক্কার কটর মুশরিকরাও বুঝতে পেরেছিল। এমন শক্তির মুখোমুখি হতে তারা ভয় পেতো। স্ত্রী-পুত্রদেরকেও মুখোমুখি করতে ভয় পেতো?

কুরআনের প্রভাবে গলে যাওয়া প্রকৃত জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য। আমরা যাদেরকে জ্ঞানী মনে করি, তারা প্রকৃত জ্ঞানী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, প্রকৃত জ্ঞানী কারা?

﴿قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾

(কাফেরদেরকে) বলে দিন, তোমরা এতে ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামনে যখন (কুরআন) পড়া হয় তখন তারা খুতনি ফেলে সিজদায় পড়ে যায়।
(ইসরা ১০৭)

আয়াতটা আরেকবার পড়া যেতে পারে। আরও একবার। বারবার। কী চিত্র ফুটে ওঠে? একদল মানুষকে রাবের কারীম তার পক্ষ থেকে ইলম দান করেছেন। তাদের সামনে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা শুরু করতে না করতেই, মানুষগুলো কান্নায় ভেঙে পড়লো। রবের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞায় ভালোবাসায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লো!

শুধু কি সাধারণ মানুষ? কুরআন কারীম দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন নবীগণ। তাদের ওপর কুরআন কারীমের প্রভাব কেমন ছিল? কুরআন তাদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন আনতো?

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

আদমের বংশধরদের মধ্যে এরাই সে সকল নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। এদের কতিপয় সেসব লোকের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম এবং কতিপয় ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকুব)-এর বংশধর। আমি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলাম ও (আমার দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছিলাম এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (মারইয়াম: ৫৮)

সুবহানাল্লাহ! এখানে শুধু একজন নবীর কথা বলা হয়নি। সমস্ত নবীর মৌলিক একটা গুণ বা স্বভাব প্রকাশ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর আয়াত শুনে শুধু কাঁদতেনই না, কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়তেন। একটা কথা অন্তকে কতোটা প্রভাব ফেললে, কান্নায় ভেঙে পড়া যায়?

আমাদের পেয়ারা নবীজি? তার কুরআনি কান্না কেমন ছিলো? এ নিয়ে একাধিক ঘটনা আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন

-একদিন নবীজি আমাকে বললেন,

-আমাকে পড়ে শোনাও তো! (اقرأ علي)-
-আপনাকে পড়ে শোনাবো? আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়!
- (إني أشتي أن أسمع من غيري) অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনে আমার
ভালো লাগে!

আমি সূরা নিসা পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে পৌছলাম,
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

সূতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে,
যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং
(হে নবী), আমি আপনাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে
উপস্থিত করব? (৪১)

এই আয়াত পর্যন্ত। নবীজি তখন বললেন, (كف) থামো!

আমি থেমে গেলাম। নবীজির দিকে তাকিয়ে দেখি, তার দু'চোখ থেকে টপটপ
করে অশ্রু ঝরছে।

নবীগণ আল্লাহর কালাম শুনে চোখের পানি ফেলবেন এটাই স্বাভাবিক। সাধারণ
মানুষ ও ভিনধর্মী আহলে কিতাব (নাসারা), এখনো মুসলমান হননি এমন কেউ
যদি কুরআন শুনে আপুত হয়ে কাঁদেন?

﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْنَ
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

আপনি মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী
পাবেন তাদেরকে যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। এর কারণ এই
যে, তাদের মধ্যে অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ
রয়েছে। আরও এক কারণ হল যে, তারা অহংকার করে না।

(আনআম ৮২)

এই মানুষগুলোও যখন কুরআন কারীম শোনে, তখন কেমন হয় তাদের
প্রতিক্রিয়া?

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে
তখন দেখবে তাদের চোখসমূহকে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

(মায়িদা ৮৩)

এই আয়াতে খ্রিষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর কালাম শুনে তারা হক
চিনতে পেরেছিল। শুনে নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারেনি। ঝরঝর করে কেঁদে

দিয়েছে। আগের আয়াত ও পরের আয়াত দেখলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। এ-অবস্থা শুধু নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই ছিল, এমন নয়। এখনো অনেক সত্যসন্ধানী খ্রিষ্টান এমন আছেন। রুবা কাউইর এমন একজন। জর্দানি খ্রিষ্টান। কুরআন কারীমের ভুল ধরতে এসে, সেই কুরআন পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। আমি কি কখনো কুরআন শুনে বা পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম? একজন খ্রিষ্টানের যদি কান্না আসে তাহলে আমার কেন নয়? তাহলে কি বলবো, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্মগতভাবে হক পেয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছি?

শুধু কি মানুষ? ফিরিশতাগণ পর্যন্ত কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শুনে অভিভূতের ন্যায় আচরণ করেছিলেন। কুরআন কারীম শুধু কি মনকেই আর্দ্র করে? কিছু প্রিয় বান্দা আছেন, যাদের শুধু মনই নয়, শরীরের বহির্ভাগও প্রভাবিত হয়ে পড়ে, কুরআন কারীমের প্রভাবে।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانٍ تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী এমন কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস, যার বক্তব্যসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি করে হয়েছে। যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে, তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। (যুমার ২৩)

আল্লাহ্ আকবার! কুরআনের আয়াত শুনে তাদের চামড়া (جُلُودُ)-ও কুঁকড়ে যায় ভয়ে। (تَفْشَعُ) থরথর করে কেঁপে ওঠে। আবার (تَلِينُ) কোমল হয়ে ওঠে। হায়, আমার চামড়া তো দূরের কথা কলবই ঠিকমত স্থির থাকে না! বিপরীত চিত্রও আছে। কিছু মানুষ আছে, কুরআন কারীম তাদেরকে বিন্দুমাত্র নাড়া দেয় না। কুরআন কারীম শুনে তাদের ভেতরে কোনও প্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। কুরআন বোধকে জাগ্রত করে না। তাদের চিন্তাকে উস্কে দেয় না। তাদের ভাবকে ভাবিত করে না। তাদের অন্ধকারে আলোর মশাল জ্বালে না। মাস কে মাস গত হয়ে যায়, তারা কুরআন নিয়ে বসে না। এটা একটা রোগ। এটা কঠিন এক ব্যাধি,

﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ لِقَايَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাণদের জন্যে, যারা আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ। (যুমার ২২)

আমি কি প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি? তাওফীকে কুলোয় নিত্য তিলাওয়াত করতে? যদি নিত্যদিন তিলাওয়াত তাওফীকে নসীব হয়, তাহলে ভাবা উচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নেয়ামত। আমি কুরআন তিলাওয়াত করে (নাউয়িব্লাহ) আল্লাহকে নয়, নিজেকেই কৃতার্থ করেছি। কুরআন তিলাওয়াত করতে পেরে, আমি নিজেই বর্তে গেছি। সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছি। মুবারক হয়েছি। রাবের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া, এই নেয়ামত লাভ করা সম্ভব নয়,

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾

তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফয়ল রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পাক-পবিত্র হতে পারত না। (নূর ২১)

আমি নেক আমল করতে পারছি, আমি ভালো হয়ে চলতে পারছি, এটা রবেরই অনুগ্রহ। এজন্য আমার করণীয় কি?

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

আর তারা বলবে, সমস্ত শোকর আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে না পৌঁছালে আমরা কখনোই (এ স্থলে) পৌঁছতে পারতাম না। (আরাফ ৪৩)

হেদায়াত লাভ ও ইবাদতের তাওফীক লাভ করার জন্যে বান্দার প্রধানত দুটি কাজ করা কর্তব্য,

১: আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

২: ইস্তে'আনত বা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

﴿إِنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا نَسْتَعِينُ﴾

(হে আল্লাহ) আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

কুরআন কারীম কিছু মানুষের মনে কেন এতটা গভীর রেখাপাত করে? দুটি আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত মেলে,

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾

এবং বলুন, সত্য (কুরআন) এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (ইসরা ৮১)

কুরআন কারীম আসার সাথে সাথে, মিথ্যা দূরীভূত হয়ে গেছে। যারা সত্যিকারের মুমিন ও আল্লাহভীরু, কুরআন কারীম তাদের অন্তর থেকে সব ধরনের মিথ্যা দূর করে দেয়। তাই তাদের কলব এতটা বিগলিত হয়ে যায়। কুরআন কারীম তাদের কলব ও আকলের ভ্রান্তি দূর করে দেয়,

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾

বরং আমি সত্য মিথ্যার উপর 'নিষ্ফেপ' করি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়ো

করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (আম্বিয়া ১৮)

সত্যিই কুরআন কারীম মিথ্যাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সত্যকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

বুখারি থেকে আরেকটি দৃশ্য অবলোকন করা যাক।

বদরে মক্কার সন্তরজন বন্দী হল। তাদের ছাড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে, আলোচনা করার জন্যে পাঠানো হলো জুবায়ের বিন মুতইমকে। মদীনায়ে পৌছতে পৌছতে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। মদীনার মসজিদে তখন মাগরিবের জামাত শুরু হয়েছে। জামাত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কান খোলা। মসজিদ থেকে ভেসে এল এক অপার্থিব সুর। জুবায়ের তন্ময় হয়ে শুনছেন। ইমাম আর কেউ নন, স্বয়ং মহানবী সা.। জুবায়ের পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার পর, সেদিনের স্মৃতি ও অবিস্মরণীয় হিদায়াতবাহী অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, -নবীজি সূরা তূর পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে পৌছে গেলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾

তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) সৃষ্টা? না কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না; বরং (মূল কথা হচ্ছে) তারা বিশ্বাসই রাখে না। আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর)।

নিয়ন্ত্রক? (৩৫-৩৭)

আয়াতগুলো শুনে (كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ) আমার হৃদয় উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল (বুখারী)

আল্লাহ্ আকবার! একজন মুশরিক! তাকেও কুরআন কারীম এভাবে মাবহূত (অভিভূত) করে দিয়েছে? হৃদয় উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল? ভয়ে? বিস্ময়ে? মুগ্ধতায়? অথচ তিনি আল্লাহর কালাম শুনেছিলেন তার ঘোরতর শত্রুর মুখ থেকে। তার তো ঘৃণা উদ্বেগ হওয়ার কথা ছিল! কিন্তু কুরআন কারীম তাকে অসহায় করে দিয়েছে।

আরেকদিন। মক্কার বইরে। নবীজি ফজরের সালাতে সূরা জিন তিলাওয়াত করছিলেন। একদল জিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা অবাক! এত সুন্দর সুর আর এত চমৎকার কথা? কাছে ঘনাল। তন্ময় হয়ে শুনল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তেলাওয়াত। চিত্রটা রাখে কারীম কী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন,

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾

এবং (হে রাসূল!) স্মরণ করুন, যখন আমি এক দল জিনকে কুরআন শোনার জন্যে আপনার অভিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। যখন তারা সেখানে পৌঁছল, (একে অন্যকে) বলল, চুপ কর। (আহকাফ ২৯)

জীবনে এই প্রথম কুরআন শুনল তারা। শোনার সাথে সাথেই ভদ্র হয়ে গেল। আদব শিখে গেল। একে অপরকে চুপ থাকতে বলল। শুধু তাই নয়,

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

তা পড়া হয়ে গেলে তারা আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

সুবহানাল্লাহ! কুরআন কারীম শোনার বরকতে তারা একেকজন দায়ীতে পরিণত হল। শুধু তাই নয়, তারা সেদিন কুরআন কারীম শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিল। নিজ দেশে ফিরে সেটা অন্যদেরকে কাছে প্রকাশও করেছিল,

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর।
কুরআন শুনেছি (জ্বিন ১)

এমন অসাধারণ এক কুরআন কারীম ভাগে পেয়ে, আমি কি তার যথাযথ কদর করছি? আমি যদি কুরআন কারীমকে অবহেলা করি, তার পরিণতি কিম্ব ভয়াবহ! স্বয়ং নবীজি আমার বিরুদ্ধে রাব্বের কারীমের দরবারে অভিযোগ দায়ের করবেন,

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। (ফুরকান ৩০)

এই আয়াতে সম্প্রদায় বলে যদিও কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবুও কুরআন কারীমকে অবহেলা করলে, মুমিন বান্দাও কেয়ামতের দিন ফেঁসে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়।

রাব্বের কারীম কুরআন কারীমকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। আল্লাহর যমীনে কুরআন কারীমের বিধান বাস্তবায়নের মেহনতে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া আখেরাতে 'হাসানাহ' দান করুন।

অংক্ষিপ্ত মূর্চি

হিব্বী মিনাল কুরআন // ৩৩-৫৮

আই লাভ ইউ, সুইট হার্ট! // ৫৯-৬৮

কুরআনের প্রজন্ম // ৬৯ - ৭৪

জীবনের প্রয়োজনে কুরআন // ৭৫-১৩৬

আয়াতমাখা গল্প // ১৩৭- ১৬০

মাদরাসাতুল আশ্বিয়া // ১৬১ - ২৩৮

কুরআনি ভাবনা // ২৩৯ - ২৫৪

মাদরাসাতুল কুরআন // ২৫৫ - ৪০০

হিব্বী
মিনাল
কুরআন!

এক প্রতিনিধি দল এল মদীনায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে। নবীজি তাদেরকে এশার পর সময় দিতেন। দীর্ঘ সময় তাদের সাথে কথা বলতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নবীজি একদিন এশার পর তাদের কাছে আসতে একটু সময় নিলেন। আসার পর জানতে চাওয়া হলো,

-আজ অন্যদিনের তুলনায় একটু পরে বের হয়েছেন যে?

-আমি আজকের 'কুরআনের হিযব' (حزبي من القرآن) পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা আদায় না করে বাইরে আসতে মন চাইল না।



প্রতিদিন পড়ার বা তিলাওয়াতের জন্য যা নির্ধারণ করা হয় সেটাকে 'হিযব' (الحزب) বলা হয়। এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নবীজিরও নির্দিষ্ট 'হিযব' ছিল। এবং তিনি তা নিয়মিত আদায় করতেন।



কুরআন কারীম কী?

-আল্লাহর কলাম। কালামুল্লাহ।

এরচেয়ে বড় সংজ্ঞা আর কিছু হতে পারে না। দুনিয়ার সব বইতেই মানুষের কথা। কিন্তু কুরআন কারীম? তাতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কথা আছে। আর কারও কথা এ-কিতাবে নেই। অন্যদের প্রসঙ্গে আলোচনা আছে কিন্তু সেটা রাক্বের কারীমের নিজস্ব 'কালামে'।



কিছু মানুষ এত বেশি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেন, তাদের 'হিযবী মিনাল কুরআন' আর আমার 'হিযবী মিনাল কুরআন'-এর মাঝে কতো পার্থক্য!



কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সময় কখনো কি ভেবে দেখেছি, আমি যা পড়ছি তাতে আছে,

ক. সব সমস্যার সমাধান।

খ. সমস্ত রোগের উপশম।

গ. মুসীবতের মুশকিল আসান।

- ঘ. সব বিচ্যুতির সংশোধন ।
 ঙ. সব গোমরাহির হিদায়াত ।
 চ. সব অন্ধকারের আলো ।
 ছ. সব জটিলতার ব্যাখ্যা ।

□□□□

আমি প্রতিদিনের ‘হিব্ব’ আদায় করতে বসি । তার অর্থ, আমি এমন এক অনিবর্তনীয় অনুভূতির মুখোমুখি হতে চলেছি, যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা কোনও কবির পক্ষে সম্ভব নয় । কোনও বক্তার পক্ষে সম্ভব নয় । কোনও লেখকের পক্ষে সম্ভব নয় । এটা হলো, কলবের সাথে রবের একান্ত মিলনের মুহূর্ত ।

□□□□

কুরআন কারীমের সাথে থাকার অর্থ, অপার্থিব এক ‘সাহচর্যে’ আসা । দুনিয়ার আর কোনো সঙ্গ এর সাথে তুল্য হতে পারে না । আমার হৃদয় আল্লাহর দাসত্বে ডুবে গেছে । আমি তখন হাঁটছি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পথে । নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে । সাহাবায়ে কেরামের পথে । তাবেয়ীগণের পথে । ইমামগণের পথে । সিদ্দীকীনের পথে । শুহাদা-সালেহীনের পথে ।

□□□□

আমার হৃদয়ে কুরআন কারীমকে স্থান দেবো বলে যখন ঠিক করে রেখেছি, তখন আমার জেনে রাখা উচিত,
 -আমার কলব থেকে আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু তাড়াতে হবে । ঝেড়ে ফেলতে হবে । এমনকি নিজেকে, আমার নিজের সত্ত্বাকেও দূর করে দিতে হবে । সেখানে থাকবে শুধু কুরআন । শুধুই আল্লাহ তা‘আলা ।

□□□□

কুরআন কারীম হলো (الْكِتَابُ الْعَزِيزُ) অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব । (ফুসসিলাত: ৪১) আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কিতাব । কুরআন কারীমের ইজ্জত (عِزَّة) তাকে উপেক্ষাকারীদের অন্তরে অবস্থান করতে বাধা দেয় । আমি আমার সেরাটা না দিলে, কুরআনও আমাকে তার আলো দিবে না । আমার জন্যে তার অতলসমুদ্রের দ্বার উন্মোচিত করবে না ।

□□□□

প্রতিদিন কুরআন কারীমের জন্য নির্দিষ্ট একটা ‘হিব্ব’ নির্ধারণ করার পর, আদায় না করলে, কুরআন কারীমের ইজ্জতে লাগার কথা । এমনকি আমি

নিজেকে যদি কুরআন কারীমের উপর প্রাধান্য দেই, সেটাও কুরআন কারীমের জন্য সম্মানজনক আচরণ হওয়ার কথা নয়।

৐৐৐

প্রতিদিনের ‘হিবব’ আমার জন্য নেয়ামতস্বরূপ। বোঝা নয়। বহু মানুষ এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। কারণ তারা এটাকে বোঝা মনে করে। চাপ মনে করে। সময়ের অপচয় মনে করে। অপর দিকে অনেক সৌভাগ্যবান মানুষ নিয়মিত হিবব আদায় করে, সুখের সন্ধান পেয়ে যায়। আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয়ে যায়।

৐৐৐

কুরআন পাঠের সময়টা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যতম উজ্জল সময়। প্রকৃত জ্ঞানীরা কোনো কিছুই এর তুলনা করতে রাজী নন। তারা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিতে থাকেন ‘সুন্দর’ সময়টুকু উদযাপনের জন্য। সচেতন-সজাগ হৃদয়ে তেলাওয়াত শুরু করেন। তীব্র পিপাসা থাকাবস্থাতেই তারা নিত্যকার ‘হিবব’ শেষ করেন।

৐৐৐

কিছু তেলাওয়াতকারী আছেন। তারা রুটিন তেলাওয়াত করেন। একদিনও বাদ পড়ে না। কোনোরকমে প্রতিদিনের ‘হিবব’ শেষ করেন। ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেন। চা খান। মোবাইল ধরেন। হাসেন। এদিক-ওদিক তাকান। উঁহ, কুরআন আমার পুরোটা দাবী করে! সমস্ত চিন্তের গভীর সমর্পণ দাবী করে। দুলে দুলে কোনো রকমে পারা শেষ করলেই হবে না।

৐৐৐

জীবনের অন্যতম ‘আনন্দ’ কী?

-কুরআন কারীমের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আমি যতই মুখস্থ পড়তে পারি, কিছু সময় কুরআন কারীম হাতে নিয়েই পড়ব। এটাও বিশেষ এক নেয়ামত। এর প্রভাব অনস্বীকার্য। উসমান রা. কুরআনের মাঝে ডুবে গিয়ে শত্রুভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন।

৐৐৐

কুরআন তেলাওয়াত, ক্লাস্ত পথিকের শান্তিবিনাশী আরক। দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত ব্যক্তির জন্য কোমল ছোঁয়া। ছাতিফাটা রোদ্দুরে মরুভূমিতে মরিচিকা দেখে দিশেহারা হওয়া উদ্ভ্রান্তের কম্পাস। গুরু খরখরে হয়ে যাওয়া হৃদয়ের বসন্ত।

৐৐৐

কুরআন পড়তে গিয়ে, আমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ফেলছি, ভারমুক্ত হচ্ছি। বেশ তৃপ্তিকর কাজ সেরে নিচ্ছি। এমন ভাব মোটেও অন্তরে ঠাঁই দেয়া যাবে না। জীবনে কতভাবে কুরআনের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছি, কতভাবে কুরআনকে উপেক্ষা করেছি, কুরআন কারীমের সুশীতল ছায়া থেকে কতদিন দূরে থেকেছি, সেজন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে কুরআনের সামনে নতজানু হয়ে বসতে হবে।

□□□□

যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে, সে উত্তরুজ্জা (সুগন্ধিযুক্ত লেবুজাতীয়) ফলের মতো। তার ঘ্রাণ উত্তম। স্বাদ উত্তম। যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে মুমিন খেজুরের মতো, ঘ্রাণ নেই তবে স্বাদটা ভালো। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, সে রায়হানা ফুলের মতো। ঘ্রাণটা উত্তম তবে স্বাদটা তিতা। যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে হানযালা (একপ্রকার টকজাতীয়) ফলের মতো। কোনও ঘ্রাণও নেই স্বাদটাও বিস্বাদ। (বুখারী)

□□□□

যে ব্যক্তির মধ্যে কুরআন নেই, সে বিরান ঘরের মতো। (তিরমিযী)

□□□□

উসমান রা. বলে গেছেন,

-যদি আমাদের হৃদয়টা পবিত্র হতো, আমরা কখনোই কুরআন পাঠ করে তৃপ্ত থাকতে পারতাম না। শুধু পড়েই যেতাম। পড়েই যেতাম।

□□□□

কুরআন তিলাওয়াত নিছক ইবাদত নয়, এটা সব মুশকিলের আসান। ওলামায়ে কেরাম, ইলমী কোনও বিষয়ে সমস্যা পড়লে, কুরআন নিয়ে বসে যেতেন। আমি যদি কুরআন কারীম গভীর মনোযোগে পড়ি, তাহলে আমার কাছে দুনিয়ার কোনো বিষয়ই দুর্বোধ্য থাকবে না।

□□□□

কুরআন তিলাওয়াত করা মানে, হৃদয়কে ওহীর আলোয় আলোকিত করা। আমি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করছি মানে, আমার হৃদয়ের চারপাশটা আলোকিত হয়ে উঠছে। আমি পৃথিবীতে থেকেও আর এখানের নই, আসমানী মানুষে পরিণত হয়েছি।

□□□□

কুরআন কারীম মৃত আত্মায় প্রাণের সঞ্চারণ করে। ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলে। ছোট্ট একটা বসতি থেকে টেনে নিয়ে যায় বিশ্বের দিক-দিগন্তে। সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাসের। প্রতিষ্ঠা করে অনুপম সমাজের। ছড়িয়ে দেয় সৌভাগ্যের সৌরভ।

□□□□

এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

-আমরা কুরআন নিয়ে মশগুল হয়েছি। দেখতে পেয়েছি, বরকত আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত করে নিয়েছে।

□□□□

কুরআনের সাথে লেগে থাকলে, সময়ের বরকত বেড়ে যায়। একজন শায়খ প্রতিদিন ৭ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একজন সরকারী চাকুরে প্রতিদিন আসর থেকে এশা পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তাদের সময়ের বরকতের অভাব ছিল না। সংসারের জন্য পর্যাণ্ড মেহনত করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যও ঠিক ছিল। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে বেগ পেতে হয়নি।

□□□□

এক বুয়ুর্গের নসীহত,

-তুমি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে। বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াত ছাড়বে না। তুমি যত বেশি তিলাওয়াত করবে, তত বেশি মনোবাঞ্চা লাভ করবে।

□□□□

-কুরআন কারীম কি?

-কুরআন কারীম আমাদের জন্যে রুহ, জীবন। দুরারোগ্যের আরোগ্য। মুক্তি। সাফল্য।

□□□□

বিক্ষিপ্ত মন, অস্থির চিন্তা, বিশ্রান্ত ভাবনা, উদাস দৃষ্টি তিলাওয়াতের মাঝে খুঁজে পাবো যাবতীয় সান্ত্বনা। কুরআন সৃষ্টি করবে সামাজিক ঐক্য। তৈরি করবে 'একতাই বল'।

□□□□

কুরআন কারীম মুমিনের শক্তির উৎস। অদৃশ্য এক শক্তি সব সময় উৎসারিত হতে থাকে কুরআন থেকে। কুরআন পাঠে দুর্বল সবল হয়ে যায়। নিষ্ক্রিয় আত্মা সক্রিয় হয়ে যায়।



আমি যতই চেষ্টা করি, আমার উপর কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাব যথাযথ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। (আয়েশা বারজাত)



কুরআন কারীমের প্রভাবমুক্ত আরবী-ইসলামী চিন্তাগুলোকে আমার কাছে অনেকটা 'রক্তহীন' মানুষের মতো মনে হয়। (জনৈক নবমুসলিম)



আমাদের সমস্যা হলো, আমরা কুরআন কারীমের জন্য নির্ধারণ করি, আমাদের 'অতিরিক্ত' অপ্রয়োজনীয় সময়টা। ভাবি এতেই কুরআনের হক আদায় হয়ে যাবে। আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে।



যারা কুরআনের তাদাব্বুর করে, তারা কেমন?

ক. সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান।

খ. কোমল হৃদয়ের অধিকারী।

গ. সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী।

ঘ. লক্ষ্যভেদী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

ঙ. উঁচু হিম্মতের অধিকারী।

চ. গভীর ঈমানের মালিক।



বিশেষ কিছু আয়াতের প্রতি অন্তরের ঝোঁক তৈরি করে, সেগুলোর আলোকে জীবনকে রঙিন করে তুলবে হবে। আয়াতগুলো কিভাবে খুজব? সালাফের জীবন থেকে আয়াতগুলো খুঁজে নিতে হবে। তারা বলে গেছেন, কিছু আয়াত তাদের জীবনে কী গভীর রেখাপাত করেছে!



একটা আয়াতকে সামনে রাখতে পারি। যখনই প্রবৃত্তি আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবে, মনে করবো।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (নাখি'আত: ৪০-৪১)



গুনাহ হয়ে গেলে, মনটা সংকুচিত হয়ে পড়লে, সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদিত হওয়া। আয়াতটা স্মরণ রাখা।

إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। (যুমার: ৫৩)

যতকিছুই হোক, প্রথমে ও শেষে কুরআন কারীমের কাছেই ফিরে আসা। কুরআন কারীমেই সমর্পিত হওয়া।



কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতের সাথেই জীবনের একেকটা ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে নেয়া। ওই আয়াত পড়ার সময়, এই ঘটনা ঘটেছিল। ওমুক সূরা পড়ার সময় আমার এমন চিন্তা হয়েছিল। এভাবে পুরো কুরআনটা হয়ে উঠবে একান্ত নিজস্ব। ঘরোয়া। নিকটের। কাছের। আত্মার। প্রাণের। হৃদয়ের।



সুন্দর দেখে একখানা কুরআন শরীফ হাদিয়া করলাম। তারপর সেটাকে গিলাফবন্দী করে পরম যত্নে তাকে রেখে দিলাম। কুরআন কি এজন্য নাযিল করা হয়েছে? কুরআন নাযিল হয়েছে, তিলাওয়াতের জন্য। তাদাব্বুরের জন্য। জীবনের সংবিধান বানানোর জন্য। এমন করলেই কুরআন আমাকে দিবে নবজীবন।



প্রতিটি আয়াত পড়তে পড়তে ভাববো, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এই আয়াতে নাজাতের কী উপকরণ রেখেছেন। আমার জন্য কী শিক্ষা রেখেছেন? কী উপদেশ রেখেছেন?



কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন। কুরআন নিয়ে থিসিস লিখছেন। কত কত বই, কতশত জার্নাল ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাচ্ছে। আজ এ-লাইব্রেরী, কাল ও-লাইব্রেরিতে চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছেন। সবই করছেন কুরআন গবেষণার স্বার্থে। কিন্তু সরাসরি কুরআন থেকে দু'পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করার ফুরসত মেলে না। এক পৃষ্ঠা পড়তে না পড়তেই হাঁপ ধরে যায়। আচ্ছা স্যার, আপনি বলুন তো, -কোন কুরআনের গবেষণা করছেন?

৐৐৐৐

এক লোককে দেখেছি, সারাদিন তিলাওয়াত করেন। দেখতে-শুনতে একেবারে নগন্য। সাধারণ মানুষ। অথচ মানুষটা এত বেশি তিলাওয়াত করেন, দু'দিনে এক খতম হয়ে যায়। খতমের উদ্দেশ্যে নয়, এমনিতে তার কাছে তিলাওয়াত করতে ভালো লাগে তাই তিলাওয়াত করে। কোন ফাঁকে খতমও হয়ে যায়। (শায়খ খালেদ)

৐৐৐৐

সারাদিন পেপার-পত্রিকা-ফেসবুক-টুইটার-টেলিগ্রাম-ইমো-হোয়াটস আপ-ভাইবার- ইনস্টাগ্রাম। বিকেলে-সন্ধ্যায় পাঠ্যবই, রাতে আবার আনলাইন, অথচ তাকের ওপর কুরআনখানা ধূলোমলিন। পরিত্যক্ত! কাঁদছে মাসের পর মাস! কেউ ছুঁয়েও দেখছে না। কীভাবে বরকত আসবে? কী লাভ এই জ্ঞানসাধনায়?

৐৐৐৐

জীবনে বেশি বেশি তিলাওয়াত করেছেন এমন কত বৃদ্ধকে দেখেছি, বয়স শয়ের কাছাকাছি হলেও, চোখের জ্যোতি একটুও কমেনি। মুখের ভাষা অস্পষ্ট হয়নি। চামড়ায় তেমন ভাঁজ পড়েনি। তাদের সাধারণ কথাও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তাদের চেহারা থেকেও কুরআনের নূর চমকায়। তাদের নিরবতা থেকেও শব্দ ঝরে পড়ে। তাদের হাঁটাচলা থেকেও হিদায়াত ঠিকরে বেরোয়।

৐৐৐৐

প্রতিদিনের কুরআনী 'হিব্ব' নিছক আমলনামায় সওয়াব বৃদ্ধির ইবাদত নয়। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। আত্মার জ্বালানি। তিলাওয়াতকারী যখনই অনুভব করে, সে আল্লাহর কালাম পড়ছে, তার মধ্যে অন্য রকম এক ঢেউ বয়ে যায়।

৐৐৐৐

যখনই মনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, বিশ্বাসে চিড় ধরতে চায়, চিন্তায় টালমাটাল অবস্থা তৈরি হয়, কুরআন নিয়ে বসে পড়ি। কুরআনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার প্রয়াস চালানো আরকি। এমন দুর্দিনে কুরআন আমার পাশে দাঁড়াবে। কুরআন আমাকে বাঁচতে শেখাবে।

৐৐৐৐

যখন কারো দ্বিধা-সন্দেহের জবাব দিই, তখন তার নির্দিষ্ট একটা সংশয় অপনোদন করার চেষ্টা চালাই। কখনো সফল হই, কখনো ব্যর্থ। কিন্তু একজন যুবককে যখন সরাসরি কুরআনের সাথে জুড়ে দেই, মূলত তাকে হিদায়াতের

‘খনিজ উৎসের’ সন্ধান দিয়ে দেই। সেটা হয় ‘স্থায়ী’ সমাধান। মজ্জাগত নিরোধক। আসলে তাকে একটা সুরক্ষিত দুর্গের বাসিন্দা বানিয়ে দেই।

□□□

নিয়মিত ‘হিব্ব’ আদায় করতে পারা, অনেক বড় সৌভাগ্যের প্রতীক। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট স্বীকৃতি। আল্লাহ আমাকে কুরআনের জন্য কবুল করে নিয়েছেন, তার বড় প্রমাণ। তখন আমি কিছু চাইলে, আল্লাহর কুরআনের উসিলায় কবুল করে নিবেন।

□□□

এক যুবককে চিনি, প্রতিদিন তিন পারা করে পড়বেই। মাসে তিনটা খতম তার নিয়মিত। সে বলে,

-খুব বেশি সময় লাগে না। সোয়া এক ঘণ্টা মাত্র।

কত স্বল্প শ্রমে কী বিরাট গনীমত! কল্পনা করা যায়?

□□□

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করি, তত বেশি বরকত লাভ করি। তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়ালেও সময়ের টান পড়ে না। সময়েরও বরকত বাড়ে। পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এখন প্রতিদিন দশ পারা করে পড়ি (জন্মের নেককার)

□□□

কুরআন তিলাওয়াত আমার সময়কে সংকুচিত করবে না, বরং সময়কে বরকতময় করে তুলবে। কুরআন কারীম যে (كِتَابُ الْمُبَارَكِ) বরকতময় কিতাব! এই কিতাব পড়লে কিভাবে জীবন বরকতহীন হয়? সময়ে টান পড়ে? কুরআন আমার ইলমে বরকত নিয়ে আসবে। রূহে বরকত সৃষ্টি করবে। সময়কে বরকতময় করে তুলবে।

□□□

কত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়! কত আপাত ভালো মানুষের মুখোশ খসে পড়ে! কত ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায়! আমরা যদি এদের সবাইকে কুরআনের সাথে পরিচিত করিয়ে দিতে পারতাম! ফলাফল ভিন্ন কিছু হত!

□□□

আমরা একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াব। তার আগেই আমাদের কলবে আল্লাহকে মজবুত করে বসাতে হবে। এর উপায় হলো, নিয়মিত হিব্ব’ আদায় করা। এজন্য প্রয়োজন সামান্য ইচ্ছা, বেশি কিছু নয়।



নবীজি ইন্তেকাল করেছেন। উম্মে আইমান রা. হাউমাউ করে কাঁদছেন। আবু বকর ও উমার রা. দু'জনেই তাকে দেখলেন। ধারণা করলেন, নবীজির বিচ্ছেদে কাঁদছেন। তবুও জানতে চাইলেন,

-কেন কাঁদছেন?

-কাঁদছি, ওহী যে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল!

উম্মে আইমানের এমন অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'জন চমকে উঠলেন। তাই তো! তাই তো! এবার দু'জনেও নতুন করে কাঁদতে শুরু করলেন।



বঞ্চিত কে? যে মনে করে কুরআন তিলাওয়াত শুধু সওয়াবের জন্য। কুরআন থেকে কোনও ইলম ও ফাহম সে অর্জন করে না।



আমাদের যুগের অন্যতম 'সালিহ' কে?

-যে দূরের কোনো সফরে বের হয়। নামাযের সময় হলে গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করায়। জায়নামায বিছিয়ে নামায আদায় করে নেয়। কুরআন কারীম খুলে আজকের হিবব তিলাওয়াত করে। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেয়।



কিছু মানুষ আছেন। এই যামানাতেও, রাতের আঁধার গভীর হলে, তারা কুরআনের সাগরে ডুব দেন। আয়াত আয়াত করে তিলাওয়াত করেন। আল্লাহর সাথে গভীর আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। লাভ করতে থাকেন হীরে-জহরত।



নতুন কোথাও গেলে, সব আওয়াজ ছাপিয়ে যখন কুরআনের আওয়াজ ভেসে আসে মনে হতে থাকে, বাকী সব আওয়াজ শুধুই হৈ চৈ! চিল-চিৎকার! একমাত্র কুরআনই সত্য।



কুরআনের নুরানী আবহে যদি কোনো প্রজন্মকে গড়ে তোলা যায়, তারা হবে কালের জন্য এক জীবন্ত মু'জিয়া। তাদের জাগতিক আর কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে না।



কুরআনের আয়াত অত্যন্ত পবিত্র। তার নুরানী সংস্পর্শে কলবের যাবতীয় ময়লা দূরে হয়ে যায়। চোখ থেকে গুনাহের পর্দা সরে যায়। পুরো শরীর হয়ে ওঠে পূত-পবিত্র।



কুরআন এক আলোকিত কিতাব। তার আলো সর্বপ্রাণী। সে তুলনায় সূর্য একটা চেরাগ মাত্র। চাঁদ ছোট্ট এক মোমবাতি মাত্র।



কুরআনহীন পৃথিবী হলো ডানাহীন পাখির মতো। ভঙ্গুর। নৈরাজ্যপূর্ণ। বিশৃঙ্খল। রহমতবিচ্ছিন্ন।



কুরআন মানুষকে একদিকে তার অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আরেকদিকে সৃষ্টি করে হিম্মত! দুনিয়া ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উত্তরণের অসীম পিয়াস তৈরী করে।



কুরআন আমাদের জন্য খুঁটিস্বরূপ। ঘূর্ণিঝড় এলে নড়বড়ে ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়। নিয়মিত 'হিবব' আদায় করলে, গোমরাহী-ভ্রষ্টতার শত তুফান এলেও আমাদেরকে উড়িয়ে নিতে পারবে না। সে তুফান যত আচানকই আসুক, একচুলও নাড়াতে পারবে না।



কুরআনের সমর্থন ছাড়া কোনও নসীহত যত সুন্দরই হোক তা বাতিল বলে গণ্য। কুরআনের অনুমোদন ছাড়া কোনো 'চিন্তা' যতই আকর্ষণীয় হোক, তা সন্দেহজনক, অনিরাপদ। আল্লাহ তা'আলার কথাই চূড়ান্ত।

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

সুতরাং এরপর আর এমন কী কথা আছে, যার ওপর তারা ঈমান আনবে? (মুরসালাত: ৫০)



কুরআন কারীম নিয়ে যত কথাই বলি, যত আলোচনাই করি, সে তাদাক্বুর, ই'জায, হিদায়াত, মর্যাদা যে বিষয়েই হোক, যদি নিয়মিত 'হিবব' আদায় না করি, সেসব উচ্চাঙ্গের গবেষণা আমাকে খুব বেশিদূর নিয়ে যাবে না।

৐৐৐

আমাদের কুরআন দরসে একবার শায়খ তিলাওয়াত করতে বললেন। এক ইন্দোনেশিয়ান সাথী তিলাওয়াত করল। সূরা মুমিনুন থেকে। মানবসৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আয়াতগুলোতে। পুরো ক্লাস একেবারে কেঁপে উঠেছিল তার তিলাওয়াতের লাহন ও আয়াতের অর্থের মিশেলে তৈরী হওয়া ঘোরলাগা আবহে। (সুলাইমান আব্বুদী)

৐৐৐

কুরআন নাযিল হয়েছে গারে হেরায়। রাসূলে আরাবীর ওপর। আর এখন বাঙলার প্রত্যন্ত গাঁয়ের এক ছোট্ট শিশু তা তিলাওয়াত করছে। পরিপূর্ণ তাজভীদ মেনে! এ-এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

৐৐৐

দেখে দেখে তিলাওয়াত করা সবার পক্ষে সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু শোনা তো সম্ভব! ঘরে, বাইরে! গাড়িতে। অফিসে। মোবাইলে। আইফোনে। ট্যাবে।

৐৐৐

ইসলাম সম্পর্কে যাদের পূর্ব কোনো ধারণা নেই। তারা যখন ইমামগণের কিতাবাদি পড়েন আর দেখেন তাদের রচিত হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রতিটি কথা কুরআনের আয়াত দিয়ে প্রমাণিত! তাদের এ-ধারণা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়,
- কুরআন কারীম নিশ্চয় অনেক খণ্ডে রচিত কোনো গ্রন্থ।

অথচ কুরআন কারীম মাত্র ছয়শ পৃষ্ঠার।

৐৐৐

জীবন অনেকগুলো সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টার সমন্বয়। প্রতিদিন যতবেশি সম্ভব সেকেন্ডগুলো কুরআন দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টায় কমতি করব না। অলসতা করব না। ইনশাআল্লাহ।

৐৐৐

জীবন শুরু হোক কুরআন দিয়ে। শেষও হোক কুরআন দিয়ে। কুরআনে আছে ইলম। আলো। হিদায়াত।

৐৐৐

কুরআন কারীম হলো (بَارِدٌ مَّائِلٌ) শীতল পানির মতো। হৃদয়কে ধুয়েমুছে স্বচ্ছ ঝকঝকে করে দেয়। কুরআন কারীম এমন পানি, যা পান করলে মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহেও প্রাণসঞ্চার হয়।



যারা কুরআন কারীম ছেড়ে দেয়, কুরআন কারীমের প্রতি অবহেলা দেখায়, তাদের ব্যাপারে নবীজি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। আমি যদি কুরআন কারীমকে অবহেলা করি, এড়িয়ে চলি, নবীজির সেই অভিযুক্তদের তালিকায় পড়ে যাবে না তো? তিনি বলেছিলেন,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। (ফুরকান: ৩০)



এক বুয়ুর্গ বলেছেন,

-কুরআন কারীম নির্ভরযোগ্য সুপারিশকারী। শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। অনুপম উদার দাতা। কুরআন কারীমের সাথে কথা বলে বিরক্ত হতে হয় না। যতবেশি সময় কুরআনের সাথে কাটাব, ততই আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।



জেদ্দার এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জরিপ চালানোর পর বের হয়েছিল, ৯৮% ভাগ ছাত্রই মসজিদে কুরআনী হালকাগুলোতে ভর্তি হয়েছে। হিফয করবে। কুরআন নূর। এই আলো শিশুদেরকে দিতেই হবে।



অনেক বুয়ুর্গ আছেন, প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে একপারা করে তিলাওয়াত করেন। গভীর রাতে আল্লাহর সাথে কথা বলেন।



প্রতি নামাযের পর চার পৃষ্ঠা করে তিলাওয়াত করলে, পাঁচ নামাযে একপারা। প্রতি নামাযের পর মাত্র চার মিনিট সময় বরাদ্দ করলেই হবে।



পরীক্ষা করে দেখতে পারি, দিনে কুরআন কারীমের সাথে এক ঘণ্টা সময় কাটালে, পরিস্থিতি যতই সংকটাপন্ন হোক সারাদিন সময়টা সহজে কেটে যাবে। পাশাপাশি বরকত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে হাত পাতলে, সেটা খালি ফিরবে না।



কুরআনের আয়াতগুলো পানির মতো। প্রতিদিন যদি আয়াতের নদী দিয়ে কলব ধৌত করি, ময়লা কিছু থাকবে বলে মনে হয়?



আমি যতবারই প্রতিদিনের নির্দিষ্ট 'হিব্ব' বাদ দিয়েছি, তার খারাপ প্রভাব হাতেনাতে পেয়ে গেছি। দীর্ঘসময় পরে হলেও এর প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যায়। (শায়খ আবু মালেক)



নিজেকে কুরআন কারীমের সাথে সম্পৃক্ত দেখলে, আল্লাহর শুকরিয়ায় সিজদায় লুটিয়ে পড়া উচিত। এর মতো নেয়ামত আর কী হতে পারে? এমন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে, আল্লাহর কাছে নিয়মিত দু'আয় লেগে থাকা জরুরী! তিনি যেন এই মহা নেয়ামত দ্বারা আমাকে ভরপুর করে দেন।



কুরআন এসেছে জীবনের সংবিধান হওয়ার জন্য। সর্বতোকরণে কুরআনের অভিযুক্তী না হলে, কুরআন তার ভান্ডার খুলে দেয় না। কুরআনের আয়াতে একটা প্রাণ আছে, এই প্রাণ তিলাওয়াতকারী নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে। এটা হলো আল্লাহর মারেফাতের প্রাণ। যা বান্দাকে কর্মমুখী করে তোলে।



কুরআন প্রথম দিন থেকেই গোটা আরবকে জাদুগ্রস্ত করে ফেলেছে। যে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাকেও মুক্ত করেছে। কলব-শ্রবণ ও দৃষ্টির ওপর আবরণ থাকার কারণে যে ঈমান আনেনি তাকেও কুরআন মুক্ত করেছে।



প্রথম দিকে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে দেখলে বোঝা যায়, কুরআন কারীম তাদের ঈমান আনার পেছনে অন্যতম কারণ হিশেবে ভূমিকা পালন করেছে। আবার চারদিকে দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে কুরআন নিজেই শক্তিশালী দাঈ হিশেবে কাজ করেছে।



আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ব-ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বিপ্লব সাধন করেছেন। কুরআনের প্রভাবে আরবরা নিরক্ষর জাতি থেকে সারা বিশ্বের শিক্ষকে পরিণত হয়েছে। নেতায় পরিণত হয়েছে।



গভীর রাতে, দূর থেকে ভেসে আসা কুরআনের সুরেলা আওয়াজ হৃদয়তন্ত্রীতে অন্যরকম ঢেউ তোলে। জন্ম দেয় অন্য রকম এক ভালোলাগার অনুভূতির।



কুরআন ছাড়া দ্বীন-দুনিয়ার হাকীকত জানা অসম্ভব। কুরআন ছাড়া হাকীকত জানার যত মাধ্যম আছে, সবগুলোই ভেজালপূর্ণ।



কুরআন কারীম কখনো পুরাতন হবে না। কখনো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুরআন কারীমের মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় আমাদের অনুভূতির। কুরআন কারীম কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আমাদের ঈমান।



কুরআন কারীমের প্রাত্যহিক 'হিব্ব' আদায়ের সবচেয়ে নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত সময় হলো মাগরিব থেকে এশা। এ-সময়টাকে কুরআন পাঠের জন্য বরাদ্দ করলে, শিথিল হওয়ার অবকাশ কম। তবে কর্মব্যস্ততা থাকলে এশার পরও হতে পারে। মাগরিবের পর হলেই বেশি ভালো। তাহলে এশা পড়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া যাবে।



অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছি: এবার থেকে আর 'হিব্ব' ছুটতে দেব না। কিন্তু তারপরও ছুটে যায়। ছুটে যাক। ছুটে গেলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে।



নিঃসন্দেহে কুরআন কারীম আসমানী রহস্য। দুনিয়াতে নেমে আসা আল্লাহর নূর। এ নূর কেয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে। কুরআন তার চিরন্তন অর্থময়তা নিয়ে টিকে থাকবে।

□□□□

কুরআন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এক কিতাব। কত মানুষ হৃদয় বদ্ধ করে রেখেছিল, তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। কুরআন অনায়াসে সেই তালা ভেঙে তার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে। কত কুরআনবিরোধী বিবেক ছিল। সেগুলো কুরআনের বিরুদ্ধে নিজেদের বিবেক শয়তানের কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কুরআন অবিশ্বাস্য শক্তিতে সেই বিবেকে হিদায়াতের আলো জ্বলে দিয়েছে।

□□□□

আল্লাহ তা‘আলারও নিজস্ব একটা দল আছে। হিবুল্লাহ (حزب الله)। আমি প্রতিদিন পড়ার জন্য কুরআন কারীমের নির্দিষ্ট একটা অংশ ঠিক করে নিব। সেটাই হবে আমার ‘হিবব’। এর মাধ্যমে আমিও হিবুল্লাহর সদস্য হওয়ার পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাব।

□□□□

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতকারী হকের লাগাম ধরে থাকে। হিদায়াতের উৎসমুখে বসে থাকে। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুদৃঢ় হাতল (العروة الوثقى) ধরে থাকে। বিনিময়ে তারতীলের মধু পান করতে থাকে। তানযীলের সুবাস পেতে থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কুরআনি মৌচাকে মুখ লাগিয়ে তৃপ্ত হতে থাকে আর উর্ধ্বজগতের (السلالة) দিকে আরোহণ করতে থাকে।

□□□□

কুরআনের ‘হিবব’ উত্তম জীবনের সঙ্গী। সফল জীবনের অন্যতম অনুষ্ণ। এই অনুভূতি জাগরুক থাকলে আমাদের নিত্যদিন কুরআন নিয়ে বসা সহজ করে তুলবে। তিলাওয়াতের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটাবে।

□□□□

প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের সর্বনিম্ন একটা সীমা নির্ধারণ করে রাখা উচিত। পৃথিবী উল্টে গেলেও যা আদায়ে শিথিলতা আসবে না। আর তিলাওয়াত কত বেশি হবে? তার কোনো সীমা নেই।

□□□□

ফজরের পরের সময়টাও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারণ করা যায়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেলে এ-সময় তিলাওয়াত আসানির সাথে করা যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো অবস্থাতেই তিলাওয়াত ছেড়ে না দেয়া। সময়টা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুবিধামতো তিলাওয়াত করলেই হলো।

□□□□

ভালো করে তিলাওয়াত করতে পারলে, বিশ মিনিটে একপারা তিলাওয়াত করা সম্ভব। বিশটা মিনিটও কি আল্লাহর জন্য বের করা যাবে না? ত্রিশ মিনিট হলে আরও ভালো।

□□□□

আমাকে যদি বলা হয়, তোমাকে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করতে হবে। তাহলে আমি বেছে নেব, সূরা হূদের শেষ ২৪ আয়াতকে। (শায়খ খালেদ)

□□□□

কুরআন কারীমের বেশির ভাগ আয়াতই সর্বজনবোধ্য। একদম নিরক্ষর অশিক্ষিতও বুঝতে পারবে। শানে নুযুল জানা, ইলমুল কিরাত জানা থাকা, শব্দ ও তাফসীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যে ডুব দেয়ার জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এমন হলে কুরআন হতো শুধু শিক্ষিত মানুষের কিতাব।

□□□□

বেশি বেশি তিলাওয়াতের মাধ্যমে, বান্দার মধ্যে এক ধরনের সুখময় অনুভূতি তৈরি হয়। স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়। কুরআনী অর্থের অব্যক্ত এক অনুভব তৈরি হয়। যা শত তাফসীরের কিতাব পড়লেও হয় না।

□□□□

বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত মানে?

ক. মহা শক্তিশালী রবের সাথে দুর্বল বান্দার স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন।

খ. সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠত্ব, সুমতি লাভের কল্যাণকর মানহাজ (তরীকা)-এর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন।

□□□□

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, বান্দার মনে শয়তান অনুপ্রবেশের সবচেয়ে শক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত পথ হলো, মনে দ্বিধা তৈরি করে দেয়া।

-তিলাওয়াত করব নাকি গভীর অনুধ্যান (তাদাব্বুর)-এ ডুবে গিয়ে কুরআনের অর্থের সাগরে ডুব দিব?

বান্দা যখন নিয়মিত তেলাওয়াত করে, শয়তান তখন তার মনে তাদাব্বুরের চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। কিছুদিন পর তাদাব্বুর তো যায় যায়, তিলাওয়াতও যায়। (শায়খ আলী আলফীফি)

□□□

বান্দা যখন তিলাওয়াতের প্রতি মনে উদ্যম খুঁজে পায়, শয়তান তখন তার সামনে একটা তালিকা হাজির করে, তাতে জ্বলজ্বল করে লেখা থাকে, কুরআন তাদাব্বুরের কী কী ফযীলত। আমি বলি কি, তাদাব্বুরও প্রয়োজন। তবে সেটা হতে পারে যখন তিলাওয়াতের আগ্রহ শেষ হবে তখন। এখন তিলাওয়াতের প্রতিই মনোযোগী হওয়া শ্রেয়। (শায়খ আলী আলফীফি)

□□□

কুরআন তাদাব্বুরের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো, বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াত করতে করতেই তাদাব্বুরের পথ খুলে যাবে। কোন ফাঁকে যে হয়ে যাবে, টেরটিও পাওয়া যাবে না (শায়খ আলী আলফীফি)

□□□

আমি কখন দৈনিক 'হিব্ব' আদায় করতে সক্ষম হবো?

- যখন আমি আমার জীবনকে আরো সুন্দর আরো পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেহনত করতে পুরোপুরি প্রস্তুত হব।

□□□

দৈনিক তিলাওয়াতের সময় হয়ে গেছে। কুরআন আমাকে ডাকছে। এসো, তিলাওয়াতে বসে যাও! কিন্তু অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যস্ততার কারণে আজ আর বসা হচ্ছে না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে! এই অশ্রুবিন্দুটা আল্লাহর কাছে কতোই না প্রিয়?

□□□

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের কি কি উপকার, তা সব সময় মনে উপস্থিত রাখলে, কখনো তিলাওয়াত ছুটে গেলে, তারকাযা আদায় করে নিলে, নিয়মিত হিব্ব আদায় করা সহজ হয়ে ওঠে। তবে নিজের সামর্থের বাইরে 'হিব্ব' নির্ধারণ করা ঠিক নয়।

□□□

নবীজি উপদেশ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে দিয়েছেন। তিনি যেন প্রতি মাসে একখতম কুরআন তিলাওয়াত করেন। ইবনে উমর বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি তিলাওয়াত করার সামর্থ্য রাখি। নবীজি মেয়াদ আরেকটু কমিয়ে দিলেন।

এভাবে কমাতে কমাতে শেষে এসে বললেন,
-তিনদিনে এক খতম কোরো।

□□□

কুরআন তিলাওয়াত করব বসে-বসে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, হেঁটে-হেঁটে। সালাতে।
আগে আগে মসজিদে গিয়ে। নামাজের আগে না পারলে, পরে। তাহলে দুইটা
ফযীলত; তিলাওয়াত ও মসজিদে সময় কাটানো।

□□□

সালাফের অনেকে সপ্তাহে একখতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাদের
তরিকা ছিল,

সূরা ফাতেহা থেকে নিসা।

মায়েদা থেকে তাওবা।

ইউনুস থেকে নাহল।

ইসরা থেকে ফুরকান।

শু'আরা থেকে ইয়াসীন।

সাফফাত থেকে হজুরাত।

ক্বফ থেকে নাস।

□□□

কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে মনটা অনেক সময় বিক্ষিপ্ত থাকে। আন্তে আন্তে
অগ্রসর হতে হতে মনটা কুরআনে ডুবতে শুরু করে। আল্লাহর রহমত হলে,
তিলাওয়াতকারীর ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা থাকলে, একসময় দেখা যায়,
কুরআনের এই তিলাওয়াত, তার অন্তর থেকে সব কলুষতা বের করে দিয়েছে।
তিলাওয়াতকারীর 'দিলে' একমাত্র আল্লাহ আছেন। আর কিছু নেই।

□□□

এরচেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে, দীর্ঘ সময় লাগিয়ে তিলাওয়াত করি,
কুরআনের অর্থ মোটামুটি বুঝিও, কিন্তু তিলাওয়াতশেষে দেখা গেল, আমি শুধু
চুলেছি। আমার মধ্যে কুরআনের কোনো 'রস'-ই প্রবেশ করেনি।
তিলাওয়াতশেষে আমি বলতে পারছি না, এতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা আমাকে
এতক্ষণ কী আদেশ করেছেন, কী নিষেধ করেছেন! এটা কোন ধরনের
তিলাওয়াত? তবে হ্যাঁ, আমি যদি কুরআন কারীম মোটেও না বুঝতাম, তাহলে
ভিন্ন কথা। মোটামুটি অর্থ বোঝার যোগ্যতা নিয়েও কেন মনোযোগহীন অন্ধ
তেলাওয়াত করবো?



আমি কুরআন কারীম থেকে সবচেয়ে বড় যে উপকার লাভ করেছি তা হলো, আমার আব্বা আমাকে নসীহত করেছিলেন,
-বাবা, কুরআনকে এমনভাবে পড়ো যেন তা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।
(আল্লামা ইকবাল)



কুরআন কারীমের নিজস্ব কিছু বর্ণনাভঙ্গি আছে। সেগুলো জানলে তাদাব্বুর করতে সুবিধা হয়। কুরআন কারীম থেকে জ্ঞান আহরণ করা সহজ হয়।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে:

-কুরআন কারীম যেখানেই কোনো নবীর কোনো 'ভিন্নধর্মী আচরণ (ذنب)-এর কথা বলা হয়েছে, সাথে সাথে উক্ত নবীর তাওবার কথাও আলোচিত হয়েছে। এই তথ্যটা জানা থাকলে, তিলাওয়াত-তাদাব্বুরের সময় খুঁজতে পারব, কোথায় আছে তাওবার কথা? আশেপাশে কোথাও অবশ্যই আছে সে নবীর তাওবার কথা।



তাদাব্বুরের সহায়ক আরেকটা দিক বলা যায়; যেখানেই কোনো ত্যাগ দেখা যাবে, ভেবে নিতে হবে, এই ত্যাগ বা কুরবানির পুরস্কারটা কি? এবং সেটা কোথায় বর্ণিত হয়েছে? এবং মিলিয়ে দেখা যেতে পারে, একজনের কুরবানীর পুরস্কার আরেকজনের কুরবানীর পুরস্কারের সাথে মিলছে কি না।

আবার দেখতে হবে, একজন আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি পুরোপুরি ইয়াকীন প্রকাশ করেছেন, তাহলে আরো যারা ইয়াকীন প্রকাশ করেছেন, তাদের ফলাফলের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি না। যেমন, মূসা আ.-এর মায়ের সন্তান হারিয়ে যাওয়ার পরের ইয়াকীন আর ইবরাহীম আ.-এর সন্তান যবেহ করার সময়কার ইয়াকীন এবং ইয়াকুব আ.-এর সন্তান খোয়া যাওয়ার পরের ইয়াকীনের ফলটা কেমন? সবগুলোর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়?



আরো চিন্তা করা যেতে পারে, কুরআন কারীমে ইয়াকীনের জন্য যে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, তার কারণ কী? আরো ভাবা যায়, ইয়াকীন অর্জনের চাবিকাঠি কী? এসবের উত্তর কুরআনী আয়াত ও ঘটনাগুলো থেকেই বের করা।



আরো চিন্তা করে দেখা যেতে পারে, কুরআন কারীমে যাদের তাওবা কবুলের বর্ণনা এসেছে, কী কারণে তা কবুল করা হয়েছে? তাদের তাওবা ও তাওবা কবুলের মাঝে যোগসূত্রটা কি?



বান্দাকে কখনো কখনো শাস্তি দেয়া হয় গাফলতে ফেলে বা কুফুরে নিমজ্জিত করে। কখনো কলবে মোহর মেরে কিংবা লাক্ষিত করে। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, এই শাস্তির কারণগুলো কী? কেন বান্দাকে গাফলতে পড়ে থাকার শাস্তি দেয়া হয়? কারণ খুঁজে বের করার পর আমার প্রধান কাজ হলো, আমাকে যেন এই শাস্তি না পেতে হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। এই শাস্তি ও আমার মাঝে শক্ত একটা দেয়াল তুলে নেয়া।



কুরআন পড়লে কান্না আসা চমৎকার ঘটনা। কিন্তু এটাই যেন একমাত্র বিষয় না হয়ে যায়। আগের যুগের সালেহীন কুরআন পড়ে শুধু কাঁদতেনই না, প্রতিটি আয়াত থেকে হিদায়াতও সংগ্রহ করতেন।



কুরআন পড়ব। কেন পড়ব? আমার আল্লাহ আমার কাছে কী চান, সেটা জানার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন ইসলাম মানতে বলেছেন সেটা জানার জন্য। কোন পরিণতির দিকে আমি তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছি সেটা জানার জন্য।



আল্লাহর দ্বীনের অনুসারীদের ওপর যে বিপদই আসুক, আল্লাহর কিতাবে তার সমাধান দেয়া আছে। একটু কষ্ট করে খুঁজে নিতে হবে।



রুগি ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেখছে, ডাক্তারের হাতে কুরআন। তিলওয়াতে মগ্ন। ক্রেতা দোকানে গিয়ে দেখি, দোকানদার পণ্যদ্রব্যের স্তরের আড়ালে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে। রুগি বা ক্রেতা যাওয়ার পর কুরআন বন্ধ করে এগিয়ে এসেছে। এমনটা হলে কেমন হতো!



নেটে বা চ্যাটে থাকলেও সময় হলে বলে, আমার এখন তিলাওয়াতের সময়। আপাতত সাইন আউট করছি! আড্ডায় আছে। সময় হলে উঠে পড়ে বলে, আমার এখন তিলাওয়াতের সময়। আর থাকা সম্ভব নয়। আমি উঠছি! এই মানসিকতার মানুষের বড় অভাব।



সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম পরিচয় কি? তারা সূরা বাকারা, আলে ইমরান মুখস্থ করেছেন। গুনিয়েছেন নবীজির কাছে। তারপর নবীজির কাছে কুরআনের অর্থ শিখেছেন।



সুফিয়ান সাওরী রহ. দীর্ঘ সময় কুরআন কারীমের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যেদিন তাকাতে পারতেন না, কুরআন কারীমকে বুকের ওপর রাখতেন। তিনি বলেছেন,

-আমার মনে চায়, কুরআন নিয়েই পড়ে থাকি, অন্য কিছুই কাছে ধারেও না ঘেঁষি!



একজন মুফাসসিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? কুরআন কারীম নিয়ে সময় কাটাতে আনন্দ পাওয়া। আর কুরআন নিয়ে সত্যিকার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হয়, বেশি বেশি তিলাওয়াতের মাধ্যমে!



আমি এক অন্ধ ছাত্রকে দেখেছি। সব সময় তার ঠোঁট অনবরত নড়ে চলছে। শায়খ সা'দির দরসে বসত। সাথীরা তার পাশে বসে গল্প করছে, কিন্তু মানুষটা সমানে তিলাওয়াত করেই যাচ্ছে। কেউ কিছু জানতে চাইলে উত্তর দিচ্ছে। আবার তিলাওয়াতে ডুবে যাচ্ছে। (সালেহ আব্দী)



মানুষটাকে দেখতাম, সবজি বাজারের এক কোণে বসে নীরবে সবজি বিক্রি করত। বয়েস পঞ্চাশ হবে প্রায়। বেশিও হতে পারে। হঠাৎ মানুষটার মনে কুরআন শেখার আগ্রহ তৈরি হলো। বেদুঈন, লেখাপড়া জানে না। কুরআন শেখার জন্য বুড়ো বয়েসে চক-স্ট্রেট নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করলো। অল্পদিনেই কুরআন পড়তে শিখল। এরপর ক্বারী শায়খ মুহাম্মাদের দরসে

বসতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কেরাতে দক্ষতা অর্জন করল। ওদিকে সবজির ব্যবসাও চলছে।

■

দেখা গেছে, দোকান খুলে পসরা সাজিয়ে বসে আছে। কিন্তু হাতে খোলা কুরআন। দুলে দুলে পড়ছে। অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। খদ্দের এসে দরদাম করছে, ভ্রক্ষেপ নেই। খদ্দের বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করে বলছে, -আরে বুড়ো, কুরআন পড়বে তো বাজারে কেন এসেছ? মসজিদে যাও! বাজারে বসেছ ব্যবসা করতে, মনদিল লাগিয়ে ব্যবসা কোরো!

■

এভাবেই চলতে লাগল। মানুষটা এই বয়েসেই হাফেয হয়ে গেল। লোকজন ধরাধরি করে তাকে বাজার মসজিদের ইমাম বানিয়ে দিল। এবার মানুষটার কুরআন পাঠ আরো বেড়ে গেল। আমি একবার তার অজান্তেই তিলাওয়াত অনলাইনে প্রচার করেছি। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে সেটাকে 'অন এয়ার' করে দিয়েছি। শ্রোতারা ভীষণ মুগ্ধ! অনুপ্রাণিত! এসএমএস করে কত মানুষ জানিয়েছে, তারা হিফয শুরু করেছে! মনে একটু হলেও সান্ত্বনা পেলাম, না বলে প্রচার করে অন্যায় করেছি, কিন্তু অনেক মানুষ তো ঘটনাটা জানতে পেরে হিফয শুরু করেছে! আরও অনেক নিরক্ষর বেদুঈন তাকে দেখে কুরআন শিখতে আগ্রহী হয়েছে, এটাই বা কম কিসের!

■

মানুষটার নাম সু'আইদি। একজন সাধারণ নিরক্ষর হয়েও তিনি কোথায় পৌঁছেছেন! সবজি বাজার থেকে একেবারে মিশরের চূড়ায়! তার অনড় অবিচল লেগে থাকা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর আল্লাহর তাওফীক তাকে উচ্চ আসনে বসিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন করেছিলাম,

-হিফয তো শেষ হয়েছে, এখন দৈনিক কত পারা করে পড়েন?

-কমপক্ষে পাঁচ পারা। বাজারে মসজিদে যেখানেই থাকি, কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করি না। করতে ইচ্ছে করে না। তিলাওয়াত আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হয়ে গেছে। কারো সাথে কথাও বলতে ইচ্ছে করে না। শুধু তিলাওয়াত করতে মন চায়। (ফাহদ সুনাইদি)

■■■■

কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বাধা বা সমস্যা এলে, সময়ের সংকীর্ণতা বা তিলাওয়াতের সামর্থ্য বা অবসর পাওয়া বা সুযোগ পাওয়া নয়, মূল বিষয় হলো

‘হিম্মত’ বা ইচ্ছাশক্তি। এটা থাকলে আর কিছু লাগে না। ইচ্ছা থাকলে কখনোই সময় ও সুযোগের অভাব হয় না।

□□□□

এক আমেরিকানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

-কেন ইসলাম গ্রহণ করলে?

-সূরা বাকারার শুরুতেই আছে, এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই! এটা পড়ে আমি ভীষণ চমকে গিয়েছি। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস না থাকলে, কারো পক্ষে এভাবে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়। আর এমনটা সম্ভব কেবলই আল্লাহ পক্ষে।

□□□□

কুরআনের সৌন্দর্য, তার বর্ণনাভঙ্গি এমন, কোনো কলম লিখে প্রকাশ করতে পারবে না। (জনৈক নওমুসলিম)

□□□□

আমি ফরাসি ভাষায় অনুদিত একটা কুরআনের অর্থের তরজমা কিনেছি। আমি মনে করি, আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে মূল্যবান। জনৈক খ্রিষ্টান। (উইলিয়াম সার্ভে)

□□□□

আমি বাজার থেকে একটা কুরআন কিনে আনলাম। শুরু থেকেই পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে তৃতীয় সূরা শেষ করার আগেই অজান্তে আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। এটাই ছিল আমার আমার প্রথম ‘সালাত’। (জনৈক নওমুসলিমা)

□□□□

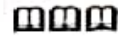
আমি তখন মক্কায়। হারামে প্রায়ই এক বৃদ্ধকে দেখতাম। বয়সের ভাসে কুঁজো হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করেই যাচ্ছে। আসরের পর শুরু করেছে। এশা পর্যন্ত তিলাওয়াত করেই গেছে। পিঠের ব্যথা, দৃষ্টির স্বল্পতা নিয়েই। (মুহাম্মাদ মু‘তাবি)

□□□□

রমযানে ওমরায় গিয়েছি। এক অন্ধকে দেখলাম, বসে বসে তিলাওয়াত করছে। প্রতিদিন আসর থেকে এশা পর্যন্ত একটানা। (আবদুল্লাহ ওফাইলি)



মাদরাসা (স্কুল) ছুটি হয়ে গেছে। ছেলেদের কেউ খেলছে। কেউ বাড়ির পথ ধরেছে। একটা ছেলেকে দেখলাম মাঠের একপাশে বসে বসে কুরআন খুলে তিলাওয়াত করছে। বিকেলে মসজিদে কুরআনী হালকার পড়া ইয়াদ করছে। (মাজেদ গামেদী)



কাজের চাপ বেশি এজন্য কুরআন তিলাওয়াত করা যাচ্ছে না! মনে রাখতে হবে, এটা একটা ঠুনকো অজুহাত।



কুরআন নিয়ে লেখা কি শেষ করা যায়! সাত সাগরের পানি ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত কলম ভেঙে যাবে, আল্লাহর কালাম ফুরোবে না।



ଆଇଁ ଲାଭ ଇଡ଼ି!
ଗୁହଟ ହାଟ!

আমরা অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। অনেক সময় অতিভক্তির কারণে ছোট ছোট আমল বাদ পড়ে যায়। বড় বড় আমল থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি। স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাহত হয়।



আমাদের মাদরাসায় একটা নিয়ম, আরবী তারিখ মিলিয়ে এক পারা তিলাওয়াত করা। আমরা প্রতি নামাযের আগে-পরে, সময়ের ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট পারাটা তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি। হাফেযদের একটা পারা ভালো করে পড়লে সর্বোচ্চ বিশ মিনিট লাগে। তবে ত্রিশ মিনিটে হলে তিলাওয়াতের মান ভালো হয়। প্রতি ওয়াক্তে চার পৃষ্ঠা বরাদ্দ করলে, পাঁচ নামাযে বিশ পৃষ্ঠা। সুন্দর ও সহজ।



নামাযের আগে, জামাত দাঁড়ানোর অপেক্ষার সময়টাতে, বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা খুবই প্রিয় একটা শখ। সেদিনও তিলাওয়াত করছিলাম। ইকামত হলো। কুরআন কারীমখানা রেহালের ওপর রেখে নামাযে দাঁড়াতে যাব পাশ থেকে এক ভাই বলে উঠলেন,

-হযুর কোরান শরীফটা এভাবেই রেখে দিলেন যে?

তাকিয়ে দেখলাম, প্রশ্নকারী ঢাকার এক স্বনামধন্য সরকারি হাসপাতালের উচ্চপদস্থ ডাক্তার। বললাম,

-কেন কী হয়েছে?

-কোরান শরীফ ওপরে তুলে রাখুন। নিচে রেহালের ওপর রাখলে কুরআন শরীফের অসম্মান হবে।

এতক্ষণ কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটিয়ে, মনকে জোর করে সালাতমুখী করে তুলেছিলাম। তার অতিভক্তিমূলক ভ্রমসনামাখা নির্দেশনা আমার বিনশ্রুভাব মাটি করে দিল। নামাযের মধ্যেও ভাবনাটাকে আটকাতে পারলাম না। আমরা কুরআন কারীমকে বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে, একেবারে আলমারিতে গিলাফবদ্ধ করে রেখে দিই। কুরআন কারীম থাকবে হাতে-পকেটে। নাগালের মধ্যে।

ডাক্তার সাহেবের কথামত যদি কুরআন কারীমখানা রেহালের ওপর না রেখে, উঠে গিয়ে তাকে রেখে আসি, নামাযের পর কিভাবে পড়বো? অনেক সময় এমন হয়, আমার সুন্নত পড়া শেষ, কিন্তু পেছনে আরেকজন তখনো তন্ময় হয়ে নামায পড়েই চলেছেন। এই সময়টুকু আমি বসে না থেকে, হাত টেনে কুরআন কারীমখানা নিই। দূরের তাকে রেখে এলে সেটা কীভাবে সম্ভব হবে? শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে কুরআন কারীম নিয়ে থাকাই কি ভালো নয়? মুখস্থও পড়া যায়, কিন্তু কুরআন কারীম হাতে নিয়ে, দেখে দেখে পড়তেই বেশি ভালো লাগে। হাতের নাগালে না থাকলে কি সেই তরতাজা আমেজ পাওয়া যায়? বর্তমানে কুরআন কারীম পড়ার কতশত মাধ্যম আছে। মোবাইলে পড়া যায়। কম্পিউটারে পড়া যায়। কিন্তু কাগজের ছাপা কুরআন কারীম হাতে নিয়ে পড়লে নিজের মধ্যে যে পবিত্র অনুভূতি তৈরি হয়, নবউদ্ভূত ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে তার ছিটেফোটাও পাওয়া যায় না।

□□□□

কুরআন কারীম বুকে লাগিয়ে বসে থাকতে কী যে আনন্দ লাগে, বলে বোঝানো যাবে না। যখন হাফেয হয়ে বের হয়েছি, কী এক প্রয়োজনে, কুরআন কারীমকে একদম বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলাম। সেদিন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কুরআন কারীমকে বুকের সাথে চেপে ধরার সাথে সাথেই, পুরো শরীরে কিসের যেন শিহরণ বয়ে গেল। শিরা-উপশিরায় রক্ত-কণিকার ছোটোছুটি শুরু হয়ে গেল। মনে হলো আমার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। সেই থেকেই, মন খারাপ হলে, কোনো সমস্যায় পড়লে, কুরআন কারীমকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। ভালো লাগে। স্বস্তি পাই। নিরাময় বোধ হয়।

□□□□

একেবারে যখন ছোট, নাযেরা পড়ি। একদিন দেখলাম মাদরাসার ছুরুরা রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে খবর শুনছেন। খবর শেষ হওয়ার পর, মামাকে দেখলাম অবোরে কাঁদছেন। কে মারা গেলেন?

-পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হয়েছেন। ইসরায়েলের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদের' পাতা টাইম বোমা বিস্ফোরণে।

তখন একটা বিষয় আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল, জেনারেল জিয়ার পুরো শরীরটাই পুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বুকপকেটে থাকা ছোট্ট কুরআনখানা পোড়েনি। তথ্যটা সেই অবুঝ বয়েসেই মনের মণিকোঠায় ঠাই করে নিয়েছিল। মনের মুকুরে সেদিন থেকে একটা ইচ্ছা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল,

-আমিও সবসময় সাথে একটা ছোট্ট কুরআন কারীম রাখব। আদর করে পুষব।
হরদম আল্লাহর কিতাবের উষ্ণতা অনুভব করব।

□□□□

দুই কি তিন বছর আগে, বাসে করে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। বাস চলা শুরু করার পর বাসের সাউন্ডবক্স থেকে কানে একটু ভিন্নধর্মী বক্তব্য কানে এল, একজন উপস্থাপক বলল,

-মঞ্চে আসবেন.....!

শিল্পী শুরুতে ছোট্ট একটা ভূমিকা-বক্তব্য দিলেন,

-আমি এখন আপনাদের সামনে সুরের মাধ্যমে 'কিছু কথা' পরিবেশন করব।
কথগুলো সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে নয়। অসাধারণ অপার্থিব একটা বিষয় নিয়ে। সেটা হলো কুরআন শরীফ।

কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। একজন অমুসলিম কুরআন নিয়ে কথা বলছেন!
শিল্পী শুরু করলেন,

-ফ্লোরিডার এক ধর্মযাজক, টেরি জোনস। সে ঘোষণা দিয়েছে, ঈদের দিন কুরআন শরীফে আগুনে পোড়াবে। কতবড় সাংঘাতিক বেদনার বিষয়! কুরআন শরীফের মতো মহাপবিত্র গ্রন্থ আগুন ধরিয়ে পোড়াবে, এটা এতবড় অপমান এবং আঘাত, যা সহ্য করার মতো নয়! আমার ভেতরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো, এর প্রতিবাদে আমাকে কিছু লিখতে হবে, কিছু করতে হবে। হিন্দু হলেও আমি কিন্তু ইসলামী ইতিহাসের ছাত্র। সেই সুবাদে হযরত মুহাম্মাদ সা. আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আমি তার ভীষণ ভক্ত! সেদিন আমার একজন ভক্ত বললো,

-দাদা, একজন শিল্পী হিশেবে আপনার কী প্রতিক্রিয়া, একজন যাজক কোরআন শরীফ আগুনে পোড়াতে চায়। আপনি খবরে দেখেছেন নিশ্চয়ই বিষয়টা?
-জ্বি, দেখেছি।

-তো দাদা, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্যটা যদি আমাদের বলতেন!

আমি সেই ভক্তের দাবি উপেক্ষা করতে পারিনি। সাথে সাথে খাতা-কলম নিয়ে বসে গেলাম। আমি নিজের অবস্থান থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছি,

আমি বললাম, শুধু এখানে কুরআন শরীফ কেন বন্ধ!

যদি আগুন লেগে, ধ্বংস হয়: পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান, তবু বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কুরআন।

হবে কেমন করে কুরআন ধ্বংস, নুরেরো তেজ। আছে বিশ্বভরা লক্ষ
লক্ষ কুরআনের হাফেয!



এরপর তিনি বললেন,

-আমি যেটা বলতে চেয়েছি, শুধু আবেগ দিয়ে নয়। ইসলাম ধর্মে কুরআন শরীফকে মুখস্থ রাখার নিয়ম রয়েছে। তো এই কুরআন শরীফকে যারা মুখস্থ রাখতে পারে, তাদেরকে বলা হয় কুরআনের হাফেয। একজন কুরআনে হাফেয মানে হচ্ছে, একেকটা চলন্ত কুরআন শরীফ। পৃথিবীর সমস্ত বই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, পুড়ে ছাই হয়ে যায়, যতদিন পর্যন্ত একজনও কুরআনে হাফেয বেঁচে থাকবেন পৃথিবীর বুকে ততদিন পর্যন্ত কুরআন শরীফের মৃত্যু নেই। আর আমি সেই লজিকটাই আমার গানের মধ্যে দিয়েছি।

কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে এর আগেও অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। ভারতে একবার কুরআন শরীফকে ব্যাঙ করে দেয়ার জন্য মামলা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ নাগরিক শালমান রুশদি কুরআন শরীফ বিকৃত করে লিখেছিলেন স্যাটানিক ভার্সেস।

পাকিস্তানের জিয়া মরলো দুর্ঘটনায় ভাই, তার বিমান পুড়ে ছাই
হয়েছে, কুরআন পোড়ে নাই!



শিল্পীর (রাব্বের কারীম তাকে হিদায়াত নসীব করুন) এই লাইনটা শোনার পরই আমি ভীষণ আমি চমকে উঠলাম। আমার সেই ফেলে আসা শৈশবের ইচ্ছের কথা মনে পড়ল। আবার নতুন করে স্বপ্ন জাগলো,

-আমিও জিয়াউল হকের মতো একটা ছোট্ট কুরআন পুষবো। সব সময় সাথে রাখব। আমার বুকপকেটে সব সময় একটা জোনাকি পোকা থাকবে। আমার জোনাকি হলো কুরআন কারীম।



জামা সেলাই করার সময় দর্জিকে বলে দিলাম,

-ভাই, ভেতরের পকেটটা একটু বড় করে রাখবেন।

-কেন?

-কুরআন কারীম রাখবো সেটাতে।

-আল্লাহ! আপনি বগলের নিচে কুরআন কারীম রাখবেন?

তার এই বিস্ময়মাখা প্রশ্নকে কী বলতে পারি, অতি ভক্তি?

আরেকবার জামা সেলাই করতে গিয়ে দর্জিকে বললাম,

-আপনারা ভেতরের পকেট কোন দিকে রাখেন?

-বামদিকে।

-আমার পকেটটা ডানদিকে রাখবেন?

-কেন সবাই তো বামদিকেই রাখে?

-আমি ওই পকেটে টাকা নয়, কুরআন কারীম রাখব।

-পকেটে কুরআন কারীম রাখবেন? বেয়াদবি হয়ে যাবে না?

৩

আরেকবার জামা সেলাই করতে গিয়ে বললাম,

-আমি একদম বুকের ওপর একটা পকেট রাখতে চাই। কুরআন কারীম রাখব সেটাতে।

-ঠিক আছে।

-পকেটের ওপরদিকটা ঢাকা থাকবে। তবে কোনার দিকটাতে একটু কাটা থাকবে, ওখানে যাতে কলম-মিসওয়াক রাখতে পারি। আর হ্যাঁ, পকেটটা কোন পাশে দিবেন?

-কেন ডান পাশে?

-না বামপাশে দিবেন।

-কুরআন কারীম রাখবেন বলেছিলেন না? তাহলে তো ডানপাশে রাখাই উত্তম!

-না, আপনি বাম পাশেই পকেটটা রাখবেন।

-বামপাশে কুরআন কারীম রাখলে কেমন দেখাবে না?

-বাম পাশে রাখার কারণ হলো, বুয়ুর্গানে কেলাম বলেছেন, কলব থাকে বাম পাশে, আমি চাই আমার দুই কলবটা সবসময় কুরআন দিয়ে চাপা থাকুক! যাতে বেশি বেগড়বাই করতে না পারে!

৩৩৩

পাঞ্জাবীতে বুকপকেট রাখতে গিয়ে মজার ঘটনাও ঘটেছে। একদিন কোথাও যেন যাচ্ছিলাম। পাশেই আরেক ছয়ুর বসা। কিছুক্ষণ পর তিনি ফস করে প্রশ্ন করলেন:

-হয়রতের দরবারে কি নিয়মিতই আসা-যাওয়া করেন?

আমি তো ভাবাচেকা খেয়ে গেলাম। কোনো পূর্ব-পরিচয় ছাড়া, ভূমিকা ছাড়া এভাবে সরাসরি প্রশ্ন তো কেউ করে না। তারপরও আমি ভাবলাম, আমাকে হয়তো হযরতের খানকায় দেখেছে। আমি বললাম,

-জি, নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার চেষ্টা করি। মাঝেমাঝে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে ছুটে যায়।

-এই সপ্তাহে জুমার পরের বয়ানটা শুনেছেন?

-জুমার পরের বয়ান? আপনি কোন হযরতের কথা বলছেন?

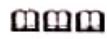
-কেন, ঢালকানগর হযরতের কথা বলছি?

-ও আচ্ছা, তাই বলেন। জি না হযরতের দরবারে যাওয়া হয় না।

-আমি আপনার জামা দেখে ভেবেছি আপনি হযরতের মুরীদ।

-জামা দেখে কীভাবে বুঝলেন?

-কেন বুকের পকেট দেখে! হযরতের ওখানে যারা যায়, তারা হযরতের মতো বুকপকেটঅলা জামা পরে থাকে।



আমার একটা শখ হলো, বিভিন্ন আকারের কুরআন কারীমের নোসখা সংগ্রহ করা। পিচ্চি-পিচ্চি, ছোট-ছোট, মাঝারি-মাঝারি, সেজ-সেজ, বড়-বড়, বিরাট-বিরাট। নানা আকৃতির কুরআন কারীম সংগ্রহ করেছি। বড় সাইজের বুখারী শরীফের মতো একটা কুরআন কারীমও ভাগ্যক্রমে সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমার এখন তামান্না হলো, বিশ্বের সবচাইতে বড় কুরআন কারীমের নোসখাখানা সংগ্রহ করা। যেভাবেই হোক। দেখি কী করা যায়। পেয়ে যাবো একদিন ইনশাআল্লাহ। না পেলেও সমস্যা নেই। দুনিয়ার সব আশা পূরণ হতেই হবে, এটা জরুরী নয়। কিছু আশা অপূর্ণ থাকলেই বরং ভালো। হৃদয়ে হাহাকারভরা আক্ষেপ থাকে। ভালোবাসাগুলো মরে যায় না। কুরআন কারীমের ভালোবাসা আজীবন হৃদয়ে জাগরুক থাকুক।



কুরআন কারীমের এত ধরনের নোসখার মাঝেও, এখন পর্যন্ত আমার মনের মতো সাইজে ছাপা হওয়া একটা নোসখা মিলল না। দু'রকম কুরআন কারীমের নোসখা খুঁজছি,

এক. ছোট, উসমানী লিপিতে ছাপা, হাফেজী কুরআন শরীফ। পকেটে রাখার জন্য। আরামসে পড়া যায়, আবার পকেটে রাখা যায় সহজে।

দুই. প্রতিদিনের দরসে ব্যবহার করার জন্য একটা মাঝারি আকৃতির কুরআন কারীম। যেটার চারপাশের বর্ডারে অনেক জায়গা থাকবে। নিজের ইচ্ছে মতো নোট লেখা যাবে, তবুও জায়গা ফুরোবে না। এখন যেটা দরসের জন্য ব্যবহার করি, বাঙলাদেশি ছাপা, চারপাশের বর্ডারে আর খালি জায়গা নেই। ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা। হিজিবিজি নোট লিখতে লিখতে, এখন এমন হয়েছে, নিজেই নিজের লেখার পাঠোদ্ধার করতে কষ্ট হয়। অনেক জায়গায় এত দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্রাফিক তো কোন ছাড়, হালের চায়নিজ ম্যান্ডারিন অক্ষরও এর চেয়ে সুবোধ্য মনে হয়। মনের মতো কুরআনের নোসখা দুইটা খুঁজে ফিরছি।



মনের মতো রেহালও খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই কবে থেকে! টেবিলের ওপর কুরআন কারীম রেখে তিলাওয়াত করতে আরাম লাগে না। কুরআনখানাও কেমন অসহায়-নিসহায় হয়ে পড়ে থাকে, বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। রেহালের ওপর কুরআনখানা রাখলে মনে হয়, হ্যাঁ এবার আরাম পাচ্ছে। সুখ পাচ্ছে। নিশ্চিতে হেলেদুলে পড়া যায়। রেহালের ওপর রাখলে একটু বুকে তিলাওয়াত করতে হয়, এটাই ভালো। আমি কুরআনের কাছে মাথা নত করে আছি।

কুরআন কারীমের জন্য কি যে সে রেহাল হলে চলে? প্লাস্টিকের? কেরোসিন কাঠের? দোকানে রেহাল কিনতে গেলে দেখা যায়, দশটা রেহাল বেছেও মনমতো একটা রেহাল পাওয়া মুশ্কিল হয়ে যায়। কোনওটা শুকিয়ে বাঁকা হয়ে আছে, কোনওটা রাস্তাপালিশবিহীন খরখরে। ইদানীং অবশ্য কালোমতো সুন্দর ডিজাইনের মজবুত কিছু রেহাল চোখে পড়ে। তবে সমস্যা হল, সেগুলো চাহিদামাফিক উচু নয়। মক্কা-মদীনা ও আরবের মসজিদগুলোর ছবিতে দেখি, কত সুন্দর সুন্দর রেহালে মানুষ তিলাওয়াত করছে! কয়েকটা সুন্দর রেহালের ছবি তুলে, এক ছুতারকে নিয়ে দেখালাম।

-ভাই, ছবির মতো করে রেহাল বানিয়ে দিতে পারবেন?

-বলেন কি ভাইজান, পারবো না মানে? অবশ্যই পারব।

আমি বেশ আশ্বস্ত! যাক, এতদিন পর স্বপ্নের মতো রেহাল পেতে যাচ্ছি। সপ্তাহখানেক পর, উনি রেহাল হাতে হাজির।

-হয়ুর, এই নিন আপনার রেহাল।

আমার চক্ষু চড়কগাছ! একি দেখছি, এটা রেহাল না অন্য কিছু? হঠাৎ দেখায় কেউ কেউ ছোটখাট 'মই' ভেবে বসতে পারে। কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ রেহাল (!) রেখে দিলাম। বেচারা কষ্ট করে বানিয়ে এনেছে। ফেরত দেয়াটা ঠিক হবে না।

III

আমি চেয়েছিলাম টেবিলের মতো না হলেও মোটামুটি উঁচু, বড় রেহাল। বেশ রাজকীয়-রাজকীয় একটা ভাব থাকবে। দেখেই মনে হবে,
-হাঁ, এটাই হলো রেহাল!

তা আর হলো কই! আরও বারকয়েক চেষ্টা করেছিলাম। আশাপূরণ হয়নি। আমাদের পটিয়ার মসজিদেও বেশ বড়-বড় রেহাল আছে। কোথাও না পেয়ে ভাবলাম, কাউকে না বলে, ওখান থেকে একটা রেহাল নিয়ে আসব, যা হওয়ার হবে! কাঠমিস্ত্রিকে দেখিয়ে বলব, ছবছ এমন একটা রেহাল বানিয়ে দিন। পরে সময়সুযোগ করে রেহাল ফিরিয়ে দেব। গুটিগুটি পায়ে মসজিদেও গিয়েছিলাম। হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছি, কেউ আছে কিনা! নাহ, কেউ নেই! রেহালটা ছিল, উত্তর পাশে। হাতে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ওপারে সারি-সারি কবর। মুফতী আযীযুল হক রহ., হাজী ইউনুস সহেব রহ., আল্লামা ইসহাক গাযী রহ., আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ.-সহ আরও বড় বড় দিকপালরা শুয়ে আছেন। সময়টা ছিল এশার আগমুহূর্তে।

মনটা আচানক আনমনা হয়ে গেল। আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নড়াচড়াও করতে পারছি না। পুরো শরীরে শীতল-শ্লিষ্ক একটা আমেজ কুলকুল করে চারিয়ে যাচ্ছিল। যেন অপার্থিব কোনো জগতে এসে পড়েছি। কারণ? আর কিছুই না, নাকে এসে লেগেছিল হাসনাহেনা ফুলের সুবাস। কবরে লাগানো গাছ থেকে আসছে। এ-ফুলের মৌতাত আমাকে সব সময়ই ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়।

IIIIII

রেহাল না নিয়েই ফিরে এলাম। পটিয়া মাদরাসার মিস্ত্রিকে অনুরোধ করলাম। সে অপারগতা জানাল। খুঁজতে থাকলাম। খুঁজতে-খুঁজতে খবর পেলাম, ময়মনসিংহের মারকায মসজিদে নাকি বড়-উঁচু রেহাল পাওয়া যায়। দেরি না করে, একজনকে পাঠিয়ে দিলাম। যাক অনেক দিন পর, মনের মতো না হলেও, উঁচু একটা রেহাল পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, ওটা ক'দিন পর ফেটে চৌচির!

একজন সংবাদ দিল কল্পবাজারে সী-বীচের স্যুভেনিরের দোকানগুলোতে সুন্দর সুন্দর রেহাল পাওয়া যায়। একদিন বাসে চড়ে বসলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করে কিনলাম দু'টি সুন্দর রেহাল। বগলদাবা করে ফিরছি। পথে বাস নষ্ট হয়ে গেল। বাস বদল করতে গিয়ে, ভুলে রেহালগুলো রয়ে গেল! দুঃখের কি আর শেষ আছে?

କୁରାଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା!

আমরা শিশুদেরকে গুরু থেকেই কুরআন কারীমের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারি। এজন্য অভিভাবককে কিছু কাজ করতে হবে। আমরা নিচে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরব। যাতে,

ক. শিশু কুরআনকে ভালোবাসতে শেখে।

খ. সহজে কুরআন হিফয করতে পারে।

গ. শিশুর কুরআনী শব্দজ্ঞান ও জানাশোনা বৃদ্ধি পায়।



আমরা যেসব পদ্ধতির কথা বলব, সেগুলো বড়জোর পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় নিবে। বাবা-মা একটু গুরুত্ব দিলেই সহজেই হয়ে যাবে।

(এক) শিশু গর্ভে থাকাবস্থায় বেশি বেশি কুরআন কারীম শোনা। এটা খুবই কার্যকর একটা পদ্ধতি। এতে বাচ্চা ও মা উভয়ের আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়। কুরআন কারীমের বরকত উভয়কে বেঁটন করে রাখে।

(দুই) শিশু দুধপোষ্য থাকাবস্থায়ও বেশি বেশি কুরআন কারীম পড়া ও শোনা। শিশু দুধপানের সময় থেকেই চারপাশের আওয়াজগুলো ভেতরে ধারণ করতে থাকে। মা নিজে পড়তে না পারলে যন্ত্রের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে শব্দের উচ্চারণ যেন স্পষ্ট হয়। বাবুর কান দিয়ে যেন কুরআনের শব্দগুলো গোটা গোটা হয়ে প্রবেশ করে।

(তিন) শিশুর সামনে বসে, তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা। মায়ের দেখাদেখি তার মধ্যেও তিলাওয়াতের সুগুণ অভ্যেস গড়ে উঠবে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি, দাদা অথবা বাবা সব সময় কুরআন তিলাওয়াত করেন, কুরআন ভালোবাসেন, এমন পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম কুরআনপ্রেমী হয়েই গড়ে ওঠে।

(চার) শিশু কোনো কিছুকে নিজের মালিকানায় পেতে বেশ পছন্দ করে। তাই বুঝ হওয়ার পরেই তাকে সুন্দর ও উন্নত ছাপা দেখে একটা কুরআন হাদিয়া দেয়া। বারবার তাকে কুরআনের গুরুত্ব বোঝানো। সে কত বড় বস্তুর মালিক হলো, উঠতে-বসতে সেটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করা।

(পাঁচ) কুরআনকে ঘিরে বিভিন্ন ঘরোয়া আয়োজন করা। কুরআন খতম করলে, বা এক সপ্তাহে 'সাত পারা' তিলাওয়াত করলে বা পনের দিনে পনের পারা তিলাওয়াত করলে, আয়োজন করে তার হাতে কিছু একটা উপহার তুলে দেয়া। কুরআনকে ঘিরে সামান্যতম অর্জনেও তাকে সম্মানিত করা। সম্ভাষিত করা।

(ছয়) কুরআনের গল্প শোনানো। সাপ-বিচ্ছুর গল্প না বলে, কুরআনের গল্প বললে সবদিক দিয়েই লাভ। দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে উপকার। সম্ভব হলে ঘটনার আয়াতগুলো পড়ে শোনানো যেতে পারে। তরজমাটাও পড়ানো যেতে পারে। তবে গল্পটা সুন্দর করে বলা চাই। তাহলে কুরআনের গল্প ও শব্দ দু'দিকেই শিশুর দখল আসবে।

(সাত) নিয়মিত ছোটখাট ঘরোয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ভাইবোনদের মধ্যে ছোট সূরাগুলোর হিফয প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। বয়েসের উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্ন করা যেতে পারে।

ক. সফর মানে ভ্রমণ। কুরআন কারীম থেকে এর সমার্থক আরেকটি শব্দ বলো। রিহলা (رَحْلَة)।

খ. দুইটা ঋতুর নাম বলো। শিতা ও সাইফ (الشتاء والقيف)। শীত ও গ্রীষ্ম।

গ. বিরাট এক জন্তুর নামে একটা সূরার নাম বলো। ফীল-হাতি (الفيل)।

এভাবে নিয়মিত করতে থাকলে, বয়েস দশের মধ্যেই ওরা অনেক এগিয়ে যাবে। কুরআনের অনেক কাছাকাছি চলে আসবে।

(আট) কুরআনে উল্লেখিত যেসব বস্তু আশেপাশে আছে, সেগুলোর নামটা বাঙলার পাশাপাশি আরবীতেও শিখিয়ে দেয়া। মাঝে মধ্যে সরাসরি আরবীতেই শব্দটা ব্যবহার করা। আরবী ও বাঙলায় নাম লিখে বস্তুটার গায়ে সঁটে দেয়া।

আল মা-উ (الماء) পানি। আল লাইলু (الليل) রাত। আন নাহা-রু (النهار) দিন। আস সামা-উ (السماء) আকাশ। আল আরদু (الأرض) যমীন। আশ শামসু (الشمس) সূর্য। আল কামারু (القمر) চাঁদ।

আরো একটা কাজ করা যেতে পারে। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। হাতির কথা আছে, এমন একটা আয়াত বলো তো?

-আলাম তারা কাইফা... (أَلَمْ نَرَكُنْ يَفًا)।

এভাবে অনুশীলন হলে বিষয়ভিত্তিক আয়াতও শেখা হয়ে যাবে। বা আন নাস (الناس) ও আল ফালাক (الفلق) শব্দ দু'টো কোথায় আছে বলো তো?

(নয়) শিশুরা নতুন শব্দ শেখার প্রতি স্বভাবগতভাবেই আগ্রহী। নতুন কথা শেখার সময় দেখা যায় নতুন শব্দ পেলেই সে বারবার সেটা ব্যবহার করে। তাকে নিত্যনতুন কুরআনী শব্দ শেখানো যেতে পারে। আস্তে আস্তে বাক্যগঠনও শেখানো যেতে পারে। ছোট ছোট বাক্য।

(দশ) কুরআন কারীমকে তার বন্ধু বানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। সেজন্য ছোট ছোট খন্ডে পারা পারা করে বিভক্ত একসেট কুরআন কেনা যেতে পারে। একটা খন্ড পকেটে, একটা খন্ড ব্যাগে, একটা খন্ড তার শিয়রে। তাকে বলা, কুরআন সাথে থাকলে তুমি আল্লাহর কালামের সাথেই থাকলে। যখনই সুযোগ পাবে, খুলে একটা আয়াত পড়ে নিবে। চট করে। লম্বা সময় ধরে পড়তে হবে, এমনটা জরুরী নয়।

(এগার) ওর সমবয়সী কোনো শিশুর ভালো কেরাত পেলে সেটার অডিও-ভিডিও তাকে দেখতে-শুনতে দেয়া। তাকেও অমন সুন্দর করে তিলাওয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। শিশু যখন দেখবে তার মতো আরেকটা ছেলে পারছে, তার মধ্যেও প্রতিযোগিতার ভাব তৈরি হবে। এটা বেশ ফলদায়ক। তবে চাপাচাপি না করা। না পারলে লজ্জা না দেয়া।

(বারো) ভালো কারীর তিলাওয়াতের মাধ্যমে, একটা আয়াতকে বারবার টেনে টেনে শোনার ব্যবস্থা করা। ছোট কোনো কারীর তিলাওয়াত হলে আরো ভালো। তাহলে বিশুদ্ধ লাহজা ও লাহান তৈরি হবে। বাচ্চার নিজের তিলাওয়াতও রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা। তারপর তাকে শুনতে দেয়া। তাকেই বিচারের ভার দেয়া। তিলাওয়াতটা কতটুকু মানসম্পন্ন হয়েছে। নিজেই নিজের পড়ার মান যাচাই করতে শিখে গেলে, কুরআনী সফর অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

(তেরো) শিশুকে কুরআন কারীম বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা। একা একা পড়লে অগ্রগতির পরিমাণ কম থাকে। শিশুকে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশে নিয়ে যেতে পারলে, সে নিজ তাকিদেই পড়বে। তবে বর্তমানের ‘ফাস্ট’ হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা নয়। তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সামান্য কিছু হলেও।

শিশুকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সে যেন তার সহপাঠীদের সাথেও নিয়মিত কুরআন বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেয়। বন্ধুহলে কুরআন নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেটার স্পন্সর বাবা-মা নিজ থেকে করতে পারেন। সবার জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। বাচ্চার বন্ধুদেরকে ঘরে দাওয়াত

দিয়ে এনেও ছোটখাট আয়োজন করা যেতে পারে। কুরআন ইনশাআল্লাহ রক্তের সাথে মিশবে।

(চৌদ্দ) একটা সূরা ভালোভাবে মুখস্থ হওয়ার পর, তাকে পড়তে দিয়ে রেকর্ড করে রাখা। পরে কখনো সেই সূরা পড়তে দেয়া। না পারলে, আগের রেকর্ডটা শুনিতে দেয়া। জীবন্ত প্রেরণা হিশেবে কাজ করবে, আমি তো আগে সূরাটা মুখস্থ পারতাম!

(পনের) স্কুলে-মাদরাসায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনসমক্ষে তিলাওয়াত করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে সে ভয়ভীতি কাটিয়ে সক্ষম হবে। পরিমিত পরিমাণে তার প্রশংসা করা যেতে পারে। কিন্তু বেশি প্রশংসা পেলে অনেক সময় তার কাছে লেখাপড়ার চেয়ে, মানুষের মুগ্ধদৃষ্টিই বেশি প্রিয় হয়ে দেখা দিতে পারে। এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ষোল) প্রতিদিন নিজে গল্প শোনানোর পাশাপাশি, তার মুখ দিয়েও একটা কুরআনী গল্প শোনা। সে যখন গল্প বলে খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনা। ভুলভাল হলে সংশোধন করে দেয়া। গল্প বলা শেষ হলে, গল্পটা নিয়ে হালকা পর্যালোচনা করা। খাইর-শার, কল্যাণ-অকল্যাণ, হিদায়াত-দালাল (গোমরাহী)-ইত্যাদিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা।

আজ যে গল্পটা বলবে, সে গল্পবিষয়ক আয়াতগুলোর নাম্বার একটা কাগজে লিখে তাকে দেয়া। সে গল্প বলার পাশাপাশি আয়াতগুলোও একবার পড়ে নিবে। বুঝুক-না বুঝুক।

(সতের) মুখস্থ করা সূরা দিয়ে নফল পড়তে দেয়া। জোরে জোরে তিলাওয়াত করবে। বাচ্চাদের আলাদা জামাত বেঁধে, ইমাম বানিয়ে দেয়া। তবে সবসময় যাতে নির্দিষ্ট সূরা না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এটার মতো ফলদায়ক পদ্ধতি আর হতে পারে না।

(আঠার) পারিবারিক জমায়েতগুলোতে কুরআনসন্ধ্যার আয়োজন করা। বাচ্চার কুরআন তিলাওয়াত করবে। কুরআনী গল্প শোনাবে। কুরআনী শব্দ দিয়ে শব্দজঙ্ক খেলবে। পুরস্কার তো থাকবেই।

(উনিশ) মহল্লার মসজিদে কুরআন পড়তে পাঠানো। তাহলে পড়শী ছেলেদের সাথে কুরআনী সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যদি ভালো ব্যবস্থাপনা থাকে তবেই।

(বিশ) কাজের ফাঁকে ফাঁকে, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তাকে আগের পড়া থেকে প্রশ্ন করা। সুন্দর করে উত্তর দিতে শেখানো। গুছিয়ে কথা বলতে শেখানো।

(একুশ) একটু বড় হলে, তাকে কুরআনের অভিধান কিনে দেয়া। কুরআন বিষয়ক বিভিন্ন বই কিনে দেয়া। প্রতিদিন সেগুলো যেন পড়ে সেদিকেও

নজর রাখা। কুরআনী অভিধান যেন ব্যবহার করতে শেখে, সেটা তদারক করা।

(বাইশ) আরেকটু বড় হলে কুরআনের তাফসীর কিনে দেয়া। সেগুলো পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। নিজেও তার সাথে পড়া। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরের তাফসীর শোনানোর ব্যবস্থা নেয়া।

(তেইশ) কুরআন বিষয়ক অভিজ্ঞ আলিমের দরবারে নিয়ে যাওয়া। তার সাথে ওঠাবসার সুযোগ করে দেয়া। প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া। প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেয়া। অবশ্যই কুরআন বিষয়ক।

(চব্বিশ) স্কুল-মাদরাসার পড়াশোনার সাথেও কুরআনকে জুড়ে দেয়া। যেমন অংকের সাথে সাথে মিরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কিত আয়াতগুলো, যাকাত বিষয়ক আয়াতগুলো পড়িয়ে দেয়া। অর্থ বোঝার প্রতি তাকিদ দেয়া। আয়াতে বর্ণিত হিশেবটাও বুঝে নিতে উৎসাহ দেয়া।

(পঁচিশ) দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোকে কুরআনের সাথে গেঁথে দেয়া। মায়ের সাথে রাগ করছে, এ বিষয়ে আয়াতগুলো শুনিয়ে দেয়া। অযথা টাকা খরচ করেছে, অপচয়ের আয়াত শুনিয়ে দেয়া। ফলমূল খাচ্ছে, এ বিষয়ক আয়াত বলে দেয়া।



এতক্ষণ বলে আসা বিষয়গুলো বাস্তবায়ন কীভাবে হবে?

ক. এই লেখার একটা প্রিন্টকপি সাথে রাখা।

খ. কোনটা এখন পারা যাবে, কোনটা পরে করতে হবে, সেটা বাছাই করা।

গ. শুরুতে কমপক্ষে তিনটা চিন্তা নেয়া। যেগুলো প্রথমে একসাথে চালানো যাবে। পরে আস্তে আস্তে অন্যগুলো।

ঘ. সন্তানের গ্রহণক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে তুলনামূলক কঠিন ধাপগুলোর দিকে যাওয়া।

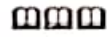
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন

জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআনি ডুবুরি	৭৭
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআনিস্ট	৮০
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: বাতিল নাস্তিকতামুক্ত সমাজ	৮১
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: মুতাফফিফ	৮৫
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআনপ্রেমী কাফির	৮৮
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: ক্ষমার গল্প	৮৯
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআনের প্রতি অবহেলা	৯২
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কানি'-মু'তার	৯৩
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: আল্লাহর প্রিয়জন	৯৬
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: প্রশান্তির স্তর	১০৩
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআন আমায় শিক্ষা দিল	১০৭
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কারবালার শিক্ষা	১১৩
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: সবারমতি	১১৭
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: সাহাবায়ে কেরাম	১১৯
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: অজেয় পশ্চিম	১২১
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: ঈমানের রেজিস্ট্রেশন	১২১
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: চপলমতি পণ্ডিত	১২২
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুফুরবান্ধব মুমিন	১২৩
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: হকবিদেষী	১২৪
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: শরীয়ত নয়, কুরআন মানি	১২৪
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: পূর্বপুরুষের দোহাই	১২৫
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: দলীয় অন্ধত্ব	১২৬
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: পা-চাটা গবেষক	১২৬
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: গাছেরটা তলারটাও	১২৭
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: ঈমান ছাড়া সব চলবে	১২৮
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: উদারপন্থী	১২৮
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কুরআন ও লোকধর্ম	১২৯
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: বক্তৃতাকামী	১৩০
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: স্বার্থবাদী আন্দোলন	১৩১
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: কৌশলের ফাঁদ	১৩২
জীবনের প্রয়োজনে কুরআন: চিন্তার দৈন্য: সেকাল একাল	১৩৩

কুরআনী ডুবুরি

কুরআন কারীম কেন নাযিল করা হয়েছে? মানুষের হিদায়াতের জন্য ।

(هُدًى لِلنَّاسِ) । হিদায়াত লাভের জন্য কি কুরআন কারীম বুঝতে পারা পূর্বশর্ত? সব মানুষই কি কুরআন কারীম সমানভাবে বোঝে? মেধা, ভাষাজ্ঞান, গভীর চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম বুঝশক্তি থাকলেই কি কেউ কুরআন কারীম বুঝতে পারে? নাকি এসবের পাশাপাশি ঈমানের গভীরতাও লাগে? এর উত্তর মেলে আরেক আয়াতে ।



কুরআন সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে । কিন্তু হিদায়াতটা পায় শুধু মুত্তাকীগণ । কুরআন কারীম (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) মুত্তাকীদের জন্যে হিদায়াত । ঈমানদারের কাছে কুরআন বাড়তি অর্থ নিয়ে আসে । ঈমান ছাড়া কুরআন পড়লে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয় না । অধরা থেকে যায় । কুরআনী হিদায়াত সবার জন্যে উন্মুক্ত । তবে হিদায়াতটা নিজের করে পাওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না । অনেকেই জানে, অল্প ক'জনই শুধু মানে । কুরআন কারীম থেকে নির্দিষ্ট মাত্রার জ্ঞান সব মানুষই অর্জন করতে পারে । কিন্তু প্রাপ্ত জ্ঞান (ইলম) -কে কাজে লাগিয়ে হিদায়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সৌভাগ্যবানরা । মুত্তাকীরা । কুরআন কারীমকে গভীরভাবে বোঝার জন্যে কেবল মেধাশক্তিই যথেষ্ট নয়, ঈমানী যোগ্যতাও প্রয়োজন । তাকওয়াই হলো সেই ঈমানী যোগ্যতা । অমুসলিম যারা কুরআন কারীম পড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়? তারা কুরআন কারীমের বাহ্যিক শব্দগত ও অর্থগত কিছু সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় । এই মুগ্ধতা তাদেরকে হেদায়াতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয় ।



আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে, কলবের ওপর পর্দা পড়ে যায় । কুরআন কারীমের সাথে দূরত্ব তৈরি হয় । কুরআনী হিদায়াতের মূলরূপ ধরা পড়ে না । ভাসাভাসা কিছু শাব্দিক অর্থই শুধু ধরা পড়ে । এটা এক মহাদুর্ভাগ্য । এর চেয়ে বড় বঞ্চনা আর কিছু হতে পারে না ।



কুরআন কারীম পড়ি । একটার পর একটা আয়াত অতিক্রম করি । এটুকু বুঝতে পারি, একেকটা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাগরসম অর্থ রেখেছেন ।

কিন্তু আমার পাপের কারণে, সে গভীর সাগরের ডুবুরি হতে পারি না। আমার অতীত কৃতকর্ম আমাকে সাগরসেঁচে মুক্তো আনতে বাধা দেয়। একেকটা আয়াত কত দ্রুত পড়ে চলে যাই। কোনো অনুভূতি জাগে না। অথচ আমার আগে, আল্লাহর অসংখ্য বান্দাও আয়াতটা পড়েছেন। তারা এই আয়াত থেকে কত অর্থ বের করেছেন! কত হিদায়াত লাভ করেছেন! কত উপদেশ বের করেছেন! দুনিয়া-আখেরাতের কত চিত্র তাদের সামনে ফুটে উঠেছে, তার কোনো হিশেব নেই। একটা আয়াত পড়তে পড়তে তারা রাত কাবার করে দিয়েছেন। কারণ তাদের কলব তৈরি ছিল। তাদের আমলনামা পাপমুক্ত ছিল। তারা ‘মুত্তাকী’ ছিলেন বলেই এই মহাসৌভাগ্য তাদের কপালে জুটেছিল। আর আমি এখনো ‘নাস’ই রয়ে গেলাম। তাদের মতো হতে হলে আমাকে আগে ‘মুত্তাকী’ হতে হবে। পাপমুক্ত হতে হবে।



সালাফের জীবনী পড়লে দেখা যায়, তারা তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় ধরে একটা আয়াত বারবার পড়েছেন। নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমনটা করেছেন। প্রতিবারেই তাদের সামনে নতুন নতুন অর্থ ফুটে উঠেছে। নতুন নতুন মারেফাত-হাকীকত প্রতিভাত হয়েছে। যতবার পড়েছেন, আয়াতটা আরো অসংখ্যবার পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আয়াতটা একবার পড়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে আবার পড়ছেন। যেন এক ঢোক পান করে তৃপ্ত হতে পারেননি। পিপাসা আরও বেড়ে গেছে। আবার পড়ছেন, সাগরের আরো গভীরে ডুবে যাচ্ছেন। প্রতিবারের পাঠে আরও বহুমূল্য হীরে-জহরত তার সামনে ভেসে উঠছে। আয়াতটা পড়ার সংখ্যা যত বাড়ছে, অন্তর্নিহিত অর্থপ্রাপ্তির মান-পরিমাণও বেড়ে চলছে। অবোরে বর্ষিত হচ্ছে তার ওপর ওহীর নিগূঢ় রহস্য। তিনি বুভুক্ষের মতো আরও বেশি পড়ছেন, আরও সিঁক্ত হচ্ছেন। আমার পাপী মন এর স্বাদ পাবে কোথায়? ঘরটা সুনসান। গভীর রাত। ঝাঁঝি পোকাগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি একটা আয়াত পড়ছেন। বিনয়ে, ভয়ে, আল্লাহর মহব্বতে তার গলা ভিজে উঠছে। গলায় আওয়াজ আটকে যাচ্ছে বারবার! দাড়ি চুইয়ে অশ্রুধারা নামছে অবিরল! ছোট্ট অনাড়ম্বর ঘরটাতে বারবার একটাই আয়াতই স্পন্দিত হচ্ছে। একবার শেষ হলেই আবার! আবার! আয়াত একটা, অথচ প্রতিবারেই ভিন্ন আমেজ, অন্যরকম আরাম নিয়ে আসছে। নতুন আবেগ নিয়ে হাজির হচ্ছে। নব চিন্তায় গুঞ্জরিত হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুমিনের মধ্যেই কুরআনের গভীরে ডুব দেয়ার সামর্থ্য বুনে দিয়েছেন। একজন মানুষ ওজু-গোসল করে পরিপূর্ণ পাক-পবিত্র হয়েছেন। রোযা রেখেছেন। মসজিদে এতেকাফে আছেন। আশেপাশে কোনো কোলাহল নেই। নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন কারীম পড়ছেন।

আরেকজন মাথায় রাজ্যের দুনিয়াবি চিন্তা নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষণে ক্ষণে মাথায় কিলবিল করছে, ব্যবসায়িক হিশেব-নিকেশ, স্কোরবোর্ডের পরিসংখ্যান! বিবি-বাচ্চার খায়-খরচা! কোনো রকমে ক্ষুদ্রতম সূরা পড়ে তড়িঘড়ি সিজদা দিচ্ছেন! দুজনের তিলাওয়াত কি সমান হবে? দুজনের আবেগ ও প্রাপ্তি কি সমান হবে? সমান হওয়ার কথা?



মনটা আল্লাহর অভিমুখী হয়ে আছে। কুরআন কারীম নিয়ে বসলেন। আজীব-গরীব সব অর্থরহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। পড়তে পড়তে মনটা উসখুশ করছে! ইশা, এখন যদি কাউকে পাওয়া যেত! তার কাছে এই অপূর্ব কুরআনী রুমুজ-গুমুজ (রহস্য) খুলে বলা যেত! মত বিনিময় করা সম্ভব হত! টাটকা তাদাব্বুর পেশ করা যেত!

সেই একই মানুষ, অন্য সময় দুনিয়াকীর্ণ মনে কুরআন খুলে বসেছে! পড়ছে, হুবহু সেই আগের আয়াতটাই। কিন্তু সেদিনের সেই অর্থময়তা আজ আর নেই। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আয়াতখানা এক হলেও, কলব যে এক নয়। সে কলব ছিল জাগ্রত। এই কলব ঘুমন্ত। মসলিগু। কালিমাময়।



আমাদের মতো নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ, পাপী কলব নিয়ে কুরআন পড়তে বসে, একেক সময় একেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। কখনো কুরআন কারীমের সাথে একাত্ম হতে পারে, বিশেষ মুহূর্তে কুরআনকে আপন করে নিতে পারে! কুরআন কারীমের গভীরে ডুব দিতে পারে! কখনো অস্পষ্ট আওয়াজে করে পড়ে তড়িত সিজদা দিয়ে দেয়।

যারা সব সময় পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, সব সময় কুরআন কারীম নিয়ে থাকার চেষ্টা করেন, তারা কুরআন কারীমকে কতটা আপন করে পান? তাদের অবস্থা হল, প্রতি মুহূর্তেই তারা আগের তুলনায় আরেকটু উচ্চাসনে আসীন হতে থাকেন! কুরআন কারীমের আরেকটু 'গভীরে' পৌছেন! ধারাবাহিক এই ডুবসাঁতারে, তারা কতোটা অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন? জীবন্ত, জাগ্রত, পাপমুক্ত কলব সব সময় কুরআনী অর্থসাগরে হাবুডুবু খেতেই থাকে। নানা পাপাচারে লিপ্ত কলব কুরআন কারীম থেকে অহরহ দূরে সরতে থাকে।

কুরআনিস্ট

একটা দল আছে, যারা কথায় কথায় কুরআন নিয়ে আসে। যেখানে সেখানে কুরআন প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কুরআনকে সব সময় এগিয়ে রাখে। কুরআন কারীম একমাত্র সংবিধান। কুরআন কারীম ছাড়া মানবতার মুক্তি নেই। কুরআন ছাড়া আর কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কুরআন কারীম ছাড়া বাকি সব অচল। রীতিমতো বাড়াবাড়ি পর্যায়েই হয় তাদের কুরআনচর্চা। কুরআন কারীমের অভূতপূর্ব সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করে তারা। যুবক শ্রেণী অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের এত কুরআন-প্রীতি দেখে স্বভাবতই কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, কী ব্যাপার? তারা এত কুরআনপ্রেমী হলো কী করে! এদের কেউ তো মাদরাসায় পড়েনি! তাদের পোশাকাশাকও ধর্মীয় নয়! তাহলে...? খোঁজ নিতে নিতে বের হয়ে আসে,

“এরা কুরআনিস্ট, (فُرَائِصُ)”

গুধুই কুরআন মানে। হাদীস মানে না। তারা অতি সচেতনভাবেই কুরআনকে বেশি বেশি সামনে আনে। আলোচনায় আনে। পরোক্ষভাবে চেষ্টা করে, যেন হাদীস আড়ালে চলে যায়। যতই দিন গড়াচ্ছে, ধর্মের নামে নিত্য-নতুন মহল-গোষ্ঠী জন্ম নিচ্ছে। এরাও তেমন একটা দল মনে করেছিলাম। কিন্তু কুরআন কারীম বলছে, আমার ধারণা ভুল।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

তারা (কাফেররা) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। যখন তারা বলেছে, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি। (আন'আম: ৯১)

কাফেররা সুকৌশলে নবীজির ভূমিকাকে গোণ করে ফেলতে চেয়েছিল। তারা ওহীকে অস্বীকার করতই, ওহী অবতরণের ক্ষেত্রেও অস্বীকার করত। নানা ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিত। কুরআনিস্টরাও কুরআনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, হাদীসকে গোণ করে ফেলতে চায়। তারা বলে, হাদীস মানুষের কথা, এতে ভুলভ্রান্তির অবকাশ থাকে। কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে ভুলের অবকাশ কম! এই মানুষগুলো সহজ একটা কথা বোঝে না, কুরআন কারীমেই তো 'রাসূল' সা.-কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে?

বাতিল-নাস্তিকতামুক্ত সমাজ

বাতিল আজ সমাজের রক্তে রক্তে। চিন্তার প্রতিটি অলিগলিতে বাতিল ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ওমরপন্থীরাও আজ বসে নেই। তারাও মাঠে নেমে এসেছে। তাদের ইখলাস-মেহনত নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাদের কারো কারো একটা কথা একটু ভাবিয়ে তোলে বৈকি! তারা বলেন,

-আমাদেরকে বিস্তারিত পড়াশোনা করতে হবে। কাফের-নাস্তিকদের চিন্তাগুলো জানতে হবে। তাদের মোকাবেলায় পাল্টা চিন্তার ভিত গড়তে হবে। বাতিলের সমস্ত অভিযোগের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। ইসলাম কোনো মানবরচিত ধর্ম নয়।

সন্দেহ নেই, চিন্তাটাতে যৌক্তিকতা আছে। বর্তমানে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিরোধে কিছু করা দরকার। কিন্তু পাল্টা প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে, আমরা সেই আব্বাসী যুগে ফিরে যাচ্ছি না তো? গ্রীক দর্শনের মোকাবেলা করতে গিয়ে, দর্শন-যুক্তিবিদ্যা শিখলাম। খাল কেটে কুমির আনলাম। সে কুমির থেকে আজো মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি!



আব্বাসী যুগের বাতিল প্রতিরোধ আন্দোলন সফল হয়েছিল। পাশাপাশি কিছু খারাপ প্রভাবও সৃষ্টি করেছিল। যুক্তিবিদ্যা-দর্শন-ইলমুল কলাম চর্চা করতে গিয়ে, কেউ কেউ, ক্রমে ক্রমে, কুরআন কারীম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। বর্তমানে বাতিলের (নাস্তিকতার) প্রতিরোধ আন্দোলনে নামা ভাইদের একটা দিক খেয়াল রাখা বোধহয় জরুরী! আমরা বাতিলের মোকাবেলা করব। তাদের অস্ত্র দিয়েই তাদেরকে ঘায়েল করব। তবে শত্রু নিধনের পাশাপাশি নিজের ঘরকেও নিরাপদ রাখার প্রতি প্রয়াসী হতে হবে। বাতিলের দিকে পাল্টা যুক্তি ছুঁড়ে দেয়ার পাশাপাশি, আমাদের যুবসমাজের হাতে কুরআন তুলে দেয়া দরকার। আমাদের শিশুদের বুকে কুরআন কারীম গেঁথে দেয়া দরকার। বোনদের মুখে জারি করে দিতে হবে কুরআন। এজন্য যা যা করা দরকার সবই করতে হবে। তাহলে অন্দর-বাহির উভয়দিক সুরক্ষিত থাকবে।



বাতিলের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদের চিন্তা পড়া ও চর্চা করা বিপদজনক। সবার পক্ষে এই বিপদের মোকাবেলা করে টিকে থাকা অসম্ভব। আমাদের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই কুরআন কারীমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। পরিচয় মানে 'আরবী হরফ উনত্রিশটি, মাখরাজ সতেরটি' এর মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকা নয়। নাযেরা-হেফযের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা নয়। শুধু তরজমা শেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা নয়। তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই কিছু বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। অভিজ্ঞজনেরা এ-ব্যাপারে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন।

□□□□

১. কুরআন কারীমের শব্দার্থ শেখা, আয়াতের অর্থ বোঝা, আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করা। প্রতিটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করে করে কুরআন খতম করা।
২. কুরআন কারীমের 'কুফর'কে অত্যন্ত ঘৃণিত করে দেখানো হয়েছে। একটি শিশুর মনে কুফরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়া গেলে, তার জন্য আর চিন্তা করতে হয় না। সরাসরি কুরআনের আয়াত শুনিয়েই এ-কাজ করতে হবে। নিজের চিন্তা বা যুক্তি থেকে নয়।
৩. কুরআন কারীম দুনিয়াকে উসীলা বা মাধ্যম হিসেবেই চিত্রিত করেছে। আখেরাতকেই মূল লক্ষ্য বানিয়েছে। এ-বিষয়ক আয়াতগুলো বারবার শিশুর কানে, সত্যের সন্ধানী যুবকের মনে গঁথে দিতে হবে। দুনিয়ার চাকচিক্যের অসারতা তার সামনে তুলে ধরতে হবে। কুরআনী পদ্ধতিতে। কুরআনের আন্দায়ে। কুরআনী আমেজে।
৪. পরনারী, পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক সম্পর্কে কুরআন কারীমের শিক্ষা যুবকের কানে-মনে গঁথে দিতে হবে। কুরআন কারীমের পাতায় পাতায়, তাকওয়ার যে শিক্ষা বুনে রাখা আছে, সেটা তাদের মনেও বুনে দিতে হবে।
৫. ওহীর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। শিশুবেলা থেকেই ওহীর অকাট্য অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে রাখতে হবে। যে চিন্তা ওহীর বিরুদ্ধে যাবে, সেটা অসার! অসার!! অসার!!! এমন কথা মনের পর্দায় নামতার মতো এঁকে দিতে হবে।
৬. কুরআন কারীমে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এটা করা আবশ্যিকও। শৈশব থেকেই সৎ-অসতের পার্থক্য বুঝিয়ে দিতে হবে। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রতি শুধু উদ্বুদ্ধ নয়, প্রস্তুত করে দিতে হবে।
৭. কুরআন কারীম ব্যক্তি-স্বাধীনতার লাগাম ছেড়ে দেয় না। যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি কুরআন কারীম দেয় না। কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, তার একটা রূপরেখা কুরআন কারীম দিয়ে দেয়। শিশুকে বারবার বলতে থাকা, আমার করণীয় ও বর্জনীয় কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকেই গ্রহণ করতে হবে।
৮. হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দের কথাও তার সামনে পরিষ্কার করে তুলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সে কুরআনী আয়নায় যেন হক বাতিল চিনতে পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. কুরআনী আইন ছাড়া বাকি সব আইন বাতিল অসার। শরীয়াহ শাসনই মানবতার একমাত্র মুক্তি। অন্য সব কিছু হাবাআম মানসূরা (هَبَاءُ مَسُورَا)। বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। এটা তাকে প্রতিদিন কয়েকবার করে শোনাতে হবে। এ-বিষয়ক আয়াতগুলো মুখস্থ করাতে হবে।

১০. কুরআন কারীম সবধরনের শক ও সন্দেহের উর্ধ্বে। কুরআন কারীম ইয়াকীনের শিক্ষা দেয়। দ্বিধা-দোদুল্যমানতাকে ধুলিস্যাৎ করে। কচি মনে একথা ঐকে দিতে হবে।

১১. আগের যুগে একটা জাতি, আল্লাহর বিধানকে নিজের ইচ্ছামতো রদবদল করার কারণে নিকৃষ্ট বানরে (فردة خاسئين) পরিণত হয়েছিল। তারা আল্লাহর আয়াতকে চাহিদা মতো 'তাবীল' (ব্যাখ্যা) করতো। তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। কচি মনে ঠুসে দিতে হবে, কুরআনী আইনে কোনো রকম রদবদল চলে না। শিশুমনে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের হঠকারিতা ও তার পরিণতিগুলো যত্নের সাথে লিখে দিতে হবে। সেটা হবে সরাসরি কুরআনের আয়াত থেকে। 'গল্পে আঁকা ইতিহাস' বা 'জীবন জাগার গল্প' ধর্মী বই থেকে নয়।

১২. গুনাহ করলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে, কী পরিণতি হতে পারে, তার বাস্তব চিত্রগুলো কুরআন কারীম থেকে পেশ করা। শিশুমনে এর ভয়াবহতা ঐকে দেয়া। তাকে বারবার বলা, পৃথিবীতে যত বিপদাপদ হয় সবই মানুষের পাপের ফসল।

১৩. হাঁটি হাঁটি পা পা বয়েস থেকেই শিশুকে ঈমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। তাওহীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। ঈমান ও তাওহীদ গ্রহণ করলে, কি কি দায়িত্ব নিজের ওপর বর্তায়, তা খোলাসা করে দেয়া। বুঝতে না পারলেও সহজ ভাষায় বলতে থাকা। সরাসরি আয়াত দিয়েই।

১৪. তার মধ্যে কুরআনী আখলাক তৈরির চেষ্টা চালানো। আখলাক বিষয়ক আয়াতগুলো শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাকে পড়ে পড়ে শোনানো। তরজমাসহ একবার হলে, তরজমা ছাড়া দশবার শোনানো। মূল কুরআনের শক্তি অনস্বীকার্য।

একটা শিশুকে একজন কিশোরকে, একজন তরুণকে কুরআনের এ-শিক্ষাগুলো বারবার দিতে থাকলে, সমাজে-রাষ্ট্রে বাতিল মাথাচাড়া দিতে পারে না। দেয়ার সাহস করতে পারে না।



কারো সামনে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করলে, সে চেষ্টা করে পাল্টা যুক্তি দিতে। পক্ষান্তরে একজন সত্যসন্ধানী মানুষের সামনে কুরআন কারীমের আয়াত পেশ

করা হলে সে কোনো চিন্তা বা যুক্তির মুখোমুখি নয়, সরাসরি আল্লাহর মুখোমুখি হয়। তখন তাকে বক্তব্যটা হয় পুরোপুরি মেনে নিতে হয় নয় মুনাফিকি করতে হয়। কুরআনী আয়াতের সামনে কোনো প্রকার নিজস্ব চিন্তা-যুক্তি খাটানোর উপায় নেই।

□□□□

যুবসমাজের কাছে সরাসরি কুরআন কারীম পেশ করতে হবে। আমরা মনে করি, একজন অবিশ্বাসী সন্দিক্ধ যুবককে কুরআন কারীম দিয়ে কী লাভ? সে তো বিশ্বাসই করে না। আগে তাকে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান দিয়ে দেয়া যাক। তবে হ্যাঁ, তাকে সত্যসন্ধানী হতে হবে। তাহলেই কুরআন কারীম তার উপকারে আসবে।

□□□□

আমরা যুবসমাজকে কুরআনমুখী করার চেষ্টা করতে পারি। কুরআন কারীম বোঝার মেহনতে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। ইনশাআল্লাহ, ফলাফল হবে অভূতপূর্ব। যুবকদের হাতে কুরআন তুলে দেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারলে, আজকের দিনের অনেক কাজই কমে যাবে। তবে কিছু মানুষ আছে, তাদের জন্য কখনো কখনো শুধু কুরআন যথেষ্ট হয় না। তারা বক্ত্র চিন্তায় এতটাই নিমজ্জিত, তাকে কুরআন দিলেও সে গ্রহণ করবে না। এমন যুবকদের জন্য প্রয়োজন:

ক. কোনো বুয়ুর্গের সোহবত।

খ. বক্ত্রচিন্তার গঠনমূলক আলোচনা করে লিখিত বই। পাশাপাশি কুরআন কারীম।

□□□□

সত্যসন্ধানী হয়ে, হিদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে, একবারের কুরআন তিলাওয়াত, লাখো আকর্ষণীয় বয়ানের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী। বিশ্বের সবচেয়ে অকাট্য যুক্তির চেয়েও কুরআন কারীমের ছোট্ট একটা আয়াতের জাদুকরি প্রভাব অনেক বেশি। তবে কেন আমি শক্তিশালী মাধ্যমকে পাশ কাটিয়ে, নিজের কথা দিয়ে আরেকজনকে দাওয়াত দিতে যাব? কুরআন আরবী ভাষার? কিন্তু সেটা যে আল্লাহর কালাম! না বুঝলেও কুরআনের শক্তি, আমার বোধগম্য বাঙলা কথার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। আমি একটা কথা বললে, যুক্তি দিলে, সেটা শুধু কিছু বাক্য আর অর্থের সমন্বয় হবে। পক্ষান্তরে কুরআন কারীমের আয়াতের মধ্যে শব্দ ও অর্থ ছাড়াও এমন কিছু আছে, যা মানবীয় কল্পনার অতীত।

□□□□

দুনিয়ার সবকিছুর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন কারীম নিয়ে বসলে আগের আমি আর পরের আমিতে অনেক তফাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। পাঠকের ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়-অন্যায়বোধ সবকিছুতে পরিবর্তন আসবে। কুরআন কারীমকে হিদায়াত তলবের জন্য নয়, নিছক 'জ্ঞান' অর্জনের জন্য পড়লে কিছু তথ্যজ্ঞান হয়তো বাড়বে, কিন্তু ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আসবে না।

□□□

কিছু মানুষ থাকেন, যারা সহজ কিছু বুঝতে চান না। তারা সব সময়ই কঠিন কিছু পড়তে ও জানতে পছন্দ করেন। সাধারণ মানুষের মতো সহজ বিষয় তাদের মন ভরাতে পারে না। তারা জ্ঞানগরিমায় এগিয়ে থাকতে চান। তাদের জন্যও কুরআন যথেষ্ট। তবে উপস্থাপনটা ব্যক্তির উপযোগী করে হওয়া চাই।

□□□

কথাটাকে আমরা শ্লোগান বানাতে চাই,
“আমাকে একটি সত্যসন্ধানী ‘খতম’ দাও, আমি তোমাকে একজন ‘মুসলিম’ দেবো।”

মুতাফফিফ!

মুতাফফিফ (الْمُطَفِّفِ) অর্থ যে ওজনে কম দেয়। পাওনা আদায়ে ঘাটতি করে। মেপে দেয়ার সময় দাঁড়িপাল্লার চোরাই কারসাজিতে ক্রেতাকে ঠকায়। পাল্লার নিচে চুষক লাগিয়ে রাখে। একদিকের রশি ছোট করে রাখে। একদিকের রশিগুলো ভিজিয়ে বা মোম লাগিয়ে রাখে। এমন মানুষ সম্পর্কে কুরআন কী বলে?

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

ধ্বংস হোক! যারা ওজনে কম দেয় তাদের। (সূরা মুতাফফিফ: ১)

□□□

-এই আয়াত পড়ে আমরা কী বুঝি? রাক্বের কারীম কাদের কথা বলছেন এই আয়াতে?

-কেন ব্যবসায়ীদের কথা!

-সেটা ঠিক আছে! কিন্তু শুধুই ব্যবসায়ী?

-বাহ্যিকভাবে তো সেটাই মনে হয়!

-শব্দটার অর্থটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। (مطفف) শব্দটার মূল হলো (اللطيف)। এমন বস্তু, যা মানুষ গুরুত্ব দেয় না। অর্থাৎ, কেউ এক কেজি ডাল কিনল। বিক্রেতা পাঁচ গ্রাম বা তারও কম ডাল দিতে কারচুপি করল। আল্লাহ তা'আলা যৎকিঞ্চিৎ ডাল কম দেয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতির হুমকি দিয়েছেন। গোটা একটা সূরাই নাযিল করেছেন এর গুরুত্ব বোঝাতে।

□□□□

এবার আমরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাখ্যা দেখি।

-মুতাফফিফ কারা?

الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَؤْزَرُوهُمْ يُخْسِرُونَ

যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয়া কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (২-৩)

নিজের স্বার্থজ্ঞান টনটনা। পুরোটা কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নেয়। কিস্তি দেয়ার সময় নয়ছয় করে। গড়িমসি করে। ধানাইপানাই করে। আকসা-আকসি করে।

□□□□

এবার আগের প্রশ্নে ফিরে আসি।

-শুধু কি ব্যবসায়ীদের জন্যই গা শিউরানো জলদগম্বীর হুমকি ধ্বনিত হয়েছে?
-জ্বি না। মুতাফফিফ শব্দের ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক। বিস্তৃত।

□□□□

এক.

স্বামী চায় স্ত্রী সারাক্ষণ তার সেবাযত্ন করুক। তাকে ভালোবাসুক। তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকুক। দুপুরবেলা ভাতঘুমের ঘোরে শুয়ে শুয়ে বইয়ের পাতায় তার প্রতিচ্ছবি দেখুক! বিকেলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তার প্রতীক্ষায় উন্মুখ প্রহর গুণুক!

স্বামীপ্রবর হেলেদুলে ঘরে ফিরল। স্ত্রীর কষ্ট, অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অবিশ্রান্ত সেবাযত্নকে পায়ে দলে গোমড়া মুখে হোমরাচোমরা সেজে, ডাকাবুকো ভঙ্গিতে মোবাইল-টিভি-ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী সারাদিন কী করল, কী খেল, কেমন ছিল, কোনও খোঁজ-খবর না করেই এটা আনো ওটা আনোর বহর বইয়ে দিল!

ইনি কি মুতাফফিফ?

দুই.

প্রাইভেট পড়াচ্ছে। কিন্তু একঘণ্টার পরতাল্লিশ মিনিটই ব্যয় করল মোবাইলের পেছনে! মাসশেষে বেতনটা ঠিকই কড়কড়ে নোটে গ্রহণ করলো।

ইনি কি মুতাকফিফ?

□

তিন.

সরকার বেতন দিচ্ছে ছাত্র পড়ানোর জন্য। কিন্তু ক্লাশে অংকটা বুঝতে গেলেই খেঁকিয়ে উঠে বলছে,

-এ্যাই, ক্লাসে এত প্রশ্ন কিসের রে! বিকেলে বাসায় আসতে পারিস না!

ইনি কি মুতাকফিফ?

□

চার.

উনি গোস্বায় গাল-নাক-পেট-পিঠ ফুলিয়ে গজরাচ্ছেন!

-কী হলো? ফোনে খবর নিয়েছিলে একবারও? কী খাচ্ছি? বেঁচে আছি না রসাতলে গিয়েছি?

-ও, তোমার কাছে ফোন ছিল না?

-হু ছিল...!

-তাহলে ফোনটা 'ছা' ফোটানোর জন্য রেখেছিলে? অন্যের কাছে যা আশা কর সেটা নিজে করতে পারো না কেন? তুমি মনে মনে চাও, দুনিয়ার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তোমাকে ফোনের পর ফোন করুক, আর তুমি মজাসে নিজের ব্যালাস বাঁচিয়ে চলবে! কারো খোঁজখবর করবে না! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কি তোমার ওপরও সমানভাবে বর্তায় না?

এই লোক কি মুতাকফিফ!

□

পাঁচ.

তুমি চাও, আশেপাশের সবাই তোমার সাথে খাঁটি সুন্দরবনের মধুর মতো মিঠা মিঠা বাতচিত করুক, আর তুমি সবার সাথে গাঁক গাঁক করে তেতো কথা বলবে! তুমি কি মুতাকফিফ?

□

ছয়.

কেবলই মিসড কল দাও। মাসে তোমার মোবাইল খরচ সাকুল্যে পাঁচটাকা! তোমার জ্বালায় অস্থির সবাই! তোমার প্রয়োজনে সময়ও তুমি আশা করে বসে থাকো, অন্যরাই তোমাকে ফোন করবে!

তুমি কি মুতাকফিফ?

সাত.

কোথাও বেড়াতে গেলে তুমি বাজারের সবচেয়ে কমদামী মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে, বুকের ছাতি ফুলিয়ে, বুকে গর্বিত হাসি ঝুলিয়ে কুটুমবাড়িতে যাও। কিন্তু নিজের বাড়িতে মেহমান এলে মনে মনে টিকটিকিয়ে কামনা করো, বিশ্বের সের মিষ্টি নিয়ে আসবে।

তুমি কি মুতাকফিফ?

11

আট.

বক্তব্য দিতে বসলে সাক্ষাত 'যুগের দ্রষ্টা'। মসজিদে বা পাড়ার সালিশে লোকদের ভুল ধরতে ধরতে জেরবার করে ছাড়ে! কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থা শোচনীয়। নিজের ঘরেই দীন নেই, আদর্শ নেই।

মুতাকফিফ?

হাঁ, এরা সবাই হয়তো কুরআন কারীমে বর্ণিত হুবহু মুতাকফিফ নয়, কিন্তু এদের মধ্যে লোক ঠকানোর প্রবণতা বিদ্যমান। নিজের হক পুরোপুরি বুঝে নিয়ে, অন্যকে কম দেয়ার মানসিকতা প্রকট। মানুষকে ঠকিয়ে পার পাওয়া যাবে! উঁহু, পালাবে কোথায়!

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে! (মুতাকফিফ: ৩)

কুরআনপ্রেমী কাকের।

মাঝেমধ্যে প্রশ্ন জাগে, আমরা যারা সাধারণ অনারব, তারা কুরআন বুঝি না। মুখস্থই পড়ি। তিলাওয়াত করি। আবার অনেকেই আছি কুরআন পড়ি না, পড়তে পারি না। কুরআন শুনি না, শোনার আগ্রহ বোধ করি না। কুরআনের চেয়ে গান শুনতেই বেশি পছন্দ করি। তাহলে কি আমরা মক্কার কাকেরের চেয়েও খারাপ? একদিনের ঘটনা। আবু জাহল রাতের আঁধারে চুপি চুপি নবীজির ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। আরেক দিক থেকে রওয়ানা দিল আবু সুফিয়ান। আখনাস বিন শুরাইকও সম্ভরণে এল। সবার লক্ষ্যই এক। মুহাম্মাদের কুরআন তেলাওয়াত শুনবে।

সবাই যে যার মতো কুরআন শুনতে লাগল। তন্ময় হয়ে। মোহাবিষ্ট হয়ে। মত্তমুগ্ধ হয়ে। আশপাশ সম্পর্কে বেখবর হয়ে। সবাই ভাবছে, সে একাই এসেছে। কুরআন শুনতে শুনতে ভোর হয়ে গেল। এবার যে যার বাড়ির পথ ধরল। চৌরাস্তার মোড়ে এসে তিনজনই মুখোমুখি!

-আরে, আবু সুফিয়ান যে! এদিকে কী মনে করে এত ভোরে?

-আখনাস, তুমিও?

-আবুল হাকাম, তুমি কেন?

সবার মুখ কাঁচুমাচু! ধরা পড়া বেড়াল। ঠিক আছে, আগামীকাল থেকে আর আসবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। মুহাম্মাদের কথা শোনা আমাদের উচিত নয়। সে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। আমরা নেতারা এমন করলে সাধারণ জনগণ কী করবে!

□□□

দ্বিতীয় রাতেও হুবহু একই ঘটনা ঘটল। সকালে আবার চৌরাস্তায় মুখোমুখি। আবার প্রতিজ্ঞা। এই শেষ। আর এমুখো হচ্ছি না। কস্মিনকালেও না। ঠিক আছে...?

□□□

তৃতীয় দিন আবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মক্কার নিকৃষ্টতম কাফেরও যদি কুরআনের প্রতি এত দিওয়ানা হতে পারে, আমরা এমন কেন? হ্যাঁ, একজন কাফের শত বছর কুরআন শুনে ঈমান না আনলে, একজন নগন্য ঈমানদারের ধারেকাছেও আসতে পারবে না। কিন্তু কুরআন শোনার প্রতি বুদ্ধি ইচ্ছা থাকা তো একটা গুণ। একজন কাফেরের মধ্যে কুরআনের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ থাকতে পারলে, আমার মধ্যে কেন থাকবে না!

□□□

কুরআন কি অন্তরের জন্য শিফা বা আরোগ্য নয়? আল্লাহর কথায় কোনো সন্দেহ নেই! তাহলে আমার মনে গানের প্রতি আকর্ষণ কেন? কুরআন শোনার প্রতি অনীহা কেন? একজন ভয়ংকরতম কাফের সারা রাত জেগে কুরআন শুনতে পারে! আমি রাত জেগে গান শুনছি! কাফের কুরআনে মজা পাচ্ছে আর আমি মুসলমান হয়ে মজা পাচ্ছি অন্য কিছুতে! নিজের জং ধরা কলবই এর জন্য দায়ী, এতে সন্দেহ নেই। তবে কুরআন না বুঝতে পারাটাও এই অনীহার পেছনে বহুলাংশে দায়ী। শুধু কুরআন পড়তে শেখা নয়, বুঝতে শেখারও চেষ্টা করা আবশ্যিক।

কুমার গল্প

কখনো কখনো আমরা ক'জন মিলে বসা হয়। বিশেষ কোনো বিষয়ে পরামর্শ থাকলে, আমরা একসাথে হই। ভোজন-কুজন দুটো একসাথে চলে। ছ'মাসে

ন'মাসে, মাঝেমধ্যে। এবারও বসা হলো। কথাবার্তার এক পর্যায়ে একজন বললো,

-আমি জীবনেও 'তাকে' ক্ষমা করতে পারবো না। সে আমাকে এতবড় ঘোণ খাইয়েছে!

আমার মুখ দিয়ে সাথে সাথে বের হলো:

-আলা তুহিব্বুনা আন-ইয়াগফিরাল্লাহ্ লাকুম।

-মানে?

-মানে তো অনেক লম্বা! শাদিকভাবে বলতে গেলে, তুমি কি চাও না আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন? তবে আরও ঘটনা আছে।

-কোন ঘটনা...?

-আবু বকর রা.-এর।



একটু পেছনে যাওয়া যাক। আমাদের মাদরাসায় প্রতি বছরই ত্রিশ পাঠ্য পুরোটাই শাদিক-ভাব তরজমা পড়ানো হয়। আঠার নাম্বার পাঠ্যটি আমরা বছরের শেষের দিকে পড়ানোর চেষ্টা করি। কারণ আর কিছুই নয়, সূরা নূরের বাইশ নাম্বার আয়াত।

এই আয়াত নিয়ে তালিবে ইলমদের মুখোমুখি হতে লজ্জা লাগে। অনেক তালিবে ইলমকে বকাবকি করতে হয়। কারো কারো প্রতি রাগ দেখাতে হয়। অপরাধ বিচারে শাস্তি দিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি রাগ-বিদ্বেষ পোষণ না করলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে ঠাটবাট দেখাতে হয়।



আয়াতের ভাবটা একটু জেনে নিই, তাহলে 'তাসাওউর-কল্পনা' করতে সুবিধে হবে।

وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُخْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমাদের মধ্যে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা যেন আত্মীয়দের, নিঃস্বদের এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে দান না করার শপথ না করে। তারা যেন ক্ষমা করে আর (দোষত্রুটি) উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ তো ক্ষমামূলক, পরম দয়ালু। (আননূর: ২২)



আয়াতের শানে নুযূলটা জানলে আরও পরিষ্কার হবে। শি'আরা যেসব কারণে কাফির, ইফকের ঘটনা তার অন্যতম। তারা আম্মাজান আয়েশা রা.-কে জঘন্য অপবাদ দেয়। কুরআনের আয়াত অস্বীকার করে। ইফকের ঘটনায় মুনাফিকদের প্রচারণা-প্রতারণার শিকার হয়ে, কিছু সরলমনা সাহাবীও আলোচনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মিসতাহ বিন আসাসাহ রা.। একজন বদরী। মুহাজির। আবু বকর রা.-এর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। অত্যন্ত গরীব। আবু বকর রা. তাকে নিয়মিত কিছু মাসোহারা দিতেন। মেয়ের দুঃসময়ে মিসতাহর এহেন আচরণে ভীষণভাবে মর্মান্বিত হলেন। মনের দুঃখে শপথ করলেন, মিসতাহর মাসোহারা বন্ধ করে দিবেন। এরই প্রেক্ষিতে নাথিল হলো ওপরের আয়াতটা।

□

একবার আমাদের এক ছ্যুর ভীষণ রাগ করলেন। ক্ষমা চেয়েও পার পাওয়া যাচ্ছিল না। বারবার ধর্না দিয়েও কাজ হচ্ছিল না। খুবই অস্থির সময় যাচ্ছিল আমাদের। অন্য ছ্যুরকে দিয়ে সুপারিশ করাবো সে উপায়ও নেই। শেষে মাথায় বুদ্ধি খেলল। একটা শাদা কাগজ নিয়ে সুন্দর করে আরবীতে আয়াতটা লিখলাম। (أَلَا تَحْسَبُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) এ-অংশটুকু লিখলাম আলাদা করে, ভিন্ন কালিতে। চোখে পড়ার মতো করে।

ছ্যুর দরসে যাওয়ার পর ফাঁক পেয়ে, আয়াতসম্বলিত কাগজটা বালিশের ওপর রেখে এলাম। দূরদূর বক্ষে অপেক্ষা করছি। ডাক পড়লো। কামরায় প্রবেশ করলাম ভয়ে ভয়ে। ছ্যুর কাগজটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই জড়িয়ে ধরলেন। দেখলাম, চোখ দু'টো অশ্রুসজল। বিড়বিড় করে বলছেন,

-(بی) বালা, অবশ্যই চাই! অবশ্যই চাই!

তখন বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ছ্যুর কথাটা আমাকে নয়, আল্লাহকে বলছিলেন: হাঁ, অবশ্যই আমি চাই আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন!

□□□

এ-যুগের সাধারণ একজন মানুষের ওপর যদি আয়াতটার এত প্রভাব পড়ে, সিদ্দীকে আকবরের ওপর কেমন প্রভাব পড়েছিল? তিনি আয়াতটা শোনার সাথে সাথেই বলে উঠেছিলেন,

-আল্লাহর কসম! আমি চাই, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন!

ছুটে গেলেন মিসতাহের কাছে। আগের মতোই মাসোহারা দেয়া শুরু করলেন। দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিলেন:

-আমি আর কখনোই এটা দেয়া বন্ধ করবো না!

তাদের সমস্ত দৌড়ঝাঁপ কুরআন কারীমে এসে থেমে যেত। আমি মানার ভয়ে কুরআন কারীম ভালো করে পড়ি না। কোনও আয়াতে বর্ণিত তিক্ত সত্যের মুখোমুখি হয়ে গেলে, ব্যতিক্রমী কোনও ব্যাখ্যা বের করে, পাশ কাটিয়ে আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়াস চালাই।



প্রতি বছর যখন এই আয়াত আমরা দরসে পড়ি, সবাই মিলে গণক্ষমার আয়োজন করি। এ ক্ষমা করে তাকে, ও ক্ষমা করে একে। আমার ছয়ুয়ের ঘটনাটা জানার পর, এক দুষ্ট ছাত্রও আমাকে একবার 'ইমোশনাল ব্র্যাকমেইলিং'-এর ফাঁদে ফেলেছিল। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, সে আমাকে আয়াতখানার সামনে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। আসলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলতে কিছু নেই। তবে হাঁ, ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতিটা গ্রহণযোগ্য হতে হয়। তাওবাটি খালেস নাসূহাহ (বিশুদ্ধ) হতে হয়।

কুরআনের প্রতি অবহেলা

কুরআনে আছে, এই কুরআন অনেক মানুষের জন্য যেমন হিদায়াতের উৎস হবে, পাশাপাশি অনেক মানুষের জন্য গোমরাহীরও কারণ। মাঝেমধ্যে মনে হয়, বর্তমানে 'হাদীস শরীফ'-এর অবস্থাও ঠিক তেমনি। নবীজির হাদীস মানুষকে হিদায়াত করছে ঠিকই, পাশাপাশি কিছু মানুষকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শরীয়তের কোনো বিধান খুঁজতে গিয়ে প্রথমে কুরআনের দিকে রুজু না করে, হাদীসের দিকে ধাবিত হয়। এই রোগ এখন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে।



কেউ কেউ বুয়র্গদের জীবনী পড়তে আগ্রহী। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পড়তেও আগ্রহী। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত আশিয়ায়ে কেরামের ঘটনা পড়ার প্রতি অতোটা আগ্রহী নয়। আগ্রহী হলেও, শুধু গল্পটা পড়েই খালাস। আল্লাহ তা'আলা কেন ঘটনাটা বললেন, সেদিকে কোনো ক্রক্ষেপ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

সূতরাং আপনি (তাদেরকে) এসব ঘটনা শোনাতে থাকুন, যাতে তারা চিন্তা করে। (আ'রাফ ১৭৬)

কিন্তু আমরা চিন্তা করা বা শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী নই। শিক্ষা না মানতে পারি, শিক্ষা বের করার চেষ্টা তো করতে পারি! পাশাপাশি এটাও ঠিক,

শরীয়তের সবকিছু কুরআন কারীমে নেই। হাদীস শরীফ এসব ক্ষেত্রে সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব প্রথমে কুরআন কারীমে আসা। এখানে না পেলে তারপরে হাদীসে যাওয়া।

□□□

যতোটা আগ্রহ নিয়ে বাঙলা বোখারী কিনতে যায়, অতোটা আগ্রহ নিয়ে কুরআন কিনতে যায় কি না সন্দেহ। আমরা যতোটা হাদীসের পেছনে সময় ব্যয় করি, ততোটা সময় কুরআনের পেছনে ব্যয় করি কি না সন্দেহ আছে। দ্বীনি আলোচনায় বা তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে, দলীল খুঁজতে গিয়ে কারো চিন্তায় প্রথমেই কুরআন কারীম না এসে বোখারী এসে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে, তার চিন্তায় অসঙ্গতি আছে। তার মধ্যে সামান্য পারিমাণ হলেও, পাশ্চাত্য আগ্রাসনের প্রভাব কাজ করছে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বিষ টুকেছে। সব দলীল কুরআন কারীমে থাকবে না, এটা জানা কথা। পাশাপাশি পরিষ্কার থাকতে হবে, আমি যে বিষয়ের দলীল খুঁজছি, সে বিষয়ে কুরআনে দলীল নেই, এবার হাদীসের দিকে যাওয়া যেতে পারে। একজন মুমিনের স্বভাব তো এমন হবে, কিছু হলে প্রথমেই কুরআনের দিকে মনটা রুজু হবে। সেখানে সুস্পষ্ট কিছু না পেলে, হাদীসের দিকে যাবে। কিন্তু আমাদের কারো কারো স্বভাবই যে ভিন্নরকম হয়ে গেছে! তাই বলে প্রথমে কুরআন কারীমে না খুঁজে হাদীস শরীফে খুঁজলে গুনাহ হবে, এমন নয়। আমরা শুধু মানসিকতায় কুরআন কারীমকে প্রথমে আনার কথা বলছি।

□□□

হাদীস শরীক হলো কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা। কিন্তু ‘টেক্সট’ না বুঝলে তবেই না, নোটের দিকে যাওয়া হয়। মূলবই না বুঝলে তবেই না ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হয়। আমরা এখন নকল করে পরীক্ষা দেয়ার মতো, টেক্সটে হাত না দিয়ে, প্রথমেই নোটে হাত লাগাই, নোট নিয়েই পড়ে থাকি। অথচ কুরআন কারীমের শব্দ নিজেই একটা জীবন্ত মুজিয়া। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসও ওহী, তবে অর্থটা ওহী। শব্দ নয়। হাদীসে কুদসীর ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। মোটকথা আমরা বলতে চাই, মনকে প্রথমে কুরআনমুখী হতে অভ্যস্ত করবো। হাদীস থাকবে দ্বিতীয় স্তরে।

কারি-মুতার

সুলাইমান বিন আবদুল আযীয রাজেহী। একজন সৌদি বিলিওনিয়ার। সৌদি আরবের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের মালিক। ব্যাংকের নাম মাসরাফে রাজেহী।

প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত দীন-দরিদ্র ছিলেন। তবে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল টনটনে। কারো কাছে হাত পাততে রাজি ছিলেন না। কুলি-মুটের কাজ করেছেন। বাবুর্চির কাজ করেছেন। চা-কফি বিক্রি করেছেন। তার বয়েস এখন ৯৬। তার সম্পদের পরিমাণ ৭.৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু পরিশ্রম করা বন্ধ হয়নি। এ-বয়েসে এসে তার মনে এক অদ্ভুত খায়েশ জেগেছে। আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চান। ঠিক যেমন খালি হাতে শুরু করেছিলেন সেভাবে। সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সন্তানদের জন্য রেখে, বাকী দুই তৃতীয়াংশ বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দান করে দিয়েছেন। নিজে এখনো অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ-বয়েসেও সবার আগে অফিসে গিয়ে সবার পরেই ফেরেন। কিন্তু বয়েসের কারণে আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে পারেন না। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। তবে নিজের আত্মমর্যাদাবোধ হারাননি। কাজ করে খেতে চান এখনও। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না।

□□□□

একটা বয়েসে গিয়ে, অনেক সম্পদশালীর মনে টাকা-পয়সার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা এসে যায়। কারো কারো মনে দান-খয়রাতের প্রতি আগ্রহ জন্মে। নিজের প্রথম জীবনের স্মৃতি তাদেরকে তাড়া করে ফেরে। তারা দারিদ্রের কষ্টটা ভুলতে পারেন না। আর যারা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, তারা অন্যের কষ্ট আরও বেশি বোঝেন। অভাব সত্ত্বেও মুখ ফুটে সাহায্য চাওয়া যে কী অসম্ভব লজ্জার ব্যাপার, তাদের মতো ভুক্তভোগীরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন।

□□□□

শায়খ সুলাইমানের কথাটা পত্রিকায় পড়ার পর থেকেই, লাজুক অভাবীর বিষয়টা মাথায় ঘুরছিল। এর মধ্যে একদিন সূরা হজ্জ পড়া হচ্ছিল। আমাদের দরসের সবক'ও এখানেই। ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে একটা কথা আছে।

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَنْعًا

কুরবানীর গোশত তোমরাও খাও, কানি ও মূ'তারকেও খাওয়াও।
এ-দুই শব্দের বেশ কয়েকটা অর্থ করেছেন মুফাসসিরীনে কেলাম। আমরা শুধু ভাবটা ফুটিয়ে তুলছি।

কানি (كَنْيً): অল্পেভুট। ধৈর্য্যশীল অভাবগ্রস্ত। শত কষ্ট সত্ত্বেও হাত পাতেন না। মুখ ফুটে অভাবের কথা বলেন না। দাঁতমুখ চেপে অভাবের চাপ সহ্য করে যান।

মু'তার (المُتَّار): যাদ্ধাকারী অভাবগ্রস্ত। তবে সরাসরি চেয়ে বসেন না। এরাও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন তবে দারিদ্রের কষাঘাতে এতটাই জর্জরিত, সংসারের দশা এতটাই বেহাল, সন্তান বা স্ত্রী বা মা-বাবার কেউ এত বেশি অসুস্থ, ঘরে টিকে থাকা দায়। এদিকে চিকিৎসা করার মতো কানাকড়িও হাতে নেই। হাওলাত করার মতো কেউ নেই।

শেষমেষ নিতান্ত অপারগ হয়ে, বাচ্চার কান্না/ স্ত্রীর গোঙানি/ বাবা-মার কাত্রানিতে চোখেমুখে অন্ধকার দেখলে, ঘর থেকে বের হয়ে আসে লোকটা। কিছুক্ষণ উদ্ভ্রান্তের ন্যয় রাস্তায় রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের দুয়ারে পৌছে। ওজুখানায় বসেও কী সব ভাবতে থাকে। দীর্ঘ সময় নিয়ে ওজু সারে। মুখ ধোয় তো হাত ধোয়ার আগে আবার ভাবনারা এসে মাথায় ভীড় করে। নামাযে দাঁড়ানোর পরও ভাবনাগুলো চলে যায় না। আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা বলে। মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে। হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা সম্পদশালী কোনো বন্ধুর কাছে যায়। বন্ধু সহাস্যে অভ্যর্থনা জানায়। চা করে খাওয়ায়। কুশল বিনিময় করে। মুখ মলিন দেখে জিজ্ঞেসও করে,

-কী রে, কোনো সমস্যা!

তখনও রাজ্যের সংকোচ এসে জড়ো হয়। মনে মনে ভাবে,

-বলবো, টাকার কথা? বলেই দিই! নাহ থাক!

তারপর বন্ধুকে বলে,

-‘... টা অসুস্থ! ওকে নিয়ে চিন্তিত! একটু দু’আ করিস!

অভাবের কথা বলা হয়ে ওঠে না। কোথেকে যে এত লজ্জা এসে জমা হয়! ঘরে ফেরার উপায় নেই। এই ব্যক্তিই মু’তার!



দেড় কি দু’দিন আগে থেকে, কুরআন কারীমের সবকের প্রস্তুতি -মনে মনে- নেয়া শুরু করার অভ্যেস। সতের পারার এই পনের নাম্বার পৃষ্ঠাটাও দু’দিন আগে থেকে উঠতে-বসতে মনের খাতায় ওল্টাতে শুরু করেছিলাম। মনের ভাবনায় ছত্রিশ নাম্বার আয়াতটা বাড়তি কোনো দোয়াতনা নিয়ে আসেনি। দরসে যখন ‘মু’তার’ শব্দটা তাহকীক (বিশ্লেষণ) পেশ করতে শুরু করলাম, চট করে মাথায় ‘ক্লিক’ করল,

-গত কয়েকদিন ধরে একজন ‘তালিবে ইলম’ বারবার ফোন করে দু’আ চাইছে! তার মেয়েটা অসুস্থ! হাসপাতাল ভর্তি! পর্দা রক্ষা করার কারণে কেবিন ভাড়া করতে হয়েছে। টাকা-পয়সার ইস্তেজাম নেই। হুয়ুর, একটু দু’আ করবেন!

আরে, ছেলেটা তো বারবার ফোন করে শুধু দু'আই চাচ্ছে না, অন্যকিছু চাইছে। লজ্জার কারণে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। তাহলে সে তো কুরআনে বর্ণিত 'মু'তার'! কথাটা আগে মাথায় এলো না কেন?

আলহামদুলিল্লাহ! বিলম্বে হলেও আল্লাহ বোঝার তাওফীক দিয়েছেন। এবং ঢাকা শহরের দুর্গম যানজট পাড়ি দিয়ে এমাথা-ওমাথা চষে, আয়াতটার ওপর আমল করারও তাওফীক দিয়েছেন। হাতে যৎসামান্য 'হাদিয়া' তুলে দেয়ার পর ছেলেটা হুহু করে কেঁদে দিয়েছে। সে ভেবেছিল তার গরীব হুজুর শুধু বাচ্চাটা দেখতে এসেছেন। বাড়তি কিছু তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। আবেগ সামলাতে পারেনি।



ছেলেটার অসুস্থ মেয়েকে কোলে নিয়ে মনে হলো, অনেক সময় কিছু মানুষ যদি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে নাও পারে, কথা দিয়ে একটু সাস্তনা দিলেও অনেক বেশি কাজ হয়। ছাত্রটার কৃতজ্ঞ-আপ্নত দৃষ্টি দেখে তাই মনে হলো, সন্তানের বিপদে একজন 'মু'তার' পিতা কতোটা অসহায় বোধ করে, সেটা বোঝার মতো অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতাও আল্লাহ দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! মা'আযাল্লাহ।

আল্লাহর প্রিয়জন

আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। কাজেকর্মে না হলেও অন্তত মৌখিকভাবে এমনটাই প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসা তো একতরফা হয় না। তবে কি আল্লাহও আমাদেরকে ভালোবাসেন?

-জি, বাসেন!

-কখন? কীভাবে? কাকে?



তাওবা। হ্যাঁ, তাওবাকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। (বাকারা:২২২)

তবে তাওবার কিছু শর্ত আছে।

ক. সম্পূর্ণরূপে গুনাহ থেকে বিযুক্ত হওয়া।

খ. পূর্বকৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

গ. আর গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

ঘ. অন্যের হক আত্মসাতের গুনাহ হলে, তা ফেরত দেয়া।

☞ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা ।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(হে নবী)! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো,
তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে
ভালোবাসবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। (আলে ইমরান: ৩১)

নবীজি আমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। তার আদর্শ মেনে চললে এমনিতেই লাভ।
আমাদের সবকিছুই তার আদর্শে পরিচালিত করতে পারলে আল্লাহ অবশ্যই খুশী
হবেন।

☞ তাকওয়া। খোদাভীতি সবকিছুর মূল বিষয়।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (আলে ইমরান: ৭৬)

নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন:

ক. মুত্তাকী বান্দাকে।

খ. অমুখাপেক্ষী বান্দাকে।

গ. ইবাদতে আত্মনিয়োগী বান্দাকে। (মুসলিম)

তাকওয়া মানে কী?

-আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটা সেতু তৈরি করা। তার আদেশ ও নিষেধকে
পালন করার মাধ্যমে।

☞ ইহসান। সদাচার। যারা ইহসান করে, তারা 'মুহসিন'। কারা মুহসিন?

ক. গোপনে ও প্রকাশ্যে দানকারী।

খ. ক্রোধ দমনকারী।

গ. মানুষকে ক্ষমাকারী।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীল (মুহসিন)-দেরকে ভালোবাসেন। (বাকারা :

১৯৫)

ইহসানের সর্বোচ্চ পর্যায় কী?

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে, যদি তুমি তাকে দেখতে নাও পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন।
(মুসলিম)

ইহসান শুধু নামায-কালামেই নয়, সব কাজের মধ্যেই ইহসানের একটা স্তর আছে।

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرِيَّ ذَبِيحَتَهُ
নিশ্চয় আল্লাহ সব কাজেই ইহসানের কথা লিখে দিয়েছেন। তোমরা যখন কতল করবে, সুন্দর করে কতল করবে। যখন জবেহ করবে, উত্তমরূপে জবেহ করবে। ছুরির ডগা ধার দিয়ে নেবে। প্রাণীটাকে কম কষ্ট দিবে। (মুসলিম)



☞ সবর। ধৈর্য ধরতে পারা বহুত বড় একটা গুণ।

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আল্লাহ সবরকারীদেরকে ভালোবাসেন। (আলে ইমরান: ১৪৬)

সবর কিভাবে?

- ক. আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অবিচল থাকা।
- খ. পাপের সুযোগ পেয়েও, নিজেকে সংবরণ করা।
- গ. তাকদীরের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় উভয় ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।



☞ তাওয়াক্কুল। আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন। (আলে ইমরান: ১৫৯)

তাওয়াক্কুল মানে কী?

- ক. আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের প্রতি ভরসা রাখা।
- খ. আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে আস্থা-বিশ্বাস উঠিয়ে নেয়া।



☞ ন্যায় বিচার। আদল-কিসত। সুবিচার করা।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। (মায়দা: ৪২)



☞ সব সময় যিকির করা। কুরআন তিলাওয়াত করা।

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারীগণ, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। (আহযাব: ৩৫)

বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে, আমিও তার প্রতি তেমন আচরণ করি। সে আমাকে স্মরণ করলে, আমি তার সাথেই থাকি। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যে আমাকে জনসভায় স্মরণ করে আমি তাকে আরও ভালোদের সভায় স্মরণ করি। (বুখারী)

আর কুরআন তিলাওয়াতকারীর অবস্থা অনেকটা পর্যটক-ভ্রমণকারীর মতো। পর্যটক দেশ দেখার নেশায় একনাগাড়ে চলতে থাকে। কুরআন তিলাওয়াতকারীও একবার খতম দিয়ে আবার শুরু করে। এভাবে চলতেই থাকে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই সে এটা করে। ফলে আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।



☞ ফরয নামাযের পর নফল পড়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُجِيبَهُ، فَإِذَا أَخْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ

বান্দা নফল ইবাদত দিয়ে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, আমিও তাকে ভালোবাসতে থাকি। এক পর্যায়ে আমিই তার দেখার চোখ, শোনার কান, ধরার হাত, হাঁটার পায়ে পরিণত হই। তখন সে যা চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দিই। (বুখারী)



☞ মাতাপিতার প্রতি সদাচার। সময়মতো নামায পড়া। রোযা রাখা। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা। আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা। সত্য কথা বলা।

-কোন আমলটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়?

-সময়মতো নামায পড়া।

-তারপর...?

-মাতাপিতার প্রতি সদাচার।

-তারপর...?

-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। (বুখারী)
আল্লাহর কাছে প্রিয় রোযা হলো দাউদের রোযা। আল্লাহর কাছে প্রিয় কথা হলো সত্যকথা। (মুসলিম)

■

☞ উত্তম চরিত্র:

তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, সেই আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় (আবু ইয়া'লা)

■

☞ অব্যাহতভাবে নেক কাজ করে যাওয়া:

-কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়?

-নিয়মিত করা হয় এমন আমল। যদিও তা পরিমাণে কম হয়। (মুসলিম)

■

☞ পবিত্রতা।

وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

(নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন) এবং পবিত্রতা

অর্জনকারীদেরকেও ভালোবাসেন। (বাকারা: ২২২)

পবিত্রতা উভয়ভাবেই হতে হবে।

ক. শারীরিক পবিত্রতা।

খ. আত্মিক পবিত্রতা।

■

☞ একে অপরকে ভালোবাসা। একে অপরকে দেখতে যাওয়া। একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করা। হাদীসে কুদসীতে আছে,
আমার ভালোবাসা আবশ্যিক হয়ে পড়ে

ক. যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসবে।

খ. আমার জন্যই যারা একে অপরকে দেখতে যাবে।

গ. যারা কেবল আমার জন্য একে অপরের পিছনে খরচ করবে।

ঘ. আমার জন্যই যারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করে। (মুসনাদে আহমাদ)

এক লোক ঘর থেকে বের হলো, ভিনগাঁয়ে তার এক ভাইকে দেখতে যাওয়ার জন্য। আল্লাহ সে ব্যক্তির পথের ওপর এক ফিরিশতাকে মোতায়ন করে দিলেন। লোকটা কাছে এলে ফিরিশতা জানতে চাইলেন,
-কোথায় চললে!

-ওই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখতে যাচ্ছি!

- কোনো লেনদেনের কারণে যাচ্ছে?
- জি না। শ্রেফ আল্লাহর জন্যই আমি তাকে ভালোবাসি। আর যাচ্ছিও সে ভালোবাসার তাকিদে।
- শোন, আমি আল্লাহর ফিরিশতা! আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন, যেমনটা তুমি ওই ব্যক্তিকে ভালোবেসেছো! (ইবনে হিব্বান)

□

☞ মুসলমানদের প্রতি বিনয়নশ্র আচরণ করা। তাদের উপকার করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নশ্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (মায়েরা: ৫৪)

মানুষের জন্য যে বেশি উপকারী সেই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল হলো,

- ক. অন্য মুসলমানের মনে আনন্দ পৌছানো।
- খ. অপর মুসলমানের বিপদ দূর করা।
- গ. আরেক মুসলমানের ঋণ পরিশোধ করা।
- ঘ. অন্য মুসলমানের ক্ষুধা নিবৃত্ত করা।

একজন মুসলমানের প্রয়োজন পূরো করার জন্য হাঁটা আমার কাছে মসজিদে একমাস এতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।

যে ব্যক্তি রাগ দমন করবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ দমন করল, তার এই আমলের কারণে কিয়ামতের দিন তার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (ইবনু আবিনুনিয়া)

□

☞ আল্লাহর আসমায়ে হুসনা ও সিফাতগুলোকে ভালোবাসা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে অভিযানে পাঠালেন। লোকটা ময়দানে গিয়ে প্রতিটি নামাযের কেরাতই সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত দিয়ে শেষ করেছিল। অভিযান শেষে সবাই ফিরে এসে, নবীজির কাছে ব্যাপারটা তুলে ধরলো,

-তাকে প্রশ্ন করো কেন সে এমনটা করেছে?

-আমি এমনটা করেছি, কারণ আয়াতটা রহমানের বৈশিষ্ট্যবাচক। আমার কাছে আয়াতটা পড়তে ভালো লাগে।

নবীজি বললেন,

-তাকে বলে দাও! আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (তিরমিযী)



☞ মুজাহিদকে। আল্লাহর রাস্তায় যিনি জানমাল কুরবানি করে মেহনতে शामिल হন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَهْمُؤُنِّيَا ۖ مُرْضُوعُونَ

বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশুটোলা প্রাচীর। (সাফ ৪)



☞ যে কাজগুলো করলে, মানুষকে আল্লাহ পছন্দ করেন না সেগুলো পরিহার করা।

১. আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। (বাকারা: ১৯০)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

২. আল্লাহ প্রত্যেক পাপী অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। (বাকারা: ২৭৬)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

৩. আল্লাহ জালেমদেরকে ভালোবাসেন না। (আলে ইমরান: ৫৭)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

৪. আল্লাহ অহংকারী-দাস্তিককে ভালোবাসেন না। (লুকমান: ১৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

৫. আল্লাহ অতি খেয়ানতকারী পাপীকে ভালোবাসেন না। (নিসা: ১০৭)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاتًا أَثِيمًا

৬. আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না। (কাসাস: ৭৭)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

৭. আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে ভালোবাসেন না। (আনফাল: ৫৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَائِزِينَ

৮. আল্লাহ কিবিরকারীকে ভালোবাসেন না। (নাহল: ২৩)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِرِينَ

৯. আল্লাহ কাফেরকে ভালোবাসেন না। (রুম: ৪৫)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

১০. আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। (বাকার ২০৫)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

১১. যারা বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। (কাসাস ৭৬)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

প্রশান্তির স্তর

কুরআন কারীমে তিন প্রকার নফস বা আত্মার কথা বলা হয়েছে।

ক. নাফসে আম্মা-রাহ। মন্দকাজে আদেশদানকারী আত্মা।

খ. নাফসে লাউয়ামাহ। মন্দকাজের পর ভৎসনাকারী আত্মা।

গ. নাফসে মুতামাইন্বাহ। পাপমুক্ত পরিতুষ্ট আত্মা।

□□□

ইতমিনান বা আত্মতৃষ্টি ঈমানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃত মুমিন সব সময়ই এক ধরনের চিন্তাপ্রশান্তি অনুভব করে। এজন্য দেখা যায়, অনেক নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, -ইসলামের মাঝে আমি শান্তি খুঁজে পেয়েছি! আগে কেমন যেন অস্থিরতায় ভুগতাম, মনে শান্তি পেতাম না। কী যেন নেই মনে হতো। এখন মনে হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া বস্তু খুঁজে পেয়েছি!

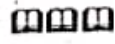
কেউ কেউ বলতে পারে,

-কই আমরা তো কোনো প্রশান্তি অনুভব করছি না!

-এই প্রশান্তির অনুভূতি অনেকটা সয়ে যাওয়া গন্ধের মতো! একটা সুবাস বা কুবাস প্রথম প্রথম নাকে লাগে, কিন্তু থাকতে থাকতে সেটা আর আলাদা করে অনুভূত হয় না। মনে হয় সব স্বাভাবিক, কোথাও কোনো সুবাস বা কুবাস নেই। নতুন এলে বিষয়টা ধরা পড়ে!

ঈমানের প্রশান্তির বিষয়টাও ঠিক তেমনি। আমরা এই প্রশান্তির অনুভূতির সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় আলাদা করে তফাৎ করতে পারি না। যারা নতুন ঈমানে দীক্ষিত হয়, তারা হঠাৎ করে দেখা পাওয়াতে ভালো করে বুঝতে পারে!

এই প্রশান্তিরও কিন্তু মাত্রা আছে। একজন ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়াহীন ঈমানদারের প্রশান্তি আর আমলদার মুত্তাকির ইতমিনান বা প্রশান্তির মাত্রা এক নয়। একটু পরীক্ষা করলেই বিষয়টা ধরা পড়বে! যারা নিয়মিত নামায পড়তে অভ্যস্ত নয়, তারা হঠাৎ একদিন ভালো করে ওজু করে নামায পড়লে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে। এটাই 'ঈমানী প্রশান্তি'।



এবার তুম্বানীনাহ বা প্রশান্তির স্তরগুলো জানা যাক।

(এক) তাওহীদি প্রশান্তি। আল্লাহ এক। তার কোনো শরীক নেই। এই বিশ্বাসের মধ্যে যে নিশ্চিন্তি আছে, তিন খোদা বা ৩৬০ খোদার বিশ্বাসের মধ্যে কি তা আছে? মোটেও নেই! একাধিক উপাস্য মানার মধ্যে খালি অস্থিরতা আর অস্থিরতা! চিন্তবৈকল্য! তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসকে যাবতীয় দ্বিধা-সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে ধারণ করাই হলো যাবতীয় প্রশান্তির মূল!



(দুই) যিকির প্রশান্তি। কুরআন কারীমে যিকিরকে প্রশান্তি লাভের প্রধান মাধ্যম বলা হয়েছে। যিকির করা মানে সবকিছু বাদ দিয়ে একজনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। শুধু মুখে মুখে সুবহানাল্লাহ বললেই যিকির হয়ে যায় না। প্রশান্তি লাভের জন্য যিকির করতে চাইলে, মুখের সাথে সাথে মনটাকেও হাজির রাখতে হবে। হ্যাঁ, অন্যমনস্ক থাকাবস্থায় শুধু মুখে মুখে যিকির করলেও সওয়াব হবে, তবে প্রশান্তি লাভ হবে না! প্রশান্তির জন্য চাই হাজির-নাজির মন! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন,

سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله

كثيرا والذاكرات

-মুফাররিদরা অগ্রগামী হয়ে গেছে!

-মুফাররিদ কারা?

-যারা আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করে। (মুসলিম)



(তিন) ইয়াকীনি প্রশান্তি। কুরআন কারীমে তিন প্রকারের ইয়াকীনের কথা আছে।

ক. ইলমুল ইয়াকীন (তাকাসুর)। নিশ্চিত জ্ঞান।

খ. আইনুল ইয়াকীন (তাকাসুর)। চাক্ষুষ জ্ঞান।

গ. হাকুল ইয়াকীন (ওয়াকি'আ)। যথার্থ সুনিশ্চিত বিষয়।

এখানে তিনটা স্তর ।

১ প্রথম স্তর: একজন আমাকে বললো, তার কাছে খাঁটি মধু আছে । কথাটা আমি বিশ্বাস করলাম । ইলমুল ইয়াকীন ।

২ দ্বিতীয় স্তর: তারপর আমাকে মধুটা দেখানো হলো । এখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয় । আইনুল ইয়াকীন ।

৩ তৃতীয় স্তর: আমাকে খানিকটা মধু চাখতে দেয়া হলো । আমি চেখেও দেখলাম । হাক্কুল ইয়াকীন ।

□

কুরআন কারীমে জান্নাত-জাহান্নামের কথা আলোচিত হয়েছে । জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন ইলমুল ইয়াকীনের স্তরে আছে ।

□

وَأَرْسَلْنَا الْجِنَّةَ لِلْمُؤْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

আর মুত্তাকীদের জন্যে জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে, কোনও দূরত্বই থাকবে না । (কাফ ৩১)

وَبُورِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

সেদিন ভ্রষ্টদের সামনে জাহান্নাম দৃশ্যমান হবে । (শু'আরা ৯১)

এটা আইনুল ইয়াকীন ।

□

মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । ভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন ।

এটা হাক্কুল ইয়াকীন ।

□

ইয়াকীন কাকে বলে?

আরবী ভাষায় ইয়াকীন শব্দটা ব্যবহৃত হয়, পানি এমনভাবে স্থির হয়ে যাওয়া, যাতে তলদেশে যা আছে সেটা দেখা যায় । ইয়াকীন মানে, সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস । কোনো বিষয়য়ে এমনভাবে জানা, যাতে মনটা প্রশান্ত হয়ে যায় । সত্যতা ও অকাট্যতার ব্যাপারে কোনরকম দ্বিধা না থাকা । শয়তানের কুমন্ত্রণাতেও বিশ্বাস না টলে যাওয়া ।

বিশ্বাসের এই স্তরে পৌঁছার পর, কোনো পিছুটান থাকে না । সামনে বাড়তে গিয়ে মনে দোলাচল দেখা দেয়না । আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগে বাড়া যায় । আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া যায় ।

(চার) আল্লাহর আনুগত্যের প্রশান্তি। জীবনের পদে পদে আমাদের সামনে দু'টি পথ এসে ধরা দেয়। ভালো ও মন্দ। ভালো কাজ করলে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। মন্দ কাজ করলে শয়তানের আনুগত্য করা হয়। আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, জীবনের অনেক অশান্তি নিমিষেই দূর হয়ে যায়। জীবন ও অর্থের অপচয় থেকে বাঁচা যায়। অপ্রয়োজনীয় বহু কাজ থেকে দূরে থাকা যায়। অহেতুক হিশেব-নিকেশ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৩৩৩

(পাঁচ) তাওবার প্রশান্তি। শরীরে ময়লা লাগলে কেমন গা ঘিনঘিন করে না? ভাবলেই কেমন রি রি করে ওঠে! ধুয়ে ফেলার পর আহ শান্তি! মুক্তি! তাওবার ব্যাপারটাও ঠিক এমনি। গুনাহ করা মানে, আত্মার ওপর 'ময়লা' লাগিয়ে দেয়া। দুর্গন্ধ মেখে দেয়া। গুনাহের জন্য তাওবা সাবানের মত কাজ করে। গুনাহকে ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে দেয়। শরীরকে আবিলতামুক্ত করার পর যেই শান্তি শান্তি ভাব মনে জেগে ওঠে, তাওবার পরও এমনি একটা তৃপ্তিবোধ ছেয়ে যায়।

৩৩৩

(ছয়) সুসংবাদের প্রশান্তি। কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অনেক আমল সম্পর্কে বলা আছে, এটা করলে গুনাহ মাফ হবে। ওটা করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এই কাজটা করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বান্দা এসব আমল করে যখন সুসংবাদগুলো জানতে পারে, তার মনে বেশ হর্ষ জাগে। নিজেকে বেশ সুখী সুখী মনে হয়। পরকালে মুক্তির এক ধরনের আবছা অনুভূতি জাগে! এই প্রশান্তির কোনো তুলনা হতে পারে না।

৩৩৩

(সাত) মৃত্যুকালীন প্রশান্তি। যারা নেককার, মৃত্যুকালে মালাকুল মওত তার আত্মাকে বলবেন,

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ফিরে চলো! তার সন্তুষ্টির দিকে ফিরে চলো! (ফজর: ২৭-২৮)

তখন যে শান্তিটুকু মনে নিয়ে মানুষটা দু'চোখ বুজবে, তার তুলনা আর কিছু হতে পারে? তার সামনে যে অপেক্ষা করছে এক অন্তহীন সুখ! সীমাহীন অনাবিল এক আনন্দ!

প্রশান্তি আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া বড় একটা নেয়ামত। ঈমান আনার সাথে সাথেই আল্লাহ এটা দিয়ে দেন। জান্নাতী সুখেরই একটা দুনিয়াবী সংস্করণ বলা যেতে পারে এই 'ইতমিনান' বা প্রশান্তিকে।

কুরআন আমায় শিক্ষা দিল

কুরআন কারীম জীবন্ত কিতাব। আল্লাহর কালাম। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যই আমাদের জন্য শিক্ষা। আমি শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না, সেটা হলো বিষয়। কুরআন কারীম আমার জন্য হেদায়াতের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। আমরা সাজিতে করে হেদায়াতের কিছু ফুল কুড়িয়ে নিতে পারি কি না দেখা যাক।

৩৩৩

(এক) আমি মানুষ। আমার চিন্তা ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি যার বান্দা তার ক্ষমতা অসীম। কল্পনাতে। আমার দায়িত্ব যখন তিনি নিজ হাতে তুলে নেবেন, পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে আমার অধীনে নিয়োজিত করে দিবেন। আমার কাছে যা অসম্ভব মনে হয় সেটাকেই তিনি অনায়াসলব্ধ করে দিবেন। নাগালের চৌহদ্দিতে এনে দিবেন।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْصُصًا جِبَالٍ أَوْ يَمِينٍ مَّعَهُ وَالظُّلُمِ وَالْكَافِرِينَ

নিশ্চয়ই আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছিলাম। হে পাহাড়-পর্বত, তোমরাও দাউদের সাথে আমার তাসবীহ পড় এবং হে পাখিরা তোমরাও! আর তার জন্য আমি লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। (সাবা: ১০)

ঈ রাক্বের কারীম চাইলে কী না হয়! তিনি চাইলে বনের পাখ-পাখালি পর্যন্ত অনুগত হয়ে যায়। মৌনি পাহাড় পর্যন্ত কল্যাণী হয়ে যায়। জড়পদার্থ শক্ত লোহাও নরম হয়ে যায়।

৩

(দুই) বান্দার কাজ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাওয়া। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে।

فَلْيُحْيِيهِ حَيًّا طَيِّبًا

আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাবো। (নাহল: ৯৭)

৫ আয়াতটা আমায় শিক্ষা দিয়েছে, আমি ভালো কাজ করলে, আল্লাহ আমাকে সুখ-শান্তি দান করবেন। আমার জীবনটাকে নিরাপদ করে দিবেন। আমাকে তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে রাখবেন। আন্তরিক পরিচর্যায় লালন-পালন করবেন। যাবতীয় তিক্ততাকে মিষ্টতায় পরিণত করে দিবেন।

■

(তিন) আমি আল্লাহর কাছে অনেক কিছুই চাই। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। মনেপ্রাণে দু'আ করি। মরিয়া হয়েই দু'হাত তুলি। হেঁচকি তুলে কেঁদে কেঁদে তার কাছে আর্জি জানাই! কিন্তু সাথে সাথে ফল পাই না!

وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلَا تَعْلَمُونَ

আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (নূর: ১৯)

৫ আয়াতটা আমায় শিক্ষা দিয়েছে, আন্তরিক চাওয়াগুলো আমার নিজের ইচ্ছামতো পূরণ হবে না। কেন হবে না, সেটা আমার জানার দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা জানেন। তিনি বিশেষ কোনো হেকমতের কারণে চাওয়া পূরণ করতে বিলম্ব করছেন। আমার কাজ হলো, তার ওপর তাওয়াক্কুল করে নির্ভর হয়ে থাকা। নিশ্চিত হয়ে যাওয়া। নিরাশ না হওয়া। কারণ, সবকিছু আল্লাহরই হাতে। তার নির্দেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়বে না।

■

(চার) কম আর বেশ আমরা প্রায় সবাই ভালো কাজ করি। নেক আমল করি। আমলে সালেহ করি। গরীব-দুঃখী ভাইদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। প্রতিটি পরোপকারের সময় আমি মনে রাখব,

إِنِّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নয়। (হুদ: ২৯)

৫ আমি শিখতে পেরেছি, আমার ভালো কাজের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিবেন। মানুষের কাছে বদলা পাওয়ার আশা করে বসে থাকা ঠিক নয়। শোভনও নয়। কেবল আল্লাহর সাথেই আমি নিজেকে জুড়ে রাখব। সব সময় আয়াতটা মাথায় রাখব।

■

(পাঁচ) মাঝেমধ্যে ভীষণ কাতর হয়ে পড়ি। হতোদ্যম হয়ে পড়ি। নিজেকে সর্বহারা ভাবি। কিন্তু কেন...?

وَمَا تَسْأَلُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يُعْطِيهَا

(কোনো গাছের) এমন কোনো পাতা বারে না, যে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন। (আনআম: ৫৯)

এ আমার গোপন অশ্রুর কথা তিনি জানেন। আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা তিনি জানেন। তবে আমার এত ভাবনা কিসের?

■

(হয়) আশপাশের মানুষজন বৈরী ভাবাপন্ন? শত্রুতাপরায়ণ? আমি এগিয়ে গেলেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়?

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ

তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (তাওবা: ১২৯)

এ পুরো বিশ্ব আমার বিরুদ্ধে চলে গেলেও পরোয়া কিসের? সারা বিশ্বের সমস্ত শক্তি একজোট হয়ে আমাকে হামলা করলেও পরোয়া কিসের? আল্লাহ আছেন না? আমার সবকিছু তারা ছিনিয়ে নিলেও, আমার পায়ের তলার মাটিও যদি তারা কেড়ে নেয়, কুছ পরোয়া নেহি! আল্লাহ তা'আলা এক মুহূর্তেই সব ফিরিয়ে দিতে পারেন!

■

(সাত) আমার দেহে এখন প্রাণ আছে। শরীরে তাকত আছে। চাইলে কাজকর্ম করতে পারি। মানুষ মৃত্যুর পর কী নিয়ে আক্ষেপ করবে, তা আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ مَاتَ الْحَيَاتِي

হায়, যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম! (ফজর: ২৪)

এ পরে কী হতে পারে, তা আগেই জেনে গেলাম। সতর্ক হওয়ার সময় ও সুযোগ পেয়ে গেলাম। সংশোধন হয়ে যাওয়া খুবই জরুরী।

■

(আট) তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমার সবকিছুর মালিক। আমার উচিত সব সময় তার কথা ভাবা। তার যিকির করা। তার চিন্তায় বিভোর থাকা।

وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

কখনো ভুলে গেলে নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর। (কাহফ: ২৪)

২৫ আমি তার। তিনি আমার। তার স্মরণের মাঝেই আমার ইহজীবনের সার্থকতা। সময় পেলেই বলব,

-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله)।

-সুবহা-নাল্লাহিল আযীম (سبحان الله العظيم)।

-সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি (سبحان الله وبحمده)।

-আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুব্ব ইলাইহি (أستغفر الله وأتوب إليه)।

-আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ (اللهم

صل على محمد وعلى آل محمد)।



(নয়) মানুষ তো! দুর্বলতা থাকবেই। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। ভেঙে পড়বে কেন?

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে। (মারইয়াম: ৪)

২৬ আমার যাবতীয় কষ্টের কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরব। তার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বলব। নিঃসংকোচে। অকপটে। কোনো লজ্জা করব না। আমার যত ধরনের দুর্বলতা আছে, সবই তার কাছে বলব। শারীরিক-মানসিক সব। তারপর নিশ্চিন্তে আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাতে থাকব! যাকারিয়া আ. বুড়ো হলেও হতোদ্যম হয়েছিলেন? না, হননি।



(দশ) কাজটা করলাম মানুষের ভালোর জন্য। কিন্তু যার জন্য রক্ত দিলাম সেই বলে 'খারাপ'। যাদের জন্য সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম, তারাই গালমন্দ করছে!

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ

তোমরা যা-কিছু সৎকর্ম করবে আল্লাহ তা জানেন। (বাকারা: ১৯৭)

২৭ আমি ভালো কিছু করলে, আল্লাহর তা জানা আছে। লোকজনের কটুকাটবো আমার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। আমি আমার কাজ করে যাব।



(এগার) কী হাহতাশ! কী হাহাকার! কত চিৎকার! আহা কী হবে! হায় কীভাবে দিন গুজরান হবে?

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

কোনো প্রাণী জানে না সে আগামীকাল কী অর্জন করবে। (লুকমান: ৩৪)

কত জনে কত কথা বলে! এসব পড়লে ভবিষ্যত অন্ধকার! মানুষের কাছে হাত পাততে হবে! দ্বীনের পথে চললে গরীব থাকতে হবে! আরে বাপু, তোমার ভবিষ্যৎ কি খুবই আলো ঝলমলে? তোমার নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবো আগে! রিয়িকের মালিক আল্লাহ! রিয়িকের দায়িত্ব তার! তিনিই এসব নিয়ে ভাববেন! তুমি কেন আগ বাড়িয়ে খোদকারী করতে যাচ্ছে! আমার ভবিষ্যত নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত! মুতমাইন। সুখী। আল্লাহ আমার রব, তিনিই আমার সব।

□

(বারো) বিপদ যখন আসে, মনে হয় যেন চারদিক হুড়মুড় ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। আর বাঁচার উপায় নেই। নিস্তার নেই এই ধরা থেকে। এটা আমার মনের দুর্বলতা। চিন্তার অপরিপক্বতা। অদূরদর্শিতা! বিপদ যার পক্ষ থেকে আসে, তিনিই তো বিপদ আবার দূর করবেন!

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল। (তাওবা: ১১৭)

তাবুক যুদ্ধের সময়টা ছিল খুবই কঠিন! প্রচণ্ড গরম! আবার ফল পাকার মওসুম! কিন্তু দুঃসময় কেটে যেতে কি বিলম্ব হয়েছিল? সুদিন ফিরে আসতে দেরি হয়নি। তবে আমি কেন বিপদে হাল ছেড়ে বসে থাকব! সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে পড়ব? ধর-পাকড় চলছে, জেল-জুলুম চলছে, ব্যস পিছিয়ে যাবো? উঁহ, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে!

□

(তেরো) চারদিকে ঘোর অমানিশা। ঘুটঘুটে অন্ধকার! দূরে কোথাও মিটমিটে বা টিমটিমে আলোও দেখা যাচ্ছে না! শুধু হতাশা আর হতাশা! আমি বুঝি নিরাশ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো?

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল। (আম্বিয়া: ৮৭)

বসে থাকব কেন? শত নিশ্চিন্দ্র আঁধার হলেও সেখানে আমার জ্বলজ্বলে বাতি আছে। রাত গভীর হলেও প্রভাতের আশ্বাস আছে। মাছের পেটে গেলেও বাঁচার পথ ঠিকই আছে। শুধু দু'টি হরফ '(কাফ ও নূন = কুন)' প্রয়োজন। রবের কারীমের পক্ষ থেকে এ-শব্দটা উচ্চারণ আলোতে যেমন হতে পারে, আঁধারেও হতে পারে! ইউনুস আ.-কে তিনি বাঁচিয়ে আনেন নি? তো?



(চৌদ্দ) কেউ দেখছে না বুঝি? কামরার দরজা বন্ধ? আশেপাশে কেউ নেই? কেউ জানবে না?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

তবে সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? (আলাক: ১৪)

❧ চিন্তাটা শিশুসুলভ হয়ে গেল না! একেবারে কেউ দেখবে না এ কী করে সম্ভব! কেউ না দেখলেও একজন তো ঠিকই দেখবেন। সবকিছু গোচরে রাখবেন। আমি মানুষকে বেশি ভয় পাচ্ছি? ভয় তো পেতে হবে আল্লাহকে! তার অগোচরে আমি থাকি কী করে? গুনাহ করার চিন্তাই-বা করি কী করে?



(পনের) বিপদ এসেছে? মনে করছি এটা শাস্তি? গযব? দুঃখ পেয়েছি? এজন্য মন খারাপ?

فَأَنبَأَكُمْ عِمَّا يُبْغِي

ফলে আল্লাহ (রাসূলকে) বেদনা (দেওয়া)-এর বদলে তোমাদেরকে পরাজয়ের বেদনা দিলেন। (আলে ইমরান: ১৫৩)

❧ মন খারাপ করার কিছু নেই। দুঃখ-শোকও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আমি যেটাকে বিপদ ভাবছি, সেটা প্রকারান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'পুরস্কার'ও হতে পারে। ছোট বিপদ দিয়ে ভবিষ্যতের বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। এমনও হতে পারে!

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন, (أَرْسِلْ) তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি। অথচ আলোচনার দাবী ছিল (أَصَابَ) বলা। অর্থ আক্রান্ত করা। আপত্তিত করা। তার মানে, সাহাবায়ে কেরামের ওপর নেমে আসা সেই দুশ্চিন্তাটা ছিল প্রতিদান। বিপদ নয়।



(ষোল) কতজনের কাছে যাই! কতভাবে হাত পাতি! নতজানু হই। সান্ত্বনা খুঁজি! প্রেরণা ভিক্ষা করি!

وَكُنْ بِاللهِ وَكِيلًا

সাহায্যকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (নিসা: ৮১)

❧ আল্লাহ তা'আলা থাকতে অন্য দিকে চাইতে হবে কেন! অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার ভাবনাই-বা আসে কী করে?

রাব্বের কারীম আমাদের কুরআন কারীমকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। কলবের নূর বানিয়ে দিন। হিম্মতোদ্দীপক বানিয়ে দিন। শোকের উপশম বানিয়ে দিন। সর্বোপরি এই আয়াতের পরিপূর্ণ ক্ষেত্র বানিয়ে দিন।

وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِمُسْفِرَةٍ * صَاحِبَةٌ مُّسَبِّحَةٌ

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। সহাস্য প্রফুল্ল। (আবাসা: ৩৮-৩৯)

কারবালার শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন কর্মকৌশল ও কুশলে জগত পরিচালনা করেন। বান্দার পক্ষে আল্লাহর সেসব নিপুণ কৌশল বোঝা সম্ভব নয়। তবে কিছু কৌশল তিনি কুরআন কারীমে বলে গেছেন। দফা (دُفَا) আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক কর্মকৌশল। এই কৌশলের আওতায় অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। অনেক সময় দেখা যায়, হক ও বাতিলের যুদ্ধে বাতিল জয়ী হয়ে গেছে! একটু খতিয়ে দেখা যাক!

□□□

হুসাইন রা. কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছেন। খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে, ইয়াজিদ তার ধারেকাছেও ছিল না। হুসাইনকে যারা শহীদ করেছে, তারা সবাই মালউন। অভিশপ্ত। হুসাইন রা. সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন।

কারবালার ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা দফা নীতি পরিলক্ষিত। হুসাইন রা. কুফাবাসীদের বিশ্বাস করেছিলেন। ইবনে আব্বাস রা. তাকে কুফা যেতে বারবার নিষেধ করেছিলেন। বড় বড় অনেক সাহাবীও নিষেধ করেছিলেন। তারা কুফাবাসীর নমনীয় স্বভাবের কথা ভালোভাবে জানতেন। নির্মোহভাবে দেখলে বলা যায়, হুসাইন রা.-এর ইয়াজিদ বিরোধী চিন্তা সঠিক হলেও বড় সাহাবীদের পরামর্শ ডিসিয়ে কুফা রওয়ানা দেয়া ছিল 'এক সওয়াবী ইজতিহাদ'। হুসাইন রা. হকের ওপর ছিলেন। কারবালার ময়দানের অসম যুদ্ধে অবিশ্বাস্য নির্মমতার শিকার হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সেদিন তার বিশেষ হেকমতের কারণে হুসাইন রা.-কে জয়ী করেননি।

□

আচ্ছা, কারবালার ময়দানে যদি সেদিন হুসাইন রা. জয়ী হতেন, তাহলে কী হতো?

ক. কুফাবাসীর দৌরাত্যা চরম আকার ধারণ করত ।

খ. কুফা ও অন্যান্য শহরে ঘাপটি মেরে থাকা শিয়ারা চরমভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত ।

গ. উসমান রা.-এর হত্যাকারীরা হুসাইন রা.-এর ঘাড়ে সওয়ার হত ।

ঘ. আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীরা আত্মগোপন থেকে বের হয়ে আসত ।

ঙ. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি খলীফা হওয়ার কারণে, তারপরে অন্য বংশের কেউ খলীফা হওয়ার অবকাশ কমে যেত । নবীজির রক্তের সম্পর্কের মধ্যেই খিলাফত ঘুরপাক খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল । দেখা যেত শাসনক্ষমতার যোগ্যতা না থাকলেও খলীফা হয়ে গেছেন । অন্য বংশের অযোগ্য কেউ খলীফা হলে ইসলামের ক্ষতি হওয়ার আশংকা কম । কিন্তু একজন সাইয়েদ যোগ্যতা ছাড়া খলীফা হয়ে গেলে সেটা বিপদজনক বিষয় হয়ে যায় । হুসাইন রা. যোগ্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীগণ যোগ্য হবেন এমন নিশ্চয়তা ছিল না ।



তাহলে কি হুসাইন রা. সেদিন কারবালায় জয়ী হলে, খারাপ হত?

উঁহ, সেটা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । খারাপ হতে যাবে কেন । অবশ্যই ভালো হত । কিন্তু সেই ভালোর পথ ধরে পরবর্তীতে অনেক খারাপ আসার সম্ভাবনা ছিল । আর তিনি সেদিন জয়ী হলে, সে ঘটনা আমাদের আজকের দফা'-এর আলোচ্য বিষয় হতো না । তিনি 'হকপন্থী' হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কেন তাকে জয়ী করেননি তার একটা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ।



আরেকটু আগে যেতে পারি । জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধের দিকে তাকালেও একই বিষয় ধরা পড়ে । জামালের যুদ্ধে যদি আম্মাজান আয়েশা রা.-এর পক্ষ জয়ী হত, তাহলে কী বিশৃঙ্খল অবস্থা দাঁড়াত? আলী রা. সদ্য খলীফা হয়েছেন । চারদিকে উসমান রা.-এর হত্যাকারীরা মাথা উঁচু করে দাবড়ে বেড়াচ্ছে । তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো শক্তি নেই! সে এক চরম বিভীষিকাময় অবস্থা! এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা উপযুক্ত দলকেই জয়ী করেছেন । কিন্তু সিফফীনে ঘটনা আবার উল্টে গেছে! সিফফীনে কোনো পক্ষই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেননি । কেন? আলী রা. এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার উপযুক্ত পক্ষ ছিলেন! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরংকুশ বিজয় দান করলেন না! কেন? সঠিক কারণ একমাত্র রাক্বে কারীমই বলতে পারবেন । আমরা শুধু অনুমাণ করতে পারি,

ক. তিনি সেদিন জয়ী হলে, আজ সারা বিশ্বে শিয়াদের জয়জয়কার থাকত। তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নিত! আলী রা.-তাদের কোনো অন্যায়ের প্রশয় দিতেন না এটা যেমন সত্য। কিন্তু চিন্তা ও কর্মে শিয়ারা অনেক পোক্ত অবস্থানে চলে যেত, এটাও সত্য।

খ. আলী রা.-এর ইস্তিকালের পর নতুন খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দেখা যেত শিয়ারা হস্তক্ষেপ করছে। আরো নানা সমস্যা দেখা দিত।

গ. উমাইয়া যুগে, আব্বাসী যুগেও আহলে বাইতের কেউ কেউ খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। আল্লাহ তা'আলা আহলে বাইতকে খিলাফত বা রাষ্ট্রক্ষমতা দেননি। মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে বসাননি। আলী রা. ও হাসান রা.-এর পরে ইসলামের ইতিহাসে আরও কিছু 'সাইয়েদ' শাসক এসেছেন। কিন্তু তারা কখনোই কেন্দ্রীয় খিলাফতের দায়িত্বে আসতে পারেননি। এটা বোধহয় আল্লাহর তা'আলার দফা'নীতিরই একটা অংশ।



এখানে একটা প্রশ্ন আমার দিকে ধেয়ে আসতে পারে, উমাইয়া ও আব্বাসীদের বিরুদ্ধে আহলে বাইতগণ জয়ী হতে পারেন নি! তার মানে কি আহলে বাইতের তুলনায় তারা বেশি হকপন্থী ছিল?

-গুরুত্বই বলেছি, আমাদের আলোচ্য বিষয় 'দফা'নীতি'। এই নীতিতে জয়-পরাজয়টা হক ও বাতিল হওয়ার মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার আলোকে নির্ধারিত হয়। সেজন্য অনেক সময় দেখা যায়, হকপন্থী দল পরাজিত হয়েছে। বাতিল সাময়িকভাবে জয়ী হয়েছে!

আরেকটা ব্যাপারে খটকা থেকে যেতে পারে,

-আল্লাহ তা'আলা তো হকের পতাকাকে বিজয় দান করার আশ্বাস দিয়েছেন, তারপরও হকপন্থীদের পরাজয় হয় কেন?

-জি, তা দিয়েছেন! এর উত্তরে কয়েকটা কথা বলা যায়,

(১) একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। হক ও হকপন্থী দু'টি পৃথক বিষয়। হক চিরকাল টিকে থাকবে! কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো হকদল চিরকাল টিকে থাকবে না! হক সব সময় দল বদল করে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবয়ীদের কাছে হক এসেছে। তাবয়ীদের থেকে তাবু-তাবয়ীদের কাছে! কিন্তু হক বা সিরাতে মুস্তাকীম সেই একটাই রয়ে গেছে।

(২) কোনো হকপন্থী দলের পরাজয় মানে হকের পরাজয়, ব্যাপারটা এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় হকপন্থী দলকে পরাজিত করেও হক টিকিয়ে রাখেন। হকপন্থী দলকে পরাজিত করে, হককে বিজয় দান করেন! কথাটা কি

স্ববিরোধী মনে হচ্ছে? আরেকটু খুলে বললে, আশা করি পরিষ্কার হয়ে যাবে।
ইনশাআল্লাহ!



হকপন্থী দলের পরাজয়: হুসাইন রা.-কে কারবালায় পরাজয় দান করেছেন।
হকের জয়: কিন্তু তার আদর্শকে চিরকালের জন্য টিকিয়ে রেখেছেন। জালিমের
বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। হকের জন্য শাহাদাত বরণ করতেও
পিছপা না হওয়া। শিয়াদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারা! কুফার বিশ্বাস
মানুষগুলো নেতৃত্বের আসনে বসতে না পারা!

যুদ্ধজয় দিয়ে হক ও বাতিলের মানদণ্ড নির্ধারিত হয় না। হকের বিজয়টা
যুদ্ধজয়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়! যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হক বিজয়ী হতে পারে! এর
হাজারো উদাহরণ টানা যেতে পারে। কারবালা তো আছেই! বর্তমানেও ইরাক-
সিরিয়া-আফগানিস্তানে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে! হকপন্থীরা একের পর এক
শহর হারাচ্ছে! একের এক যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে! কাশ্মীর-জিনজিয়াঙ-ইরাক-
সিরিয়া-শীশানে! এসব যুদ্ধক্ষেত্রের বিপর্যয় হকের পরাজয় নয়! প্রকারান্তরে
হকের বিজয়।

-কিভাবে?

-উত্তরটা দিতে হলে, জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আরেকটি
কৌশল সামনে আনতে হবে! তামহীস (تَمْهِيس)। পরিশুদ্ধকরণ। এটা নিয়ে না
হয় পরবর্তী কোনও এক খণ্ডে কথা বলা যাবে। ইনশাআল্লাহ।



আসল কথাই বলা হয়নি! আল্লাহ তা'আলা কেন এই দফানীতি গ্রহণ করেন?
উত্তরটা আল্লাহ তা'আলার কাছেই শুনি!

১. বিপর্যয়রোধ।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না
করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। (বাকারা: ২৫১)

২. সুরক্ষা।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَابُغٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দল (-এর অনিষ্ট) অন্য দলের মাধ্যমে
প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেয়া হত খানকাহ, গির্জা,
ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ। (হজ্জ: ৪০)

তাহলে কারবালা কী?
কারবালা হকপন্থীর পরাজয়।
কারবালা হকের বিজয়।

সবরমতি

মিসরের রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছেন। জীবনে অভাব-অনটন চোখে দেখেননি।
বিয়ে হয়েছে একজন নবীর সাথে। স্বামীর সাথে চলে এলেন নির্জন ক্ষেত-
খামারহীন উপত্যকায় (بَوَادِي غَزِي زُرْعَة)। পানি নেই। খাবারের ব্যবস্থা নেই।
এমন বিজন মরুতে একাকী রেখে স্বামী ফিরতি পথ ধরলেন। রাজকন্যা অবাক!
এভাবে কেউ কাউকে রেখে চলে যায়? স্ত্রীর কোলে দুধের শিশুকে রেখে?
কিছু মানুষটা কারণ ছাড়া কোনো কাজ করতে পারেন না। তাঁর সব কাজই
আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হয়। এটাও কি তাই? দ্রুত গিয়ে প্রশ্ন করলেন,
-এটা কি আল্লাহর হুকুম?

-জি।

-ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান! তিনিই আমাদেরকে দেখবেন!

III

সবর করলেন। আল্লাহর বিধান মেনে নিলেন। তাওয়াক্কুল করলেন। গাঁইগুই
করে স্বামীর গলগ্রহ হলেন না। কী খাবেন, কী পান করবেন, সেটা নিয়ে
বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেন না! স্বামীর অনেক কাজ! তাকে উম্মতের ফিকির করতে
দিতে হবে। তাকে আঁচলে বেঁধে রাখা অন্যায!

কী অবিচল আস্থা! কী দুর্মর আত্মবিশ্বাস! কী অমিত তেজ! কী দুর্দম সাহস!
কেন আল্লাহ আছেন না! তার হুকুমেই যখন সবকিছু হচ্ছে, আমি বান্দার ভয়
কিসের? কেন কুঁইকুঁই করে মরব?

III

স্বামী স্বপ্নে দেখেছেন, ছেলেকে জবেহ করছেন! আশ্চর্য তো! এমন স্বপ্নও কোনো
পিতা দেখে? দেখলেও কেউ সেটা বাস্তবায়ন করে? আল্লাহর আদেশ হয়েছে যে!
-ও, তাই? তাহলে আমি বাধা দেয়ার কে? আমার সবকিছুই তো তার! নবীগণের
স্বপ্নও ওহী।

-ঠিক আছে জনাব, নিয়ে যান! কই গো বাবা ইসমাইল, এসো সাজিয়ে দিই!
বাবার সাথে বের হবে!



এমন অনুগত পত্নিত্বতা সবারমতি মা যার, তিনি কেমন হতে পারেন?

-বাবা রে, স্বপ্নে দেখলাম তোকে জবেহ করছি! তুই কি বলিস?

-আব্বু, এটা কি আল্লাহর আদেশ?

-জি!

-তাহলে আর কথা কি! (افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে সেটাই করুন!

-তোর কষ্ট হবে না?

سَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

ইনশা আল্লাহ, আপনি আমাকে সবারকারীদের একজন পাবেন।

(সাফফাত ১০২)



বাবা-মা আর সন্তান যে সবার আর ইয়াকীনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার ফলাফল কী বের হলো?

-ইমামত (الإمامة)! নেতৃত্ব!

আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তো দিবেনই, দুনিয়াতেও এই পরিবারকে অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত।

-কেন এই পুরস্কার?

-দুটি কারণে,

ক. যেহেতু তারা সবার করত (عَصِيَّةً)।

খ. তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত (وَأُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ الْكِتَابِ)। (সাজদা: ২৪)



বড়লোকের মেয়ে হলেই আদরের দুলালী মোমের পুতুল হয়ে যায় না। গরীবের মেয়ে হলেই কেউ পরিশ্রমী হয়ে যায় না। এটা নির্ভর করে পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষা আর মানসিকতার ওপর। মায়ের সবার, তাওয়াক্কুল আর ইয়াকীন সন্তানকে অনেক অনেক আগে বাড়িয়ে দেয়! ছোট থেকেই অনেক বড় করে দেয়।

সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি? আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে কুরআন কারীমে চার-চারবার বলেছেন,

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

(মায়িদা: ১১৯, তাওবা: ১০০, মুজাদালা: ২২, বায়্যিনা: ৮।)



কথাটাতে দু'টি অংশ। প্রথম অংশ:

১. আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সন্তুষ্ট। আবু বকরের প্রতি। উমরের প্রতি। উসমানের। আলীর প্রতি। মুয়াবিয়ার প্রতি। আমর ইবনুল আসের প্রতি। সমস্ত সাহাবীর প্রতি। তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহও তাদের প্রতি খুশি প্রকাশ করেছেন। প্রথম অংশটা সহজে বোঝা যায়। আমরা জানি, কী করলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যাবেন। আমরা সব সময় চেষ্টা করি, তিনি যেন আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যান।



দ্বিতীয় অংশ:

২. আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (وَرَضُوا عَنْهُ)।

তারাও সন্তুষ্ট! কিভাবে? আমিও কি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট? আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও আদতে প্রশ্নটা কঠিন।

আচ্ছা, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এর অর্থ কী?

(ক) তিনি আমাকে ভালো-মন্দ যাই দেন, আমি তা নিয়েই তুষ্ট।

(খ) আমার ওপর কোনো বিপদ এলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই আমার রব আমার ভালোর জন্যই বিপদটা পাঠিয়েছেন।

(গ) যাই ঘটুক, আমি বান্দার কাছে কোনো অভিযোগ করি না। আমার সব দেন-দরবার আল্লাহর কাছে।

(ঘ) তিনি আমাকে উপচে দিলে, কিংবা মোটেও না দিলে, ধনী করলে, অথবা গরীব করলে, সুস্থ রাখলে বা অসুস্থ করলে আমি তার প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা হারাই না। তার প্রতিই আমার তনু-মন-ধন সমর্পিত থাকে।



আমি আমার নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে পারি,
-আমি কি আমার আকার-আকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট? স্ত্রীকে নিয়ে তুষ্ট? ছেলে-সন্তান
নিয়ে সন্তুষ্ট? আমার অর্থবিশ্ব নিয়ে পরিতৃপ্ত? এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা নিজেই
আমার জন্য বাছাই করেছেন। আমি কি তার বাছাইয়ে সন্তুষ্ট?

III

পাশাপাশি এই আয়াতটা বোঝার সময় কয়েকটা বিষয়ও মাথায় রাখা জরুরী।
এক. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মানে এই নয়, আমি ব্যথা পেয়েও উহ-আহ
করব না। কষ্ট পেয়েও কাঁদব না। আমি মানুষ। এই দুনিয়া পরীক্ষাকেন্দ্র।
এখানে পরীক্ষা ছাড়া একজনও পার পায়নি। আল্লাহর নবীগণও না। সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও পুত্রবিরোগে কেঁদেছেন।

দুই. দু'টি ব্যাপার আছে।

ক. সবর। ধৈর্য্য।

খ. রেযা। সন্তুষ্টি।

রেযার স্তর সবরের ওপরে। বিপদ এলো, সবর করলাম। সবর না করে উপায়ও
নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিপদ আমি ঠেকাব কী করে? বিপদের যাতনা
সন্ত্বেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার নামই 'রেযা'।

তিন. রেযার স্তর অনেক উর্ধ্ব। কলব আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণ না হলে, এ
স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এ-স্তরে থাকা মানুষের মুখে ও কলবে সব সময়
উৎকীর্ণ থাকে,

আমি আল্লাহকে রব মেনে সন্তুষ্ট। ইসলামকে দীন মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট। মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট।

চার. আল্লাহ তা'আলা বিপদ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে গুনাহ মাফ করবেন অথবা
জান্নাতে মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

পাঁচ. মানুষ আল্লাহর প্রতি 'রাজি' হতে না পারলে, গোটা দুনিয়া পেয়ে গেলেও
তার মন-পেট ভরবে না।

IV

যাচাই হয়ে যাক,

১. জীবনে আমি যা হারিয়েছি, যা পাইনি, যা খুইয়েছি, যা থেকে বঞ্চিত হয়েছি,
যা কিছু অধরা থেকে গেছে, সবকিছুর জন্যই আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট?
তাহলে আমি পরম সুখী।

২. আমি কি সব সময় অভাব-অভিযোগ নিয়েই আছি? না পাওয়ার বেদনায়
জর্জরিত? তাহলে আমি চরম হতভাগা।

৩. যখনই কোনো বিপদে পড়ব বা পরীক্ষার সম্মুখীন হব, যাচাই করে নিবো, আমি কি আল্লাহর এই ফয়সালায় সম্ভুষ্ট? আল্লাহ কখন আমার প্রতি সম্ভুষ্ট হবেন?

-আমি আল্লাহর প্রতি সর্বাবস্থায় সম্ভুষ্ট থাকলে তবেই তিনি আমার প্রতি সম্ভুষ্ট হবেন। আর আমার কর্তব্য হলো, আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এমন আমলে মশগুল থাকা। আমি আল্লাহকে ভালোবাসলে তিনিও আমাকে ভালোবাসবেন।

□□□□

পরিশেষে:

☞ আমার ওপর যে বিপদ এসেছে, সেটা আমার কাছেই এসেছে। অন্য কারো কাছে নয়। আমি চাইলেও সেটা হটাতে পারব না।

☞ আমার ওপর যে বিপদ আসেনি, সেটা গোটা দুনিয়া চেষ্টা করেও আমার ওপর আনতে পারবে না।

অজ্ঞেয় পশ্চিম

পশ্চিমে বাস করে, পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস রাখে, পশ্চিমা ধাঁচে পড়াশোনা করে, পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারে মুগ্ধ, বর্তমানে এমন মুসলমানের অভাব নেই। এদের অনেকেই বিশ্বাস করে, পশ্চিমারা অজ্ঞেয় শক্তি। তাদেরকে হারানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ কেউ লেখায় ও বলায় সেকথা প্রকাশ করে! আবার এটা নিয়ে তারা গর্ববোধও করে। এদের কারণে সাধারণ সরলমনা মুসলমানও কখনো কখনো ধোঁকায় পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচাতে আগেই বলে রেখেছেন,

لَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে আপনি কিছুতেই মনে করবেন

না, পৃথিবীতে তারা আমাকে অক্ষম করে দিবে। (নূর: ৫৭)

কাফেররা যতই হুম্বিতম্বি করুক, আল্লাহ তা'আলা ধরলে, তাদের পালাবার পথ থাকবে না। কোথায় লুকোবে?

ইমামের রেজিস্ট্রেশন

অমুসলিমরা দ্বিধায় পড়তে পারে, কিন্তু একজন মুসলিম কেন দ্বিধায় পড়বে? ওমুক বিজ্ঞানী, তমুক মানবতাবাদী, সারা জীবন মানবসেবা করে গেছেন, তার

এতসব পূণ্য বৃথা যাবে? কোনো প্রতিদানই পাবেন না? প্রশ্নটা আসে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী মুসলিমের পক্ষ থেকে। তাদের কেউ কেউ মনে করে, মানবদরদী অমুসলিমও পরকালে 'স্বর্গে' যাবে। যখন বলা হয়, এরা সবাই জাহান্নামে যাবে! তাদের চোখ কপালে উঠে যায়! অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে বলে, -এটা কী করে সম্ভব? তারা সারাটা জীবন জনসেবা করে গেছেন! কোটি কোটি মানুষ তার আবিষ্কারের সুফল ভোগ করছে!

-আমি একজন মুসলমান হিশেবে মানবো কুরআনের কথা! আমার ভাবনায় কী এলো না এলো, সেটা আমার কাছে মোটেও ধর্তব্য নয়।

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

তাদের চাঁদা কবুল হওয়ার পক্ষে বাধা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফুরি করেছে। (তাওবা: ৫৪)

আগের আয়াতে বলা হয়েছে,

أَتَقْبَلُوا طُوعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ

তোমরা খুশি মনে চাঁদা দাও বা অসন্তোষের সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। (তাওবা: ৫৩)

আল্লাহর কাছে আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আগে রেজিস্ট্রেশন করা জরুরী। আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনাই হলো সে রেজিস্ট্রেশন। ভর্তিই হলাম না, পরীক্ষার খাতা ভরে ফেলে কী লাভ?

চপলমতি পণ্ডিত

মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, শরীয়ত, খিলাফত, কিতাল, পারিবারিক আইন সম্পর্কে। পত্র-পত্রিকায়, অনলাইনে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। বেশি আর কম অনেককেই দেখা যায়, বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিতে। যে যার মতো বেধড়ক মতামত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে থাকে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের অনেকেই বিষয়টা নিয়ে কোনো পড়াশোনাই করেনি। কুরআন হাদীস ঘেঁটে দেখেনি। এখান ওখান থেকে টুকটাক পড়েই নিজের মতামত দাঁড় করিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছে! এবং নির্দিধায় বলছে, আমার বক্তব্যটাই শরীয়তের মূলকথা!



এটা ঠিক, শরীয়তের ইলম নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু শরীয়তের বিধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়াটা কিছু যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত। ফতোয়া প্রদান করাও একটা শাস্ত্র। এজন্য চর্চা থাকা জরুরী। এই মানুষগুলো

নিজে না পারুক, যোগ্য কোনো মুফতীর কাছ থেকেও বিষয়টা জেনে নিতে পারত! কিন্তু তা করবে না। নিজের বুঝ মতোই ভ্রান্ত ফতোয়া দিতে থাকবে। এরা নতুন কোনো দল নয়! সেই ওহী নাযিলের সময় থেকেই আছে। আরো একটা দল আছে, তারা একটা সংবাদ শুনলেই, সেটার প্রচার শুরু করে দেয়। বাহবা কুড়ানোর জন্য। এরাও রোগী।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

তাদের কাছে যখন শান্তির বা ভীতির কোনো সংবাদ আসে, তারা তা (যাচাই-বাছাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার (তথ্য) অনুসন্ধানী, তারা তার (যথার্থতা) জেনে নিত। (নিসা: ৮৩)

□

কিন্তু তাদের অত সময় কোথায়? কিভাবে খবরটা সবার আগে প্রচার করবে, কিভাবে নিজের বক্তব্যটা আগে প্রকাশ করে 'ক্রেডিট' নিবে, সেটা নিয়েই বিভোর!

কুফরবান্ধব মুমিন!

এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা কথায় কথায় পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান গায়। ইহুদি-নাসারাদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহুদিদেরকে অপরাজেয় মনে করে। তাদের কারো কারো দাবী অনেকটা এমন, একজন শিক্ষিত কাফের অশিক্ষিত মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তারা সবকিছুর সমাধানের জন্য প্রথমেই ইউরোপের দিকে দৌড়ায়! এরা নতুন নয়। কুরআন কারীম নাযিলের যুগেও এদের অস্তিত্ব ছিল। এমন ভ্রান্ত চিন্তার বীজ তখনো ছিল। তাই এদের অসার দাবীকে খণ্ডন করে কুরআন বলে রেখেছে,

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাস যে-কোনো মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম। (বাকারা: ২২১)

□

দুনিয়ার চাকচিক্য কখনোই জান্নাতে নিয়ে যাবে না। টেকনোলজির উন্নতি হিদায়াত দিতে পারে না। গাড়ি থাকল না, না থাকল বিমান, কিন্তু ঈমান থাকল, এটাই বেশি উপকারী! তবে উভয়টা একসাথে থাকাও ভালো!

হকবিদ্বেষী

কিছু লোকের উদ্ভব হয়েছে, সুযোগ পেলেই আলিম-ওলামা সম্পর্কে প্রচণ্ড আক্রোশ ঝাড়তে শুরু করে। অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। জগতের নিকৃষ্ট ব্যক্তিটা সম্পর্কেও কেউ এমন ভাষা ব্যবহার করবে না। অথচ তারা নিজেকে মুসলিম বলেই দাবী করেন। আলিমদেরকে মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে হয়রানী করতে কসুর করেন না। তারা বলে, ইসলামের এহেন দুরবস্থার মূল কারণ এই আলিমরা! তারাই দায়ী। কিন্তু এখনো সব মানুষ আলেম-ওলামা বিদ্বেষী হয়ে যায়নি। এজন্য বিদ্বেষীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদের ভয়ে। না হলে, ওদের আচরণ দেখলে মনে হয়, পারলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে! এমন মানুষ সমাজে নতুন নয়। সব সময়ই ছিল।

وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের বিপরীতে তুমি কিছু শক্তিমান নও। (হুদ: ৯১)

III

হকের বিদ্বেষী ছিল আছে থাকবে। হকপন্থী আলিমও ছিলেন আছেন থাকবেন। দুই দলই নিজ নিজে অবস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে।

শরীয়ত নয়, কুরআন মানি

পড়াশোনা করা মানুষ। ধর্মকর্মও করেন নিষ্ঠার সাথে। ঈদে-চাঁদে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করেন। টুপি মাথায় স্টেজের অগ্রভাগেও অবস্থান নেন সভাপতির আসনে। কুরআন মানেন। হাদীস মানেন। ওহী মানেন। এমনকি ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার ঘোষণাও দেন। এমন মানুষের সামনেও যখন কুরআনী শাসনের কথা বলা হয়, দেশে প্রচলিত নয় এমন কোনো কুরআনী বিধানের কথা বলা হলে ক্ষেপে যান। তাদের প্রতিক্রিয়াটা হয় প্রচণ্ড গনগনে উত্তপ্ত।

-কী ব্যাপার, আপনি কুরআনের বিরোধিতা করছেন?

-আরে নাহ, আমি নিজেই প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করি। আজও করেছি। আমি বিরোধিতা করছি কুরআনের অপব্যাক্যার! তারা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এমন ব্যাক্যার করেছে। তারা কুরআনকে রাজনৈতিক 'ইশতেহার' বানিয়ে ফেলেছে। কুরআন সবার। এটাকে আমরা কারো স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হতে দিতে পারি না।

এমন মানুষ অতীতেও ছিল। সব সময়ই ছিল। সব নবীর যুগে। সব হকের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এদের কঠোর অবস্থান ছিল। আজো আছে। কালও থাকবে।

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِنُحُومٍ بَرْدٍ وَتَكُونُ لَكُمْ أَلْبَابُ فِي الْأَرْضِ

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি, তুমি আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করবে এবং যাতে এ দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি কায়ম হয়ে যায় সে জন্য? (ইউনুস: ৭৮)

আয়াতের ঘটনা মূসা ও হারুন আ.-এর। অথচ আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও হুবহু একই ঘটনা। আমাদের সময়ে এসেও।

পূর্বপুরুষের দোহাই

ধার্মিক হিশেবে পরিচিত, ধার্মিক মহলেও কিছুটা সমাদৃত এমন মানুষও নিজের আত্মজীবনীতে 'অরুচিকর' কথা লিখেন। ছোটবেলায়, ছাত্রজীবনে কী কী করেছেন, তার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরার গল্প লিখেন। কেউ কেউ সমাজে প্রচলন থাকার দোহাই দেন। এটা আমাদের গ্রামের রীতি। এসব আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। এ-ধরনের অজুহাতে নানা গর্হিত কাজ করেন। ধর্মবিরোধী প্রথা মানেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধার্মিক-অধার্মিকের বিবেচনাবোধ সমান হয়ে পড়ে। বিয়ে উপলক্ষে নাচ-গান চলে। জিজ্ঞেস করলে বলে, পোলাপান একটু আনন্দ ফুঁর্তি তো করবেই! বংশের ধারা!

এসব হলো জাহিলিয়াত! নব্য জাহিলিয়াত? না, নতুন নয়। কুরআন কারীম বলছে, এমন লোক সেকালেও ছিল।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

তারা (অর্থাৎ কাফেররা) যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (আ'রাফ: ২৮)

দলীয় অন্ধত্ব

একশ্রেণীর যুবক, দু'চার পাতা বিজ্ঞান পড়ে বা দু'চারটা বাঙলা বই পড়ে, টুকটাক লিখতে পারলেই শুরু করে ইসলাম বিদ্বেষী লেখা। ইসলাম ও মুসলিমকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাই তাদের পেশা ও নেশা হয়ে দাঁড়ায়। আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, নিজেকে মুসলমান দাবী করার পরও কেউ কেউ ধর্মবিদ্বেষী লেখা লিখে। অধিকাংশই লিখে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। জ্ঞানচর্চার তাকিদ থেকে নয়। কেউ কেউ নিজের দলের অন্ধ অনুসারী হতে গিয়ে, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ফেলে। তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে। দাঁড়ি-টুপিও আছে। কিন্তু দলীয় স্বার্থটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তারা শুধু দলীয় মোহে অন্ধ হয়ে প্রতিপক্ষের ধার্মিকতাকে খোঁচা দেয়। আঘাত করে। তারা একটু ভেবে দেখে না, তাদের অবস্থানটা সরাসরি আল্লাহর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও নতুন কোনো প্রজন্ম নয়। সেই কুরআনী যুগেও এদের অস্তিত্ব ছিল,

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ*
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَاءَ حَتَّىٰ أَنْتَوْكُمْ ذِكْرًا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ

আমার বান্দাদের একদল দু'আ করত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা যখন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে। এমনকি তা (অর্থাৎ তাদেরকে উত্যাভ্যাস) তোমাদেরকে আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত থাকতে। (মুমিনুন: ১০৯-১০)

পা-চাটা গবেষক

তারা ইসলাম নিয়ে জানতে চায়। পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি। প্রথমেই হাতে ওঠে প্রাচ্যবিদদের লিখিত বইগুলো। মধুর সাথে বিষও ঢুকতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদেরও শখ জাগে গবেষক হওয়ার। যা যা গিলেছে, তা নিজের ভাষায় ছাড়তে শুরু করে। গিলেছে মধু ও বিষ। কিন্তু ছাড়ার সময় শুধু বিষটাই বের হয়। নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু ইসলামের প্রতিটি বিষয় নিয়েই তাদের আপত্তি। ইসলামের পুরো ভিতই দাঁড়িয়ে আছে 'ইয়াকীন' বা দৃঢ়বিশ্বাসের ওপর। তাদের পুরো গবেষণা দাঁড়িয়ে থাকে 'শকসন্দেহের' ওপর। তারা বলে,

কুরআন ঠিক আছে, কিন্তু হাদীস কেন মানতে হবে? হাদীস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। এসব কথা মুহাম্মাদ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলে গেছে। আশপাশ থেকে শুনে বলেছে। এসব কথা-উক্তিকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করার কোনো যুক্তি নেই।

III

নাউযবিলাহ! মনে হতে পারে, এই শ্রেণীর লোকজন ঔপনিবেশিক আখ্যায়িকার প্রভাবে তৈরি হয়েছে। কিন্তু কুরআন বলেছে ভিন্ন কথা,

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ

তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং (তার সম্পর্কে) বলে, 'সে তো আপাদমস্তক কান'।

(তাওবা: ৬১)

মানে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার কথাই শোনে। কান পাতলা মানুষ। সবার কথায় কান দেন। তারপর শোনা থেকেই কথা বলেন। নাউযবিলাহ! মুনাফিকরা সব যুগেই ছিল। তাদের ধরনও দেখা যায় একই।

গাছেরটা তলারটাও

আমিও মুসলমান। নামায পড়ি। এ-দাবী করে, এমন মানুষ বর্তমানে কম নয়। তারা এটাও দাবী করে, কুরআন আল্লাহর কিতাব। কুরআনী আইন সেরা আইন। সেকরেড (পবিত্র) আইন। কিন্তু রাজপথে নামলে, স্লোগান তোলে পশ্চিমা গণতন্ত্রের। কোর্টে গেলে বিচার করে বৃটিশ আইনে। কলেজে-ভার্সিটিতে জ্ঞানচর্চার প্রতিটি শাখাতেই শেষ সিদ্ধান্ত টানে ইসলামবিরোধী ইউরোপিয়ানদের ভাঙ গবেষণা মেনে। এমন দ্বৈত অবস্থান নিয়েও তারা কোনো সমস্যা বোধ করে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এ-ধরনের সংকর শ্রেণী নতুন! কিন্তু কুরআন বলে, এরা পুরনো দাগী!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يَخَافُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

(হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে, আপনার প্রতি যে কলাম নাযিল করা হয়েছে তারা তাতেও ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ

তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন (সুস্পষ্টভাবে) তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়। (নিসা: ৬০)

ঈমান ছাড়া সব চলবে

সাহিত্য আড্ডা, চিন্তাসভাগুলোতে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সারা বিশ্বের সবকিছুই আলোচনায় আসে। রামায়ণ থেকে শুরু করে ত্রিপিটক যিন্দাবেস্তা সবই। এমনকি বাইবেলের গল্পও আসে। আড্ডাগুলো বিকেল থেকে শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত গড়ায়। কখনোবা রাত ফুরিয়েও যায়। এমন অনেক 'এনলাইটেড' মানুষের সাথে ওঠাবসার সুযোগ হয়েছে। লম্বা সময় কাটানোরও অভিজ্ঞতা আছে। কয়েকদিন আগেও ঢাকার বিখ্যাত এক 'স্থানে' সময় কেটেছে। কমিউনিজম-হিস্ট্রি-ওয়েলিংওয়াল-ইহুদি লবি কী আসেনি সেদিনের আলোচনায়! কিন্তু যখনই সূরা ইসরার সূত্র ধরে আলোচনা ঘোরাতে চাইলাম, সাথে সাথে বেশির ভাগের মধ্যে চাপা অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। এদিক সেদিক তাকাতে শুরু করল। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য প্রয়াস দেখা যেতে লাগল। একটু আগেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিয়ে তুমুল তর্ক চলেছিল। অর্জুন আর দ্রোণাচার্যের মাঝে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে বিতর্ক হলো। সেটাতে কোনো সমস্যা ছিল না। এমন প্রজন্ম কি হালে সৃষ্টি হয়েছে? কুরআন কী বলে?

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَخَذَهُ أَشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

دُونِهِ إِذَا هُمْ يَنْتَبِشُونَ

যখন এক আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয়। আর যখন তাকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। (যুমার: ৪৫)

উদারপন্থী

পরিবারের দিক থেকে মুসলিম। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। বাড়ি এলে টুপি মাথায় মসজিদে যায়। ভার্টিটি-আড্ডায় গেলে টুপি খুলে যায়। ধর্মকে অপছন্দ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতাকেও ছাড়ে না। জুমার আজান হলে, আড্ডা ছেড়ে মসজিদ খোঁজে। পরে আবার ধর্মনিরপেক্ষ আড্ডায় যোগ দেয়। তারা উভয়টাকে একসাথেই লালন ও পালন করতে চায়। তাদের কেউ কেউ

উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করে। ধার্মিকদেরকে উদার বানানোর প্রজেক্ট হাতে নেয়। ধর্মনিরপেক্ষদেরকে সহনশীল হওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা মনে করে, এটা মধ্যম পন্থা। প্রকৃত উদার অবস্থান এটাই। এটা সাম্য।

III

অবাক লাগে, এদের চিন্তার ধরন দেখে! ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা, এটা তাদের উদার 'আয়না' ধরা পড়ে না। ইসলাম মানলে, অন্য কোনো ধর্মমতকে মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী থাকতে পারবে। জিহিয়া দিয়ে। এমন আলো-আঁধার একসাথে ধারণ করা 'উদার' মানুষ কি আধুনিক সমাজের সৃষ্টি? কুরআন কী বলে?

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ بِكُلِّ شَيْءٍ

তারা বলে, আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি, আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়। (নিসা: ১৫০)

কুরআন ও লোকধর্ম

ইউরোপে আরো দু-আড়াইশ বছর আগে শুরু হয়েছে, ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার আন্দোলন। যার হাত ধরে তাদের 'রেনেসাঁ' এসেছে। তাদের দেখাদেখি মুসলিম 'বুদ্ধিজীবী'রাও লোকজ সাহিত্য, লোকসংগীত, লোকাচার নিয়ে মগ্ন হয়েছে। এসব করতে করতে তারা এক সময় তাদের 'লোক(ফোক)-কে ধর্মের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের রীতিতে গবেষণা করে, তারা সিদ্ধান্তে এসেছে, লোকজ সংস্কৃতিকে দেশজ করে তুলতে হবে। ধর্মের সাথে সংঘর্ষ লাগলে, ধর্মকে টেনেটুনে পাশে রাখতে পারলে ভালো, নইলে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। ঐতিহ্য ঠিক রেখে, ধর্মকে ঐতিহ্যানুসারী করতে হবে। ঐতিহ্য লালন করতে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ালে, ধর্ম পালন স্বগিত রাখতে হবে। অথবা ঐতিহ্যানুসারে ধর্মের ব্যাখ্যা বের করতে হবে।

III

ভেবেছিলাম, এসব নতুন! পরে দেখি, না সেকালেও তারা ছিল।

يَخْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

যারা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দাবলীর স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার পরও তাতে বিকৃত সাধন করে। তারা বলে, তোমাদেরকে এই হুকুম দেয়া হলে তা গ্রহণ করো, আর যদি এটা দেওয়া না হলে বেঁচে থেকো।
(মায়িদা: ৪১)

বহুতাকামী

ইসলামকে জানতে চায়, এমন মানুষের আজ অভাব নেই। কিন্তু ইসলামকে জানতে গিয়ে, কিছু মানুষ কেন যেন প্রথমেই ইসলামের জটিল বিষয়গুলোর দিকেই যায়। সহজ-সরল বিষয়গুলো তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বড় বড় সাহাবীকে ছেড়ে প্রথমেই কেন যেন তাদের আলোচনা মুয়াবিয়া রা.-এর দিকে ছুটে যায়। অথচ আবু বকর-উমর রা.-এর মতো মানুষ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কুরআন কারীম পড়তে বসে তারা। সেখানেও একই ঘটনা। সহজ-সুন্দর বিষয়গুলো এড়িয়ে চোখ পড়ে কিছুটা কঠিন বিষয়ের প্রতি। কুরআন কারীমে দু'ধরনের আয়াত আছে।

ক. সহজে বোঝা যায়। এগুলোই কুরআন কারীমের মূল।

খ. চট করে বুঝে ওঠা কঠিন। একটা অর্থ বুঝলেও বুঝটা সঠিক কি না, সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কুরআন কারীমের আয়াত বোঝা নিয়ে তথাকথিত 'গবেষকদের' মাঝে আরো দু'টো বিতর্কের কথাও এই ফাঁকে বলে নেয়া যেতে পারে।

ক. কুরআন বর্ণিত বিধানের যৌক্তিকতা বর্তমানে আদৌ আছে কি না?

খ. আয়াতটা আসলে কী বোঝাতে চাইছে? এই আয়াত থেকে অনেকগুলো দিক বোঝা যাচ্ছে। কোনটা সঠিক?

যারা সালাফকে মানেন, কুরআন কারীম বুঝতে তাদের কোনো সমস্যাই হয় না। সুন্দরভাবে পার হয়ে যান। নতুন করে গবেষণায় নামা মানুষগুলিই যত সমস্যার সম্মুখীন হন। বলা ভালো, তারা ইচ্ছে করেই সমস্যায় পড়েন। অথবা সমস্যা সৃষ্টি করেন। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই হলো সমস্যা সৃষ্টি করা। তাই তারা বেছে বেছে কুরআন কারীমের 'মুতাশাবিহ' আয়াতগুলো নিয়ে গবেষণা করে। মুতাশাবিহ আয়াত মানে হলো, যেসব আয়াতের অর্থ চট করে বোঝা যায় না।



এখানেও মনে হয়েছে, এ-ধরনের মানুষ বুঝি আধুনিক যুগের 'প্রোডাক্ট'। পরে দেখি, এরা সেই প্রাচীন যুগ থেকেই সমাজে বহাল তবিয়ে আছে।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাসাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে। উদ্দেশ্য, ফিৎনা সৃষ্টি করা। (আলে ইমরান: ৭)

স্বার্থবাদী আন্দোলন

বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজে কিছু কিছু ইসলামী রীতিনীতি আছে। ঔপনিবেশিক আত্মসনের মুখেও সেগুলো টিকে আছে। সেই প্রথম যুগ থেকে। মুসলিম দেশের নির্বাচিত সরকারগুলোকে, জাতিসংঘ-ইউনিসেফ-বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের চাপে এসব রীতিনীতি উচ্ছেদ অভিযানে নামতে হয়। সরকার আইন করার আগে, একদল গৃহপালিত বুদ্ধিজীবী আগে থেকে উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। মত প্রকাশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সরকারী দলের লোকেরাও ও-বিষয়ে কথা বলে। সমর্থন জানায়। এক পর্যায়ে জাতীয় পরিষদে আইন পাশ করা হয়।



একদল প্রতিবাদী মানুষ তখন উক্ত আইন পাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। কুরআন-হাদীস থেকে নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করায়। তখন গৃহপালিত বুদ্ধিজীবীরাও মুখোমুখি অবস্থানে আসে। প্রথম প্রথম বুদ্ধিজীবীরা ইসলামপন্থীদের সাথে বিতর্ক করার সময় নিজেদের সুবিধা মতো কুরআন-হাদীস ব্যবহার করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি খুঁজে পেতে তাদের স্বপক্ষে পাশ্চাত্যের পা-চাটা কোনো 'ইসলামিক স্কলার'-এর 'ওপিনিয়ন'ও হাজির করে। হকপন্থীরা কুরআন-হাদীস থেকে পাল্টা দাঁতভাঙা জবাব হাজির করে। বুদ্ধিজীবীরা তখন কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে আসল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। চোঁচাতে শুরু করে,

এরা আসলে ধর্ম ব্যবসায়ী। ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বানিয়েছে। এরা ক্ষমতালোভী ধর্মব্যবসায়ী। এদের অভিসন্ধি সুবিধার নয়। এই

সুবিধাবাদীদেরকে জোর করে দমন করতে হবে। এদের বাড় বড় বেড়ে গেছে। গোড়াতেই বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে!



আল্লাহর বিধানকে বদলে দেয়ার এই অপ মিশন আজকের নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আবার যারা আল্লাহর পথে চলে, ধর্মের আইন বাস্তবায়নের কথা বলে, তাদেরকে স্বার্থবাদী, ক্ষমতালোভী বলে গালি দেয়ার রীতি নতুন কিছু নয়।

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَبَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخَذُونَ

তারা আল্লাহর কথা পাল্টে দিতে চাইবে। বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না। আল্লাহ আগেই এ রকম বলে রেখেছেন। তখন তারা বলবে, আসলে তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। (ফাতহ: ১৫)

কৌশলের ফাঁদ

প্রথম প্রথম লিবারালরা বলত, এখন অনেক ধার্মিকও বলে,
-এখন শরীয়ত বাস্তবায়নের সুযোগ নেই। তার বদলে গণতন্ত্র চালু করতে হবে। কুরআনী শাসন কায়েম করলে, পরাশক্তিগুলো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পুরো দেশটা ছারখার করে দেবে। তার চেয়ে মানবরচিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত। শুধু শুধু কেন বিপদ ডেকে আনতে যাব?



কিছু ধার্মিকও মনে মনে চায়, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হোক। কুরআনী শাসন প্রতিষ্ঠা হোক। কিন্তু সেটা হতে হবে কৌশলে। প্রথমে কুফরের সাথে আপোষরফা করতে হবে। কিছুদিন তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। মদ-জুয়া-সুদকে বৈধতা দিতে হবে। এসব হবে কিছুদিনের জন্য। বাহ্যিকভাবে। মনে মনে ঠিকই এসবকে ঘৃণা করে যাব। পরে সময় বুঝে ভোটব্যাংক বাড়িয়ে সংবিধান সংশোধন করে নেয়া হবে। চট করে পুরোদস্তুর কুরআনী আইনে যাওয়া যাবে না। সেটা হবে বোকামির নামাস্তর।



এদের কথা শুনলে, কৌশল নিয়ে ভাবতে বসলে প্রথম ধাপে মনে হবে, এই ভীর্ণতা, বিকৃতি নতুন করে মুসলিম সমাজে গজিয়ে উঠেছে। আসলেই কি তাই? কুরআন কারীম যে এ-লোকদের কথা সেই কবে বলে রেখেছে!

وَقَالُوا لَنْ نَّبْعِدَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَحْظُفُ مِنْ أَرْضِنَا

তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে নিজ ভূমি থেকে উৎখাত করা হবে। (কাসাস: ৫৭)

চিন্তার দৈন্য : সেকাল-একাল

আধুনিক যুগে নানাবিধ সমস্যা। নানা সংকট। অন্তর্দন্দ্ব। মানসিক। সামাজিক। পারিপার্শ্বিক। কুরআন কারীমের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, সে যুগেও এসব ছিল। এক ব্যক্তিকে দেখতাম, প্রতিরোধ সংগ্রামকে তুলাধোনা করে ছাড়ছে। ঠাট্টা-বিদ্বেষের তির্যক বাণ ছুঁড়ে মারছে ওলামায়ে কেরামের দিকে। ধার্মিকদের দিকে।

-তাদের মাথায় যদি বিষয়-বুদ্ধি থাকত, আমাদের কথা শুনে চুপচাপ থাকত, এতগুলো মানুষ মারা পড়ত না। সমাজে অস্থিরতা থাকত না। বহিঃরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত না। তারা মানুষ মেরে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ভেবেছিলাম, এসব শুধু আমাদের সময়ের নব উদ্ভূত সমস্যা। আয়াতটা পড়ার পর টনক নড়ল।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا أَلَا نَأْمُرُنَا مَا قَاتِلُوا

তারা সেই লোক, যারা নিজেদের (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বসে বসে মন্তব্য করে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে কতল হত না। (আলে ইমরান: ১৬৮)

তাই তো, এটা আদি রোগ! প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে রোগটা বাহিত হয়েছে। সামান্য ধরন পাল্টেছে বলা যায়, বাকী সব ঠিক আছে।



আরবে চিন্তার গতি-প্রকৃতি বদলাতে থাকে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে। মিডিয়ার বদৌলতে। আধুনিক চিন্তায় বেড়ে ওঠা একদল জ্ঞানীশুণীর সাথে দেখা হলো। কথায় কথায় ফিলিস্তিনের কথা উঠল। তখন গায়ায় বর্বরোচিত হামলা চলছিল। তারা বললো,

এটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার! আমরা খামোখা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন? তাদের সমস্যা তারাই মেটাবে! আমরা তাদেরকে অর্থ সাহায্য করে, খামোখা টাকার অপচয় করব কেন! এ-টাকা আমাদের দেশের গরীব-মিসকিনকে দিলে, দেশের উন্নতি হবে। নিজ দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে! নিজের ঘর ঠিক না করে, পরের দিকে নজর দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

ভেবে দেখলাম, মানুষগুলো কত কত পড়াশোনা করেছে! তার ফলাফল কী দাঁড়াল? তীব্র জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসে আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাদের জ্ঞান তাদেরকে অন্ধ দেশপ্রেমের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের চিন্তার এই বিকৃতি পাশ্চাত্যঘেঁষা কারিকুলামের বিষাক্ত ফল! দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ভয়াবহ পরিণতি! কুরআন আমার সে ভুল ভেঙে দিল।

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ إِنَّا لَهُمْ لَأَعْمَلُ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكَ فَارْجِعُوا

যখন তাদেরই মধ্যকার কতিপয় লোক বলেছিল, ইয়াসরিববাসী!

এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং ওয়াপস চলে যাও।

(আহযাব: ১৩)

জাত্যাভিমান, জাতীয়তাবাদ সেই জাহেলী যুগ থেকেই সমাজের রক্তে রক্তে চেপে ছিল। ইসলাম এসে এর মূলে কুঠারাঘাত করলেও, সমূলে বিনাশ করতে পারেনি। কাফেরদের মধ্যে বীজ রয়ে গিয়েছিল।

□□□

একজন লেখকের কথা জানি। চমৎকার লিখেন। তার বিশ্লেষণধর্মী লেখা পড়ে যারপরনাই মুগ্ধ! আরবের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চলছিল। মানুষটা যে ভেতরে ভেতবে সরকারপক্ষীয় লোক, সেটা এতদিন বুঝতে পারিনি। তার একটা লেখা পড়তে গিয়ে খটকা লাগল। তিনি বলেছেন, এখন কনকনে শীতের মধ্যে আন্দোলনের ডাক দেয়া রীতিমতো বোকামী! জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে আন্দোলন কেন! শীত চলে গেলে ডাক দেয়া যেত! আন্দোলনকে ঠেকানোর এই সূক্ষ্ম চালটাকে নতুন বলে মনে হলো। কুরআন খুলে দেখি, সেই পুরনো কাহিনী!

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْلَا بَقَاؤُنَا لَنَفَقْنَا مِنكُمْ غِوًى .

তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ো না। বলে দিন, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন তীব্রতর। যদি তারা বুঝত! (তাওবা: ৮১)

□□□

গায়ার সংকটটা প্রায় স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। আরব দেশগুলো বেশ আর কম গায়াকে সাহায্য করে। একজন অতি দরদী (!) লেখক সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে লিখেছে,

আমরা গায়াকে কেন সাহায্য করব? তারা বড়ই অকৃতজ্ঞ! আমরা এত দান-খয়রাত করি, তবুও তাদের মুখে শুকরিয়া নেই। আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই!

লেখাটা পড়ে আমি স্তব্ধ! বলে কি এই লোক? মাজলুমকে সাহায্য করব, তার আবার বিনিময়ও চাইব! দিনদিন আমাদের মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? কখন থেকে আমরা এমন হয়ে গেলাম। পরে জবাব মিলল কুরআনে। নাহ, এটা নতুন কিছু নয়! সেই আদি রোগ! নবীজির যুগেও এ-রোগের অস্তিত্ব ছিল। বড় প্রকটভাবেই ছিল। নইলে আয়াত নাযিল হবে কেন?

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

উত্তম কথা বলে দেওয়া ও ক্ষমা করা সেই সদকা অপেক্ষা শ্রেয়, যার পর কোন কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ অতি বেনিয়ায (অমুখাপেক্ষী), অতি সহনশীল। হে মুমিনগণ, খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য। (বাকারা: ২৬৩-৬৪)



মুসলিম সমাজে এখন এমন লেখকের অভাব নেই। আরেক লেখক লিখেছে, -আমরা ইসলামের জন্য দান-সদকা করতে পারি। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই মিসকিন ফিলিস্তিনিদের জন্য কেন খরচ করব? আমরা টাকা দেব আর তারা বসে বসে থাকবে! এ কী করে হয়? ইসলাম ও তার অনুসারীদের মধ্যে বিরাট তফাৎ। ইসলাম পবিত্র ধর্ম! কিন্তু ইসলামের অনুসারীরা আজ পবিত্র নেই।

লেখাটা পড়ে আমি হতভম্ব! বলে কি লোকটা! নামতে নামতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কোথায় গিয়েছে? বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল, একটা আয়াত দেখে! সেকালেও এমন চিন্তার অস্তিত্ব সমাজে ছিল।

مِمَّنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَقُوا

তরাই বলে, যারা রাসূলুল্লাহর কাছে আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই সরে পড়ে। (মুনাফিকুন: ৭)

□□□

পৃথিবীর গুরু থেকেই হক-বাতিলের লড়াই চলে আসছে। বাতিল তার রঙ পাল্টায়, চঙ বদলায়, খোলস পরিবর্তন করে। কিন্তু হকবিরোধী কর্মপ্রয়াস বদলায় না।

ଆମାତମାଥା ଗଳ୍ପ

সূ চি

আয়াতমাখা গল্প	১৩৯
আয়াতমাখা গল্প: মডারেট মুফাসসির	১৪১
আয়াতমাখা গল্প: আত্মবিশ্বাস	১৪৩
আয়াতমাখা গল্প: পতিভক্তি	১৪৪
আয়াতমাখা গল্প: মোড়	১৪৫
আয়াতমাখা গল্প: সন্তানের হাহাকার	১৪৬
আয়াতমাখা গল্প: হেবাতুল্লাহ	১৪৭
আয়াতমাখা গল্প: কুরআনের শক্তি	১৪৯
আয়াতমাখা গল্প: মাদ্রিদের মারয়াম	১৫২
আয়াতমাখা গল্প: শুধুই কুরআন	১৫৫
আয়াতমাখা গল্প: প্রশ্নবাণ-বাক্যবাণ!	১৫৬
আয়াতমাখা গল্প: কুরআনি সুবাস	১৫৯
আয়াতমাখা গল্প: প্রভূত কল্যাণ	১৫৯

আয়াতমাথা গল্প

এখন অনলাইনে-মিডিয়াতে, দ্বীনের প্রচার খুবই সাজানো-গোছানো! ঝকঝকে চকচকে! এটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার! কিন্তু আমাদের মাদরাসা-জীবনে দ্বীনি শিক্ষাকে এতটা চকচকে পালিশড ভঙ্গিতে পাইনি! দেখা যেত, কোনো হুজুরের জামায় পানের পিক লেগে আছে! আবার কোনো হুজুরের জামার বোতাম খোলা! পরিচ্ছন্ন অবশ্যই তবে কিছুটা এলোমেলো! কিন্তু এই এলোমেলো চালচলনের হুজুরগণের সাদামাঠা ভঙ্গির কথাগুলোই এখন অসাধারণ ভঙ্গিতে বিমূর্ত হয়ে ওঠে! তাদের মৃদস্বরের আগোছালো কথার প্রভাবে, এই এতদিন পরও খুউব ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে! নিকানো-তকতকে অডিটরিয়ামে নিখুঁত সাউন্ডসিস্টেমের তথ্যবহুল মুগ্ধকর অনেক বক্তব্যের প্রভাব দু'দিন পরই শ্রিয়মান হয়ে যায়! তথ্যগুলো মনে থাকে, কিন্তু কেন যেন আমলের স্পৃহা জাগে না! এটা হয়তো আমারই দুর্বলতা!

■

আলাভোলা এমন হুজুরদের কাছটি ঘেঁষে থাকতেই ভালো লাগত! ছাত্রজীবনটা এমনি কেটেছে! এখনো সেভাবে জীবন কাটাতে চেষ্টায় কমতি হয় না! হুজুরদের কাছে গেলে, কথা হতো! গল্প হতো! ইলমচর্চাও হতো! এই চর্চার ফাঁক দিয়েই অনেক আয়াত চলে আসতো! হাদীস চলে আসতো! তখন বুঝতে পারিনি, এখন কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি, দেখতে শুনতে নিতান্ত সাধারণ সেই মানুষগুলো কথাচ্ছলে কী অসাধারণ সব তাদাব্বুর প্রকাশ করে ফেলতেন!

■

তাদের তাদাব্বুরগুলো কথাঘেঁষা নয়, আমলঘেঁষা হতো! তারা আয়াতের চমৎকার কোনো ব্যাখ্যা বলতেন না! শুধু কোনো ঘটনাকে সামনে রেখে অনুচ্চ স্বরে আয়াতটা উচ্চারণ করে থেমে যেতেন! আর কিছু বলতেন না! তরজমা-তাকসীর-তাদাব্বুর কিছুই না! আমরা হয়রান হয়ে যেতাম হুজুর কোন হিশেবে আয়াতটা বললেন? খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে চিকন ঘাম বেরিয়ে যেত! শেষে না পেরে ভয়ে ভয়ে হুজুরের দ্বারস্থ হওয়া লাগত!

-হুজুর, আয়াতটার সাথে ঘটনার যোগসূত্রটা ধরতে পারছি না!

হজুর আঙুলের ডগা থেকে আরেক ছিলিম চুন জিভের ডগায় নিয়ে মিটিমিটি হাসতেন! কিছু বলতেন না! শুরু হতো আমাদের দ্বিতীয় পর্বের খোজাখুঁজি!

III

এখন কোনো ওস্তাদের গল্প নয়, গল্পটা এক ছাত্রের। তার মাদরাসার বিরতি চলছে। দেখা করতে এলো। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো! যাওয়ার সময় বিদায়ী মুসাফাহা করে উঠে যাওয়ার মুহূর্তে বললো,

-খাস করে দু'আ চাই?

-খাস কোনো বিষয়ে?

-আমি যেন 'কুরআনী অমর' হতে পারি!

-সেটা আবার কেমন?

-বেয়াদবি হয়ে গেছে হজুর, সরাসরি বলা উচিত ছিল! আমি 'শহীদ' হতে চাই!

-ও, তাই বলো! সেটা আমিও চাই! আমার জন্যও দু'আ করবে! আমার ভীকৃত্য যেন রাব্বের কারীম দূর করে দেন! কুফরের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দেন! ঈমানের স্বাদ যেন প্রতিটি রক্তকণিকায় জারী দেন!

III

ছেলেটা চলে গেল! শুরু হয়ে বসে রইলাম! আমি তো এভাবে কারো কাছে 'কুরআনী অমর' হওয়ার জন্য দু'আ চাইনি! চাওয়ার কথা মাথায়ও আসেনি! হিম্মত তো এমনিতেই নেই! আরে, যৌবনই তো শাহাদাতের শ্রেষ্ঠ সময়! সারা দিন আয়াতটা মাথায় টুংটাং করে ঘুরে বেড়াতে থাকল!

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না!

প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার বিষয়টা) উপলব্ধি করতে পার না। (বাকারা ১৫৪)

III

শিষ্য দেখি শুরুর চেয়েও কয়েক কাঠি সরেস! আমার গুরুগণ ঘটনার প্রেক্ষিতে সরাসরি আয়াত উচ্চারণ করতেন! আর শিষ্য আয়াত তো দূরের কথা, তরজমাটাও বলল না! তরজমার নির্যাসবোধক একটা শব্দবন্ধ (কুরআনী অমর) বলেই খালাস!

III

মজার ব্যাপার হলো, ফজরের পর লেখাটা নিয়ে আছি, আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে সে তালিবে ইলম আবার হাজির! আজ ছুটি, তাই দেখা করতে এসেছে!

আজ আবার আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি! আরেকটি 'শব্দবন্ধ' উচ্চারণ করল।
আরেকটি আয়াতমাথা গল্প।

মডারেট মুফাসসির

কুরআন কারীমের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। এ-স্লোগান তুলে কিছুদিন হৈ চৈ মাচালো একলোক। কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে, নিজেই এই 'সুমহান কাজ' আঞ্জাম দিতে লেগে গেল। তার উষর কলম প্রসব করল সূরা নাসরের বিকট এক 'কালোপযোগী' তাফসীর। এটুকু করেই ক্ষান্ত হলো না। তার খাহেশ জাগলো, এমন 'মানোস্তীর্ণ' গবেষণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। আলেম সমাজকে জাগাতে হবে। তাদেরকেও এ-কাজে রফীকে সফর বানাতে হবে। তারা বড্ড পিছিয়ে আছে। দীন না বোঝা ও দুনিয়ার বোঝা হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই।

ডাক মারফতে তার তাফসীরটা সোজা পাঠিয়ে দিল। দেওবন্দে। ক্বারী তৈয়ব সাহেব রহ.-এর কাছে। উদ্দেশ্য দু'টো।

ক. নিজের অবিশ্বাস্য মেধার বিচ্ছুরণ দেখিয়ে যুগের অন্যতম যোগ্য আলিমকে মুগ্ধ করা।

খ. সাথে সাথে অনুমোদন করিয়ে নেয়া। যাতে লোকদেরকে বলা যায়, আমার তাফসীরটা ক্বারী সাহেবও দেখে দিয়েছেন।

□□□□

ক্বারী তৈয়ব সাহেব যথাসময়ে তাফসীরটা হাতে পেলেন। সময় করে পড়তে বসলেন। বিশাল ভূমিকার জঞ্জাল শেষ করে মূল তাফসীরের প্রথম লাইন পড়েই তার দুই চোখ কপালে উঠে গেল।

(এক) আমরা জানি দীর্ঘ তেরশ বছর ধরে সূরা নাসরের তরজমা করা হয়েছে, 'যখন বিজয় আসবে' বলে। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, এ-সূরায় নাসর (نُصْرَى) শব্দের অর্থ বিজয় নয়। অর্থ হবে, উপকারী বাতাস ও বৃষ্টি আর ফাতহ (فَتْحٌ) অর্থ উপযুক্ত বৃষ্টি।

(দুই) আল্লাহর দীন (وَدِينِ اللَّهِ) মানে কৃষিকাজ। কারণ সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তা'আলা (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) 'আমিই কৃষক' বলে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

(তিন) তাহলে অর্থ দাঁড়াল, যখন বৃষ্টি ও হাওয়া দেখবে, লোকজন দলে দলে আনন্দের সাথে কৃষিকাজে যোগ দিবে।

(চার) 'আনন্দের সাথে' এই অর্থটা নেয়া হয়েছে আফওয়াজ (الْوَج) শব্দ থেকে। আনন্দের বিষয় বলেই দলে দলে যোগ দেয়ার কথা এসেছে।

(পাঁচ) নাসর ও ফাতহ থেকে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে মক্কাবিজয়ের কথা বলা হয়নি। অস্ত্র মানেই রক্তারক্তি, খুনোখুনি, হানাহানি। এটা আল্লাহর রহমতবিরোধী চিন্তা। আল্লাহ বাহুবল ব্যয় করাকে নিন্দার চোখে দেখেছেন।

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَزِلَّةً

রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে জেরবার করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। (নামল: ৩৪)

(ছয়). সূরার শেষে ইস্তিগফার করার কথা বলা হয়েছে। এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। সাধারণ কৃষকদেরকে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। নবীর গুনাহই নেই, ইস্তেগফার করতে বলা হবে কেন?



স্বারী তৈয়ব সাহেব ধীরে সুস্থে প্রেরকের মনগড়া তাফসীরটা পড়লেন। মাদরাসার কাজের চাপে উত্তর লিখতে বসতে পারছিলেন না। কাজের চাপ কমলে খাতা-কলম নিয়ে বসলেন।

১. প্রথমেই একটা প্রশ্ন, আপনি সূরা নাসরের যে 'কাশতেকা-রানাহ' কৃষিজীবীমূলক তাফসীর লিখেছেন, তার উৎস কী?

২. কোনো উৎস না যদি থাকে, শুধু আপনার খেয়াল থেকে এসব লিখে থাকেন, তাহলে এর পরিণতিটা চিন্তা করে দেখেছেন?

৩. আপনার মত আরেকজন এসে বলবে, (وَيَزِيلُ) অর্থ, কামারগিরি। (نَشْرًا) অর্থ, লোহা নির্মাণের চুল্লি ও হাপর।

৪. (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ) অর্থ, তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে। এই অর্থ বাদ দিয়ে বলবে, তারা (শ্রমিকরা) দলে দলে হাসতে হাসতে স্টীলমিলে প্রবেশ করছে। এই শিফটে তারা কাজ করবে!

৫. ফাতহ (الْفَتْحُ) অর্থ করবে, লোহা বানানোর কাঁচামাল সাপ্লাই। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক (শিল্প) বিপ্লবের সূচনা হবে।

৬. অর্থাৎ যখন চুল্লি-হাপর ও কাঁচামাল এসে যাবে, তখন তোমরা দলে দলে লোহা নির্মাণকাজে অংশ নিবে।

৭. এ-সূরায় কামারদেরকে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলকে নয়।

৮. এ তো গেল 'কামারী' তাফসীর। এভাবে চেষ্টা করলে, সূরা নাসরের 'কুমারী'

তাফসীরও পেশ করা যাবে। কাঠুরিয়া তাফসীর পেশ করা যাবে। দীন অর্থ, কাঠমিস্ত্রিগিরি। নাসর অর্থ, হাতুড়ি, করাত, রোঁদা ইত্যাদি। (يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ) অর্থ, তারা দলে দলে হাসতে হাসতে ফার্নিচার-কারখানায় প্রবেশ করেছে। কাজে ভুলচুক হয়, তাই কাঠুরিয়াদেরকে ইস্তেগফার করতে বলা হয়েছে।

৯. আপনি কি সূরা নাসরের এই কামার-কুমার-জেল-তাঁতীমার্কী তাফসীর গ্রহণ করবেন? না করলে, কেন করবেন না? সাধারণ বুদ্ধিই বলে, আপনি এসব তাফসীর গ্রহণ করবেন না। এসব তাফসীর বাতিল বলে গণ্য হলে, আপনারটা কেন হবে না?

১০. আপনি কি বুঝতে পারছেন, এসব রদ্দি কথাবার্তা আর যাই হোক, মোটেও তাফসীর নয়। বরং তাহরীফ। বিকৃতি।

১১. তাফসীর কাকে বলে, কিসের ভিত্তিতে কুরআন কারীমের তাফসীর করা হয়, এটা কি আপনার কাছে পরিষ্কার আছে?

দ্বিতীয় বিশ্বাস

ছোটবেলা থেকেই আমি কিছুটা ভীতু টাইপের। বড়বেলাতেও সাহসী হয়ে উঠতে পারিনি। স্কুলে-কলেজেও সঙ্গীদের হাতে নাজেহাল হতে হয়েছে, ভীত স্বভাবের জন্য। শুধু মনে হত, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। কী হবে এসব লেখাপড়া দিয়ে! পাসই তো করতে পারব না। তবুও কিভাবে যেন বছর শেষে পাস করে ফেলতাম। এক পা দুই পা করে করে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ভার্সিটির অঙ্গনে পা দিলাম।



তখনো আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কুঁকড়ে থাকা এক যুবক। সারাক্ষণই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম! একজন শিক্ষক এ সমস্যার কথা জানতে পেরে, আমাকে কুরআন কারীম পড়ার পরামর্শ দিলেন।

-আমি কুরআন কারীম পড়ি তো!

-এবার বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো!

তার পরামর্শ মতো বুঝে পড়ার চেষ্টা করলাম। একটা আয়াত আমার বেশ ভালো লাগলো।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبْحًا

যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। (আনকাবুত: ৬৯)



নিজের সব কাজ আল্লাহর জন্য করলে কেমন হয়? আয়াতটা পড়ার পর আমার প্রথম চিন্তা ছিল এটা! সাথে সাথে ভেতর থেকে সাড়া মিলল, অবশ্যই ভালোই হয়। তবে প্রথমে নিয়তটা ঠিক করে নিতে হবে। আমি আল্লাহর জন্য চেষ্টা করতে থাকলে, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন। সারাক্ষণই আয়াতটা বিড়বিড় করে আওড়াতে থাকলাম! আস্তে আস্তে ভয় কেটে যেতে লাগল। ভয় কাছে ঘেঁষতে চাইলেই বলে দিয়েছি, আল্লাহর জন্যই সবকিছু করছি, তিনি আমার সাথে আছেন! তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন! আমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই!

-মুহাম্মাদ ফিলালী

তিউনিস

পতিভক্তি

আমার সাহেব রাশভারী মানুষ। কিছুটা বদরাগীও। তাদের পরিবারে ধর্মকর্ম পালন করা হয় না। আমাকে ধর্মপালনে বাধা দেয়া না হলেও, তাদের মন রক্ষার্থে মাঝেমধ্যে অধর্ম করতে হয়। প্রথম দিকে অসম্মতি জানিয়ে দেখেছি! সবাই রাগ করে। মেহমান এলে তার সামনে এক টেবিলে বসে খানা খেতে হয়। নাস্তা-পানি পরিবেশন করতে হয়। স্বামীকে অনেক বুঝিয়েছি। বাবু আমার কথায় কান দেয়া দূরের কথা, উল্টো রাগ করেছে। তার রাগ থেকে বাঁচতে ধর্মকর্মে টিল দিলাম। নামায পড়া হত। সকালে নিয়ম করে কিছুটা কুরআন তিলাওয়াত হত। একটা আয়াত আমাকে চমকে দিল।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত না জানি তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে। (নূর: ৬৩)

□□□□

আয়াতটা আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল। স্বামীর খুশির জন্য আমি আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করছি! এটা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আমি কেন বান্দাকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করব? যা হয় হবে! আমি দীন মানব। কারো রাগ বা চোখ রাঙানির পরোয়া করব না! রিযিক আল্লাহর হাতে! রিযিকদাতার হুকুম মানলে তিনি আমাকে ফেলে দিবেন না। সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে, মনের উপর চেপে থাকা পাষণ্ডভার নেমে গেল। যে

কোনো পরিস্থিতির জন্যই মন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! সবাই আমার অনমনীয় অবস্থান দেখে রণে ভঙ্গ দিল। অবশ্য বিষয়টা এত সহজে হয়নি। বিয়েটা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমার সামনে সব সময়ই আয়াতটা ছিল! একটুও ভয় লাগেনি। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে! অবশ্য ব্যতিক্রম হলেও আমার আপত্তি ছিল না। আমার স্বামীর সম্ভ্রটি নয়, আল্লাহর সম্ভ্রটি দরকার! তবে আল্লাহর সম্ভ্রটির সাথে সাথে স্বামীর সম্ভ্রটি অর্জিত হলে ভালো।

-আবীর হাদা

আম্মান

মোড়

জীবন সব সময় একরকম চলে না। ভোগ-বিলাসে থাকতে থাকতে মন এক সময় বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। আমিও ছিলাম ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা এক টগবগে যুবক। বড়লোকের বখে যাওয়া 'দুলাল'। আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতে সুপথের সন্ধান পেলাম। আমাদের ক্রাশের এক 'সঙ্গিনীর' কাছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। হোভাটা সারাইয়ে দিয়েছিলাম সেদিন। বাধ্য হয়ে ইউনিভার্সিটির বাসে করেই বাসায় ফিরছি। আসন পেলাম এক মেয়ের সাথে। আমিই যেচে তার সাথে কথা বললাম! তার আচরণ আমাকে মুগ্ধ করল। তার শালীন বাচনভঙ্গি আমাকেও শালীন করে তুলল। যদিও আমি বসেছিলাম অশালীন ইচ্ছা নিয়ে।



জীবনে পরিবর্তন এলো। নতুন করে ভাবতে বসলাম। বন্ধুদের সাথে কথা বলতে গেলাম। এসব বিষয়ে তারা শুনতেই রাজি নয়। বুঝে গেলাম তাদের সাথে আর চলবে না। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও আমার পরিবর্তনকে ভালো চোখে দেখল না। ঘরে বাইরে সবাই আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল।



একসময় আমার আড্ডা ছিল! অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিল। এখন আমি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। সবার সাথে মিশতে হলে আবার আগের মতো হয়ে যেতে হবে। সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুরআন কারীম পড়তে শুরু করলাম নতুন করে। একটা আয়াত পড়ে চমকে উঠলাম!

وَاللّٰهُ يَرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيَرْيِدَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

আল্লাহ তো তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান, আর যারা কু-

প্রবৃত্তির অনুগমন করে, তারা চায় তোমরা যেন (সঠিক পথ থেকে)
বহু দূরে সরে যাও। (নিসা: ২৭)

□□□

আরে, কুরআন দেখি হুবহু আমার কথাই বলছে! আমার নিঃসঙ্গতা কেটে গেল। আমাকে নিয়ে বন্ধু-মহল আর অন্দরমহলের টানাহেঁচড়া চলতে থাকল! আমার মনে আরও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল, আয়াতটা আমার জন্য রাব্বের কারীম নাখিল করেছেন।

-মারওয়ান

আলেকজান্দ্রিয়া

সন্তানের হাহাকার

বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেছে। সন্তান হয়নি। একটা সন্তানের জন্য আমরা দু'জনেই হন্যে গেলাম। যেখানে যা চিকিৎসা পেয়েছি, আঁকড়ে ধরতে পিছপা হইনি। যে যা বলেছে, নির্দিধায় বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছি। হোমিও-এলোপ্যাথি-কবিরেজি, ইউনানি কিছুই বাদ রাখিনি। কিছুতেই ফল মিলল না। প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছি। কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে গিয়ে একটা আয়াত চোখে পড়ল। আরও কতবার আয়াতটা পড়েছি, সেদিনের মতো চোখে লাগেনি। বারবার আয়াতটা পড়তে থাকলাম!

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি বেশি
কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু কথাও) বোঝে না। (মুমিন: ৫৭)

□□□

আয়াতটা পড়তে পড়তেই মাথায় চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল, মানুষ সৃষ্টির চেয়েও আসমান ও যমীন সৃষ্টি বেশি কঠিন। এত কঠিন কাজ যিনি পারেন ও করেন, তিনি কি একটা ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পারেন না? আমাদেরকে একটা সন্তান দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন! স্ত্রীকেও আয়াতটা পড়ে শোনালাম! সেও ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল! দু'জনে আয়াতটার কথা বলে বলে নতুন করে দু'আ করতে শুরু করলাম! আলহামদু লিল্লাহ! কিছুদিন পরই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ফুটফুটে একটি সন্তান দান করেছেন।

-মুহসিন ফুয়াদ

আলজেরিয়া

হেবাতুল্লাহ

বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। পড়াশোনা শেষ করার আগেই বিয়ে করেছিলাম। তাই প্রথম প্রথম সন্তান কেন হচ্ছে না, এটা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। আমার স্ত্রীও তখন ছাত্রী। আব্বু দু'জনেরই খরচ চালাতেন। আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য পঁচিশ বছর বয়সেই বিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন। আগের মতো খরচাপাতি দিয়ে গেছেন পড়াশোনা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

□

চাকুরি নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িলাম। ছেলেপিলে হচ্ছে না দেখে দু'জনেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। দু'আ'-তদ্বির করলাম। আমার স্ত্রী একদিন বলল, -আপনি কি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন!

-কোন ব্যাপার?

-ছেলে-সন্তানও আল্লাহর দেয়া একপ্রকার রিয়িক! অন্যতম শ্রেষ্ঠ রিয়িক। কুরআন কারীমে যেখানেই এই সন্তানের রিয়িকের কথা এসেছে, সেখানে হেবা (الهبه) শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) ইবরাহীম আ. আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এমন পুত্র (হেব) দান করুন, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সাফফাত: ১০০)

আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেছেন,

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

(২) পিতার সাথে মতের অমিল হল। ইবরাহীম আ. বাড়িঘর ছেড়ে সরে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

আমি তাকে ইসহাক ও ইয়া'কুবকে (ওহেব্বাহ) দান করলাম। (মারয়াম: ৪৯)

(৩) বৃদ্ধ বয়সে সন্তান পেয়েছেন ইবরাহীম আ.। মনটা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকে সবসময়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে (ওহেব্বাহ) দান করেছেন। (ইবরাহীম: ৩৯)

(৪) যাকারিয়া আ.-এর সন্তান হচ্ছে না। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আল্লাহর কাছে অনবরত দু'আ করে যাচ্ছেন ইয়া রব,

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

আমাকে আপনার পক্ষ হতে একটি পবিত্র সন্তান (হেব) দান করুন!

(আলে ইমরান: ৩৮)

(৫) নিজের বক্ষ্যা স্ত্রীর কথা জানিয়ে ফরিয়াদ করছেন যাকারিয়া আ.। তার মৃত্যুর পর দাওয়াতী কাজের উত্তরাধিকারী হওয়ার মত কেউ নেই,

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

ইয়া আল্লাহ, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী (হেব)

দান করুন! (মারইয়াম: ৫)

(৬) আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন আইয়ুব আ.। অবিশ্বাস্য সবর ধরলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা আইয়ুবের সবরে খুশি হলেন। আগের মতো সব ফিরিয়ে দিলেন। বললেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

আমি তাকে (ওওহেব) দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তার সাথে

অনুরূপ আরও। (সোয়াদ: ৪৩)

(৭) দাউদ আ.-কেও আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

আমি দাউদকে (ওওহেব) দান করলাম সুলাইমান। (সোয়াদ: ৩০)

(৮) স্বামী নেই। তবুও কিভাবে গর্ভবতী হলেন? মারয়াম এমন অদ্ভুত ঘটনায় ভীষণ অবাক! সীমাহীন অশ্বস্তিতে পড়ে গেলেন। ইহুদিদের অপবাদের জ্বালা সইবেন কী করে? সবার অগোচরে দূরের এক স্থানে চলে এলেন। এমন দিশেহারা অবস্থায় জিবরাঈল এসে বললেন,

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

আমি আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফিরিশতা)। আমি এসেছি

আপনাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক পবিত্র পুত্র সন্তান (ল'আহেব) দান করার জন্য। (মারয়াম: ১৯)

(৯) আল্লাহ তা'আলা কিছু বান্দার প্রশংসা করেছেন। সর্বশেষ প্রশংসা করেছেন, যারা বলে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً وَأَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً

ইয়া রব, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে (مَبْنُوءَاتُ) দান করুন নয়নপ্রীতি। (ফুরকান: ৭৪)

(১০) অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوْرَ

তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন এবং যাকে চান পুত্র দান করেন।
(শুরা: ৪৯)



শরীয়তের পরিভাষায়, হেবা (الهبة) বলা হয়, বিনিময়হীন দানকে। কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া কাউকে কোনো কিছু মালিক বানিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা চাইলে আমাদেরকে সন্তান দান করতে পারেন। এবং সেটা কোনোরকম বিনিময় ছাড়াই। আমরা দু'জনে কুরআন কারীমের উক্ত আয়াতগুলোর অর্থ ও ভাব মাথায় রেখে, নবীগণের কষ্ট ও প্রাপ্তির বিষয়টা স্মরণে রেখে গভীর মনোযোগের সাথে দু'আ করে গেলে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই শুনবেন! আমরা আল্লাহর দরবারে রিযিক হেবা চাইব! সন্তানের রিযিক।



স্ত্রীর কথামত আমরা দু'জনেই নিয়মিত কুরআন কারীমের আয়াতগুলো আলোচনা করতে শুরু করলাম। নবীগণের আদর্শ সামনে রেখে দু'আয় মশগুল হয়ে গেলাম। আলহামদু লিল্লাহ! একমাসের মাথায় রাব্বের কারীম আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন। আমার আহলিয়া মেয়ের নাম পছন্দ করেছে 'মারয়াম ফারিস'। আমার নাম ফারিস তাই।

-ফারিস

মরক্কো

কুরআনের শক্তি

ড্যানিয়েল লোডুকা। ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২০০২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। পেশায় শিল্পী। ব্যক্তিজীবনে পাঁচ সন্তানের মা। ইসলাম নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের গল্প বলেছেন।

-আমি কখনোই আল্লাহকে খোঁজার গরজ অনুভব করিনি। যখন কিছুই করার থাকত না, তখন কোনো পুরনো বই বা ভবন দেখে সময় কাটাতাম। কখনো কল্পনাও করিনি, মুসলমান হবো। খ্রিষ্টানও হতে চাইনি। যে কোনো ধর্মের প্রতিই আমার ছিল তীব্র বিতৃষ্ণা! প্রাচীন কোনো গ্রন্থ আমার জীবনযাপনের পথ-

নির্দেশ করবে, ভাবতেই কেমন যেন লাগত। এমনকি কেউ যদি কয়েক কোটি ডলার দিয়েও কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে বলত, আমি সরাসরি অস্বীকার করতাম। আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম ছিলেন বার্টান্ড রাসেল। তার মতে,

‘ধর্ম হলো কুসংস্কারের চেয়ে একটু ভালো, সাধারণভাবে লোকজনের জন্য ক্ষতিকর, যদিও এর ইতিবাচক কিছু বিষয়ও আছে’।

তিনি বিশ্বাস করতেন,

‘ধর্ম ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের পথ বন্ধ করে দেয়, ভীতি আর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া আমাদের বিশ্বের যুদ্ধ, নির্যাতন আর দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী ধর্ম’।

আমার মনে হতো, ধর্ম ছাড়াই তো ভালো আছি। প্রমাণ করতে চাইতাম, ধর্ম আসলে একটা প্রভারণার নাম। ধর্মযাজকরা ধর্মকে নিজের জোচ্ছুরির স্বার্থে ব্যবহার করে। ধর্মকে হেয়করতে আমি পরিকল্পিতভাবে কাজ করার কথা ভাবতাম।



হ্যাঁ, সেই আমিই এখন মুসলমান! ঘোষণা দিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর সেটা না করে উপায়ও ছিল না। আমি অনুগত হয়েছি। ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে কখনো আল্লাহকে খুঁজতে চাইনি, সেই ইচ্ছাও কখনো ছিল না। একদিন এক বন্ধু আমাকে ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চাইল, আমি ক্ষুব্ধ হলাম। পারতপক্ষে ধর্মীয় বইগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। ঘটনাক্রমে কোনো ধর্মীয় বই হাতের নাগালে এসে গেলে, সেটা পড়ার সময় আমার ভেতরে কোনো পক্ষপাত থাকত না। উল্টো চেষ্টা করতাম, কোনও ভুল-ত্রুটি বের করা যায় কি না।



কুরআনের পেপারব্যাক অনুবাদটি পেয়েছিলাম বিনা মূল্যে। একদিন দেখলাম, এমবিএ’র কিছু ছেলে কুরআন বিলি করছে। জানতে চাইলাম,

-এগুলো কি ফ্রি?

-হ্যাঁ।

এককপি উঠিয়ে নিয়ে রঙনা দিলাম। ঘরে ফিরে কৌতূহল নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। পাতাগুলো মলিন হয়ে এলেও, ছাপা এখনো ঝকঝকে। অবাক কাণ্ড! যতই পড়তে থাকলাম, ততই বশীভূত হতে লাগলাম। আমি আগে যেসব ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছি, তা থেকে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থ সহজেই বুঝতে পারছিলাম। সবকিছুই ছিল স্পষ্ট। দ্ব্যর্থতাবিহীন।

পাতার পর পাতা উল্টে অনেক জায়গায় দেখতে পেলাম, স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। মনে হলো, পবিত্র কুরআন সরাসরি আমার সাথে কথা বলছে! আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে! এটা একটা 'পুরনো গ্রন্থ' কিন্তু পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। কথাগুলো আমার অন্তরকে নাড়া দিল। কোনও বইয়ের কথায় এমন অভূতপূর্ব সৌন্দর্য থাকতে পারে, আগে কখনো টের পাইনি। মরুভূমির দমকা হাওয়া যেন সবকিছু উল্টে দিল। মনে হলো, আমি কিছু একটার জন্য দৌড়াচ্ছি।

কুরআন আমার বোধশক্তিতে ভিন্নরকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আমাকে বারবার নিদর্শনাবলী দেখে চিন্তা করতে, ভাবতে, বিবেচনা করতে বলল। অন্ধবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। কুরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সব যুগে আধুনিকতা, মানবিকতা আর সহমর্মিতার কথা বলে। পাশাপাশি জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলে। সত্যের জন্যে জীবনবাজি রাখতে বলে।



অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনকে বদলে দেয়ার আগ্রহ তীব্র হল। ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য বই পড়তে শুরু করলাম। দেখতে পেলাম, কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, অনেক হাদীসেও তেমনটা আছে। আমি দেখলাম, পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংশোধন করা হয়েছে। আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। এতেই বোঝা যায়, তিনি গ্রন্থটির লেখক নন।

আমি নতুন পথে হাঁটতে শুরু করলাম। পবিত্র কুরআনের জ্যোতি আর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো রাস্তায়। এই লোকটির মধ্যে মিথ্যাবাদীর কোনো আলামত দেখা যায়নি। তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন। নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করে দিতে বলতেন। দয়া প্রদর্শনে উৎসাহিত করতেন। সম্পদ আর ক্ষমতা তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। কেবল আল্লাহর পথের বিগত বার্তা প্রচার করতেন। তা করতে গিয়ে নির্মম নির্যাতনও সহ্য করেছেন।



সব কিছুই সরল, সহজেই বোঝা যায়। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মহাবিশ্বের জটিল আর বৈচিত্র্যময় কোনো কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটেনি। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাকে অনুসরণ করতে হবে, এটাই সহজ কথা। অ্যাপার্টমেন্টের কৃত্রিম লাইটিং এবং বাতাসের ওজন নিয়ে ভাবতে ভাবতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পড়লাম,

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বদ্ধ ছিল। এরপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। আর প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (আম্বিয়া: ৩০)



এই আয়াত পড়ে আমার মাথা যেন দুই ভাগ হয়ে গেল। এটাই তো বিগব্যাং তত্ত্ব। (এটা শ্রেফ একটা তত্ত্ব নয়) সব জীবন্ত সত্ত্বাই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা মাত্র এটা আবিষ্কার করেছে। এটা ছিল অবাক করা বিষয়। এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং সবচেয়ে ভীতিকর সময়।

আমি বইয়ের পর বই অধ্যয়ন করে তথ্যগুলো যাচাই করতে থাকলাম। এক রাতে আমি প্র্যাট ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে বসে খোলা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মুখটা হয়তো কিছুটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। কী ঘটতে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটুকু অনুভব করলাম, আমার সামনে যা রয়েছে তা হলো সত্য। আগে আমি যেটাকে সত্য ভাবতাম, এখন সেটার আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমার সামনে দুটি বিকল্প ছিল। সত্যি বলতে আসলে কোনো বিকল্পই ছিল না। আমি যা আবিষ্কার করেছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারছিলাম না। অগ্রাহ্যও করতে পারছিলাম না। আগের মতোই চলব, এমনটাও ভাবছিলাম সামান্য সময়ের জন্য। সত্য উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার পর, সেটাও সম্ভব ছিল না। আমার কাছে পথ খোলা ছিল কেবল একটাই। ইসলাম গ্রহণ করা। অন্য কিছু করা মানেই ছিল সত্যকে অস্বীকার করা।
(দৈনিক আল কলম)

মাদ্রিদের মারযাম

শায়খ ফাহদ কিন্দারী। কুয়েতের আলেম ও দ্বারী। সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত করেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কুরআন-প্রেমিকদের বের করে বলে কি না,
-আমি অন্ধ, এতেই আমি খুশি। কারণ আমি চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবো। শেষ বিচারের দিন, কিছু প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাবো।

ড. কিন্দারি ছেলেটার এমন ঈমানদীপ্ত কথা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। কী বলছে এই ছোট্ট বালকটা!



আরেকবার তিনি তার অনুষ্ঠান 'বিল-কুরআন ইহতাদাইতু'-তে একজন তুর্কি শিশুকে হাযির করলেন। ছেলেটা বাক প্রতিবন্ধী। কথাই বলতে পারে না। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত? আহ! একবার তিনি স্পেনের একজন নব মুসলিম মহিলার সাক্ষাতকার হাজির করেছিলেন। সাক্ষাতকারটা পড়লে, কুরআন কারীমের প্রতি ভদ্রমহিলার ভালোবাসা ও অনুরাগের কথা জেনে মনটা ভিজে উঠতে বাধ্য। নিজের অবস্থা দেখে অনুশোচনা জাগবে।

-আমি মারয়াম। বাড়ি মাদ্রিদে। স্পেনের বিখ্যাত শহর। বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব রিয়েল মাদ্রিদের শহর। আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ। আমার আগের নাম ছিল স্টেলা এলাস।

-মারয়াম! আপনি থাকেন স্পেনে। ওখানে তো ইসলামের অতটা প্রচলন নেই। কীভাবে আপনি মুসলিম হলেন?

-আমার আন্সু ছিলেন খুবই ধার্মিক। তিনি নিয়মিত গির্জায় যেতেন। আবু অতটা ধর্মকর্মের ধারধারতেন না। আমরা আবুর মতোই ছিলাম। গির্জার ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না। এভাবেই জীবনটা পরম সুখে কেটে যাচ্ছিল। আমাদের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কোনদিন ধার্মিক হবো এমনটা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি।

-ইসলামের সাথে আপনার সম্পর্কটা কিভাবে হলো?

-আরবী ভাষার মাধ্যমে। ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমি পাঁচ বছর আরবী শিখেছিলাম।

-আরবী কেন শিখেছিলেন?

-আমি ঠিক বলতে পারবো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার পাশাপাশি একটা বিদেশি ভাষা শেখার চল আছে। আমার কেন যেন আরবী ভাষাটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। আরবী শিখতে গিয়েই সূরা ফাতিহা মুখস্থ করেছিলাম। আরবী ভাষার লিখিত রূপটা আমার কাছে ভীষণ সুন্দর লাগত। সময় পেলেই দেখে দেখে সূরা ফাতিহা আরবীতে লেখার চেষ্টা করতাম। প্রথমবার যখন সূরাটা লিখেতে পেরেছিলাম, সেটা বাঁধাই করে আবুকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলাম। একটা বিস্ময়কর ব্যাপার আমাকে অভিভূত করতো, যখনই আমি সূরা ফাতিহা লিখতাম বা পড়তাম অদ্ভুত এক ভালোলাগা আমার ভেতরটা ছেঁয়ে যেত। অনির্বচনীয় এক প্রশান্তিতে আমার মনটা শীতল হয়ে উঠত। নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হত। আমি প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি, পরের দিকে বিষয়টা

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তখন বেশি বেশি সূরা ফাতিহা পড়তাম। সূরা ফাতিহা পাঠই আমাকে ক্রমে ক্রমে ইসলামের দিকে ধাবিত করেছে।

-আপনি যখন সূরা ফাতিহা লিখতেন, তখন তো পুরোপুরি বুঝতে পারতেন না। কখনো কি অর্থটা জানতে ইচ্ছে হতো না?

-হ্যাঁ, অবশ্যই হত। সে অনুযায়ী কিছুটা শিখেছিও। যখন 'আর রাহমা-নির রাহীম' লিখতাম বা মুখস্থ পড়তাম, তখন মনে হতো, আমাকে যেন পরম মমতাময় কিছু একটা বেষ্টন করে ধরেছে। আমি যেন আরামদায়ক কিছু একটার মধ্যে ডুবে আছি। আমি যেন ভালো কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

-আপনি সব সময় সূরা ফাতিহা পড়েন। লিখেন। সূরা ফাতিহা থেকে আপনি কী শিক্ষা পেলেন?

-সূরাখানা পড়লে আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আমাকে রক্ষা করছেন। আমাকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যারা ভালো কাজ করে, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। যারা মন্দ কাজ করে, তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

-আপনি তাহলে সূরা ফাতিহার মাধ্যমেই ইসলামের দিকে এসেছেন?

-জি।

-আপনি যখন কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করলেন, তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল?

-আমি মাদ্রিদের সৌদি মসজিদে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে উপস্থিত মহিলারা আমাকে এত আদর করে জড়িয়ে ধরেছিল, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল খুবই আপন একটা বলয়ে এসে গেছি। মনে হচ্ছিল চারদিকে স্বস্তিকর একটা সুখাদ বাতাস বয়ে বেড়াচ্ছিল।

-আপনার ইসলাম গ্রহণটা পরিবার কিভাবে নিয়েছিল?

-আমি যখন আব্বুকে সূরা ফাতিহা উপহার দিয়েছিলাম, তিনিও পরে আমাকে একটা আরবী কুরআন শরীফ হাদিয়া দিয়েছিলেন। তবুও তিনি আমার ইসলাম গ্রহণ পছন্দ করতেন না। পরে অবশ্য মেনে নিয়েছেন।

-আপনার সময় কিভাবে কাটে?

-আমি দিনের বেশির ভাগ সময়, কুরআন পড়ে কাটাই। কোথাও গেলে কুরআন সাথে রাখি। সময় পেলেই পড়ি। স্প্যানিশ ভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

-ইসলাম সম্পর্কে আপনার পিতার মতামত কী?

-তিনি বলেন, 'আমি আমার মেয়েকে নিয়ে গর্বিত। সে আরবী পারে, এটা আমার কাছে অবাক লাগে। মনে হয়, সে আমার আরব মেয়ে। আমি ধার্মিক মানুষ নই। ধর্মকর্ম আমার কাছে ভালো লাগে

না। এতদিন কোনো ধর্ম মানিনি, এখন বুড়ো বয়েসে এসে আর নতুন করে ঝামেলা বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। আগে ভিন্ন চিন্তা পোষণ করলেও আমি এখন ইসলামকে ভালোবাসি। মুসলমানদের ভালোবাসি। স্পেনের সাথে ইসলামের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। আর হ্যাঁ, আমি মৃত্যু নিয়েও তেমন ভাবি না। মরে গেলে গেলাম। সেটা নিয়ে এখন অত ভাবার কী আছে? আমি আরব দেশ, ইসলাম ও আরবী ভাষাকে পছন্দ করি শুধু আমার মেয়ের কারণে। আমি পুরোপুরি নাস্তিকই নই। আবার কোনো কিছু বিশ্বাসও করি না। আমি ধার্মিক হলে খ্রিষ্টানই হতাম। কারণ সেটাই আমার সবচেয়ে কাছের ধর্ম। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি।

-মারয়াম, আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?

-আমি সব সময় দু'আ করি, আমার পরিবার যেন ইসলাম গ্রহণ করে।

পঞ্চাশ পেরুনো এ-জীবনে তো আর বেশি কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকতে পারে না। আমার এখন একটাই আশা, মক্কা মুকাররামায় যাবো। হজ্জ করবো। আর আল্লাহর কাছে একটা দু'আ করবো।

-কী দু'আ?

-আমি যেন কুরআনের হাফেযা হতে পারি।

শুধুই কুরআন

মঞ্চে নিখিল ভারতের প্রায় সব নেতাই উপস্থিত। ইংরেজ বিরোধী এক সমাবেশে। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষ যোগ দিয়েছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাই নেই। ঘটনাটা ১৯১৫ সালের দিকে। সভাপতি যথারীতি শায়খুল হিন্দ রহ.। তিনি ঘোষককে বলে দিলেন, সভা শুরু হবে কুরআন কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে। উপস্থাপক সে মর্মে ঘোষণা দিলেন। একজন কারী সাহেব মঞ্চের দিকে আসতে শুরু করলেন। অন্য ধর্মাবলম্বী নেতাদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করলেন। তারা ঠিক করলেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেও কিছুটা পাঠ করার সুযোগ দিতে হবে। না হলে বে-ইনসাফি হয়ে যাবে। অন্য ধর্মানুসারীরা নিজেদেরকে অবহেলিত ভাববে!

□

সভাপতির কাছে দাবি জানিয়ে চিরকুট পাঠালেন। শায়খুল হিন্দ দ্বিরুক্তি না করে, নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। মাইকে ঘোষণা দিলেন। অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করা হবে। এরমধ্যে ক্বারী সাহেব পৌছে গেছেন। কেরাত শুরু হল। সাথে

সাথে পুরো সমাবেশ জুড়ে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল। কারো মুখ দিয়ে টু'শব্দটি বের হচ্ছে না। তিলাওয়াতের সুমধুর সুর সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কেরাত শেষ হলো। শ্রোতাদের ঘোর তখনো কাটেনি। অপার্থিব এক আবেশে তন্ময় হয়ে আছে পুরো মজমা। মাইকের আওয়াজে সবার ঘোর কাটল। শায়খুল হিন্দ আবার ঘোষণা দিলেন। এবার একে একে হিন্দু শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হবে।

কেউ এল না। আবার ঘোষণা করা হলো। ফলাফল একই। আবার ঘোষণা হল। এবার আর থাকতে না পেরে, জওহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরু বিব্রত স্বরে বললেন,

-হযরত, কেন আমাদেরকে শরমিন্দা করছেন! কেউ আসবে না!

ক্বারী সাহেবের জান্নাতী সুর আর কুরআনের অলৌকিক ছোঁয়ায় সবাই এতক্ষণ অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। অন্যসব ধর্মগ্রন্থ মানুষের বানানো। সমাবেশের প্রতিটি মানুষই বুঝতে পারছিল, কুরআনের পাশে অন্য কোনো গ্রন্থ বড্ড বেমানান লাগবে। হাস্যকর ঠেকাও বিচিত্র কিছু নয়। তাই কেউ সাহস করে এগিয়ে আসেনি। কুরআন কারীম এসে বিশ্বের সমস্ত ধর্মমতকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তার একটা বাস্তব প্রমাণ সেদিনের সমাবেশ!

প্রশ্নবাণ-বাক্যবাণ

গড়পড়তা হিশেবে আমাকে মোটামুটি ধার্মিকই বলা চলে। মানে, বাহ্যিক আচার-বিচারে আরকি! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতো আদায় করতাম। নিয়মিত রোযা রাখতাম। পর্দা-পুশিদা ঠিকমতো পালন করতাম। মা-বাবা থেকেই ধার্মিকতা শিখেছি। ভালো একটা বিয়ে হলো। স্বামীটাও পেয়েছিলাম মনমতো। সহজ-সরল! আন্তরিক। ধার্মিক। সহানুভূতিশীল। সুখের ছিল আমাদের ছোট সংসারটা। আজ বুঝতে পারি, আমার দোষেই সংসারটা ভেঙেছে!

□□□□

আম্মুর কাছ থেকে একটা বিষয় আমার স্বভাবের মধ্যেও এসে গিয়েছিল। আম্মু খুবই ধার্মিক মহিলা। তা সত্ত্বেও তিনি আব্বুর সাথে ঝগড়া করতেন। অপ্রয়োজনে রাগ দেখাতেন। অহেতুক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। যেসব বিষয় তার জানার প্রয়োজন নেই, সেসবের খুঁটিনাটি জানতে চেয়ে আব্বুকে নাজেহাল করে ছাড়তেন! আম্মুর দেখাদেখি আমিও রীতিমতো বাচালে পরিণত হলাম। ভাইবোন, বান্ধবী মহলে আমি তর্কবাগীশ মেয়ে হিশেবে পরিচিতি পেয়ে গেলাম। স্কুলে ম্যাডামদেরকে নানা অমূলক প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়তাম! কিছু জানার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করা!



বিয়ের পর স্বামীর সাথেও একই আচরণ করতে শুরু করলাম। কোনো কারণ ছাড়াই তাকে সন্দেহ করে অসংখ্য প্রশ্ন করতাম। আবার নিজের কথাও সবকিছু তাকে খুলে বলতাম। আবু-আম্মুর কথাও কিছু বলতে বাদ রাখিনি! তিনি প্রথম প্রথম ভীষণ অবাক হতেন। হুঁ হাঁ করে শুনে যেতেন।

আমি মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে পেটের সব কথা উজাড় করে দিতাম। বান্ধবীদের কাছে শোনা কথা, তারা স্বামীদের সাথে কী কী কৌশল অবলম্বন করে সবই উগড়ে দিতাম। তারা কিভাবে মিথ্যা বলে বলে স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে, কিভাবে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বাবার বাড়ি আসে, স-ব বলতাম! এভাবে কিছুদিন পর দেখি, স্বামীর আচরণে কেমন যেন সন্দেহ সন্দেহ ভাব! একদিন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন,

-তুমি আমার সাথে কী কী কৌশল অবলম্বন করো?

তার প্রশ্ন শুনে আমি চমকে গেলেও, বেশি কিছু আঁচ করতে পারিনি। এভাবে দিনদিন তার সন্দেহের মাত্রা বেড়ে চলল! আমি প্রশ্ন করলে আগের মতো সাড়া পাই না। আমি জেরা করতে চাইলে তিনি রাগ করে এড়িয়ে যেতেন। আমি আরো নাছোড়বান্দী হয়ে পিছু লাগতাম!



সম্পর্ক দিনদিন খারাপ হতে শুরু করল। তিনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। তার ধারণা, আমি তার সাথে অভিনয় করি, গোপনে অন্য কিছু করি! প্রথম প্রথম রাগারাগি! তারপর অভিমান! তারপর মুখ দেখাদেখি বন্ধ! তারপর রেগেমেগে বাবার বাড়ি! তিনি আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনতে লাগলেন। আমি উত্তর দিতে গেলে, আমি আগে তাকে যেসব কথা বলেছি, সেসব থেকেই তিনি আমাকে পাল্টা যুক্তি দিতেন!

দু'পক্ষের কেউ আপোষ করতে রাজি নয়। ফলে বিরোধের পারদ আরও চড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলেন, এ-বিয়েটা রাখবেন না। তালাকনামা পাঠালেন। আমি তখনো নিশ্চিত মনে ভাবতাম, লোকটা জালেম। নির্দয়। অবিবেচক! অহংকারী!



ছেলেপিলে হয়নি, তাই আবার বিয়েতে তেমন বাধা রইল না। তবে আগে একবার বিয়ে হওয়াতে খুব ভালো পাত্র জুটবে না, এটা ভেবেই আবু-আম্মু ঝোঁজ-খবর করতে লাগলেন। এর সূত্র ধরে আমার এক দূরসম্পর্কের ফুফু আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে জানতে চাইলেন, আগের বিয়েটা কেন ভেঙেছে? আমি সব খুলে বললাম! তিনি ছিলেন শিক্ষিতা! তিনি বললেন,

-তোমার বিয়ে ভাঙার পেছনে দুটি কারণ কাজ করেছে!
একথা বলে তিনি আমাকে দু'টি আয়াত পড়ে শোনালেন!
প্রথম আয়াতটা ছিল,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে
যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। (কাফ: ১৮)

-তোমার প্রথম সমস্যাটা কি ধরতে পেরেছ?

-জি না।

-তোমার প্রথম সমস্যা হলো অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। তুমি যা-ই বলবে, আল্লাহর ফিরিশতারা সেটা লিখে রাখবেন। মানুষের মনেও তোমার কথার রেশ থেকে যাবে। কার্যকালে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে। যেমনটা তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে!

দ্বিতীয় আয়াতটা হলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن شَيْءٍ إِن تَبَدَّلَ كُفْرًا تَسْأَلُوهُ

হে মুমিনগণ, তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে! (মায়িদা: ১০১)

-আচ্ছা বলো তো, বিয়ে ভাঙার পেছনে দায়ী কে?

-কে আবার, ওই জালিম লোকটা!

-তোমার কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়।

-কেন? আমি তো বিয়ে ভাঙতে চাইনি! সেই তালাকনামা পাঠিয়েছে।

-আরে, তালাকনামা তো অনেক পরের কথা! তালাকনামা পাঠানোর পটভূমিটা তো আগে জানা দরকার! তুমি গড়গড় করে সব কথা স্বামীর সাথে শেয়ার করতে! উচিত-অনুচিত সব! আমি বলছি না তুমি স্বামীর সাথে দ্বিচারিণীর ভূমিকা পালন করো। আমার কথা হলো, তুমি নিজের মা-বাবার কথা, তোমার বান্ধবীদের কথা স্বামীর কাছে বলার কোনো দরকার ছিল না! এই করে করে তুমি তার মনকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছ! সাথে সাথে তুমি অপ্রয়োজনীয় খবরদারি করতে গিয়ে তার মনকে বিধিয়ে তুলেছ! তুমি একজন পর্দানশীন, নামাযী, কিন্তু ধর্মপালন বলতে এটুকুই সব নয়, ধার্মিক হতে হলে আচরণ, মুখ-চিন্তাতেও ধার্মিক হতে হয়! এককথায় বলতে গেলে, তোমার এই দুর্ভাগ্যের কারণ হলো তোমার 'মুখ'!

কুরআনী সুবাস

ইমাম আসেম রহ.। কুফার অধিবাসী। আমরা তার বর্ণনাকৃত কেরাতেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত করি। সব সময় কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন কারীমের মশক নিয়েই মশগুল থাকতেন। তার মুখ থেকে অপূর্ব এক সুবাস বের হত। আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে ভাবত, এ-কী করে সম্ভব? তিনি কি কোনো সুগন্ধি দ্রব্য পান করেন? খাবারের মধ্যে কোনো সুবাস মিশিয়ে দেন? মুখে সুগন্ধি কোনো কিছু রেখে দেন? নইলে এমন মুগ্ধকর অপার্থিব সুবাস কোথেকে বের হয়?

□

তার কাছে কুরআন শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগেই থাকত। পুরো মুসলিম বিশ্ব থেকেই কুরআন প্রেমিকরা দলে দলে আসত। আল্লাহ তা'আলা তার কেরাতকে জীবদ্দশাতেই কবুল করে নিয়েছিলেন। আর এখন তো সারা বিশ্বে কিছু এলাকা ছাড়া, বাকি সব জায়গায় তার কেরাতেই কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

ছাত্রদের মধ্যে কানাঘুসা চলছে, কীভাবে এই রহস্য ভেদ করা যায়! একদিন সাহস করে শায়খের কাছে প্রশ্ন করে বসল। শায়খ সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। ছাত্ররা হাল না ছেড়ে লেগে থাকল। শেষে শায়খ এড়াতে না পেরে বললেন, -এক রাতে স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, আসেম, তুমি দিনরাত কুরআন কারীম তিলাওয়াত কর! কুরআন নিয়ে মেহনতে মাশগুল থাক, আমার খুব ভালো লাগে! কাছে এসো, যে ঠোঁট দিয়ে তুমি সারাদিন কুরআন কারীম তিলাওয়াত করো, তাতে একটা চুমু ঐকে দেই!

এরপর থেকেই আমার ঠোঁট থেকে সব সময় সুগন্ধ বের হতে শুরু করেছে।

প্রভূত কল্যাণ

-হুজুর! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

স্ত্রীদের সাথে সম্ভাবে জীবন যাপন করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ, তবে এর সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।
(নিসা: ১৯)

আমার স্ত্রী প্রচণ্ড ঝগড়াটে! উঠতে-বসতে ঝামটা মারে! জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! মনে হয় সংসার ছেড়ে পালিয়ে বনবাসে চলে যাই!

-আরে, থামুন! থামুন! আপনিও তো কম যান না দেখছি! সত্যি সত্যি বলুন! আপনার স্ত্রী যখন শুরু করে, তখন আপনি কী করেন? পাল্টা জবাব দেন নিশ্চয়ই?

-আল্লাহ আকবার! হুয়র এ কী বলছেন আপনি! তাহলে আমি আপনার কাছে এভাবে অক্ষত আসতে পারতাম!

-একহাতে কি তালি বাজে! তাহলে আপনি তখন কী করেন?

-বিড়বিড় করে একটা দু'আ পড়তে থাকি!

-কোন দু'আ?

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট! তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক!

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

-এতে কাজ হয়?

-ওরে আল্লাহ রে, সে আরো ক্ষেপে যায়!

-কেন?

-সে বলে, কীইহুইহ! চুপিচুপি আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে না! দেখাচ্ছি মজা! এই বলে সে প্রতিবারই রান্নাঘরের দিকে যায়! আমি পড়িমরি করে বাইরে চলে আসি! আজও এটা ঘটেছে!

-এখন বাড়ি যাবেন কীভাবে?

-একটু পরে তার রাগ পড়ে যাবে! তখন এমন ভাব করবে যেন কিছুই হয়নি!

-আচ্ছা আচ্ছা, এই তো পেয়েছি!

-কী পেয়েছেন?

-কেন, প্রভূত কল্যাণ (خَيْرٌ كَثِيرًا)!

-কিভাবে পেলেন? কোথায় পেলেন? আমি তো প্রভূত অকল্যাণ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

-আচ্ছা বলুন তো, আপনি দু'আটা দিনে কয়বার পড়েন?

-অসংখ্যবার! যতক্ষণ বাড়ি থাকি, পড়তেই থাকি!

-এখনো প্রভূত কল্যাণের ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

ମାଦରାଆତୁଳ ଆସିଷ୍ଟା

সূচি

মাদরাসাতুল আশিয়া: দুই নবী, মিল ও অমিল	১৬৩
মাদরাসাতুল আশিয়া: কারেক্টাস্টিকস অব লীডার!	১৮০
মাদরাসাতুল আশিয়া: কারেক্টাস্টিকস অব প্রাইম মিনিষ্টার!	১৮৫
মাদরাসাতুল আশিয়া: মুহসিন	১৯০
মাদরাসাতুল আশিয়া: বউয়ের খোঁজে	১৯৩
মাদরাসাতুল আশিয়া: মানিয়ে নেয়া	১৯৫
মাদরাসাতুল আশিয়া: কুতুফুহা দানিয়া	১৯৬
মাদরাসাতুল আশিয়া: শুকরান, ইউসুফ আ.!	২০৪
মাদরাসাতুল আশিয়া: ইউসুফী সৌন্দর্য	২১৪
মাদরাসাতুল আশিয়া: নবীওয়ালা সুনত	২১৪
মাদরাসাতুল আশিয়া: মাদরাসাতু ইউসুফ	২১৬
মাদরাসাতুল আশিয়া: নবীর আদর্শ	২১৬
মাদরাসাতুল আশিয়া: সুচিন্তা	২১৭
মাদরাসাতুল আশিয়া: আশাবাদ	২১৮
মাদরাসাতুল আশিয়া: অপত্য স্নেহ	২১৯
মাদরাসাতুল আশিয়া: স্বপ্নের সূরা	২১৯
মাদরাসাতুল আশিয়া: ফেরতযোগ্য পণ্যমূল্য	২১৯
মাদরাসাতুল আশিয়া: মনোচিকিৎসা	২৩০
মাদরাসাতুল আশিয়া: মেধাবী নির্বোধ	২২৩
মাদরাসাতুল আশিয়া: ফির'আওন	২২৫
মাদরাসাতুল আশিয়া: ট্রিনিটি	২২৮
মাদরাসাতুল আশিয়া: প্রোপাগান্ডা	২৩১
মাদরাসাতুল আশিয়া: অসহনীয় তিন	২৩২
মাদরাসাতুল আশিয়া: ইলমী সফর	২৩৪
মাদরাসাতুল আশিয়া: দু'আ ও কর্মকৌশল!	২৩৫
মাদরাসাতুল আশিয়া: উল্টোপিঠ	২৩৬
মাদরাসাতুল আশিয়া: সাতটি চাওয়া	২৩৭

দুই নবী, মিল ও অমিল

দীর্ঘদিন ধরে, কুরআন কারীমের বেশ কিছু বিষয় জানার আশ্রয় চেষ্টা করে আসছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, তার মধ্যে মোটামুটি গুছিয়ে এসেছে তিনটি বিষয়। গোছানো তথ্যগুলোকে লিখিত রূপদানের কাজও শুরু হয়েছে।

৩০ক. ইউসুফ আ. ও মুসা আ.-এর ঘটনার মিল ও অমিল খুঁজে বের করা। সূরা ইউসুফ ও সূরা কাসাসের আলোকে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকগুলো লেখা পড়ে, লেকচার শুনে, সরাসরি কুরআন কারীম খুলে, লেখাটা কোনও রকম দাঁড় করানো গেছে।

৩০খ. আমরা কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে, প্রায় ৮০টিরও বেশি আয়াতে দেখি, ঈমান আনার সাথে সাথে 'আমালে সালেহ' বা নেক আমল করার কথা বলা হয়েছে। ভীষণ কৌতূহল ছিল, আমলে সালেহগুলো আসলে কি? কুরআন কারীমে কোন কোন আমলে সালেহ উল্লেখ আছে? আলহামদুলিল্লাহ, এই বিব্যক লেখাটা প্রায় গুছিয়ে এসেছে। কুরআনি আমলে সালেহ এর তালিকাটা সামনে থাকলে, আমলের একটা লক্ষ্যমাত্রা সামনে থাকবে বৈ কি।

৩০গ. বাকী যে লেখাটা নিয়ে ভীষণ হিমশিম খাচ্ছি, সেটা হল, আগের যুগে আল্লাহ তা'আলা কয়টা কওমকে ধ্বংস করেছেন, কিভাবে করেছেন, কেন করেছেন, কোথায় করেছেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করা। আলহামদুলিল্লাহ, পড়াশোনা ও চিন্তায় গোছানোর কাজ শেষ। শুধু লেখার অক্ষরে তুলে আনা বাকি। বেশি লম্বা করা যাবে না, তাহলে বিষয়টা পাঠায়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আবার সংক্ষেপে শেষ করাও সম্ভব নয়। লেখাটা সামনে থাকলে, সতর্ক থাকতে সুবিধা হবে, আমার মধ্যে, অতীতে গয়বগ্রন্থ কাওমের কোনও 'বদগুণ' আছে কি না।

ইউসুফ ও মুসা (আ)। একজন পূর্বপুরুষ। আরেকজন অধস্তন পুরুষ। একজন পূর্বসূরী। আরেকজন উত্তরসূরী। উভয়ের জীবনে বেশ কিছু বিষয়ে বিস্ময়কর মিল দেয়া যায়। অমিলও আছে। ইউসুফ আ.-এর ঘটনাকে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে 'আহসানাল কাসাস'। আবার মুসা আ.-এর ঘটনা যে সূরায় বেশি করে উল্লিখিত হয়েছে, তার নাম 'কাসাস'।

ইউসুফ ও মুসা, কুরআন কারীমের বহুল আলোচিত দুই ব্যক্তিত্ব। দুই মহান নবী। ইউসুফ আ.-এর আলোচনা সূরা ইউসুফে আলোচিত হয়েছে। এর বাইরে সূরা আনআমে একবার এসেছে। কিন্তু মুসা আ.? তিনি বলতে গেলে পুরো কুরআন জুড়ে আছেন। এ-দুইজন নবী সম্পর্কে জানা মানে,

- ক. কুরআন কারীমের বড় বড় দুটি সূরা (ইউসুফ কাসাস) সম্পর্কে জানা।
- খ. কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতের সাথে সম্পর্ক হয়ে যাওয়া।
- গ. কুরআন কারীম তাদাব্বুরের সাথে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা।
- ঘ. কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও সূরার তুলনামূলক পাঠে অভ্যস্ত হওয়া।

সূরা ইউসুফ ও সূরা কাসাসকে সামনে রাখলে, দুই নবীর কিছু মিল ও অমিল সামনে উঠে আসে,

শ্র(১). দু'জনের ঘটনার সাথে মিসর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শ্র(২). দু'জনেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

শ্র(৩). দু'জনকে ইলকা (القاء) বা নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

ক. একজনকে গভীর (الجب) কূপে।

খ. একজনকে ইয়াম্মে (اليم) দরিয়াতে।

গ. ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ঘনাপূর্ণ হাত দ্বারা।

وَالْقُوَّةُ فِي غَيَابَتِ الْجَبِّ

তবে তাকে কোনও গভীর কুয়ায় ফেলে দাও (ইউসুফ ১০)।

ঘ. মুসা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ভালোবাসাপূর্ণ হাত দ্বারা।

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর ভয় পেও না ও দুঃখ করো না (কাসাস ৭)।

ঙ. দুই ইলকা (القاء) বা নিক্ষেপের মাধ্যে পার্থক্য ছিল।

চ. ইউসুফ আ.-কে গভীর কূপে ফেলার কারণ ছিল চরম ঘৃণা আর প্রচ-বিদ্বেষ। ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ভাইদের ঘৃণাপূর্ণ হাতে।

ছ. মুসাকে দরিয়ায় ফেলার মূলেও ছিল, ফেরআওনের জুলুম। অবশ্য মুসাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিল মায়ের গভীর ভালোবাসা আর মমতামাখা হাত।

জ. ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপের পেছনে ছিল মানবীয় পরিকল্পনা।

ক. মুসাকে দরিয়ায় ফেলার পেছনে ছিল 'ইলাহী' দিক-নির্দেশনা।

১৪(৪). দু'জনেই বেড়ে উঠেছেন রাজপ্রাসাদে। ইচ্ছত-সম্মানে। আদর-গত্রে।
পরম মমতায়। তবুও,

ক. ইউসুফের আক্সু ইয়া'কুব আ. ছিলেন সন্তানকে হারিয়ে গভীরভাবে
শোকাহত।

ক. মুসার মাও ছিলেন সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে ভীষণ চিন্তিত।

১৫(৫). রাজপ্রাসাদে বড় হলেও, দু'জনের প্রতিপালনে আগ্রহী এক ছিলেন না।

ক. ইউসুফের প্রতিপালনে আগ্রহী ছিলেন স্বামী। আযীয়ে মিসর।

ক. মুসার প্রতিপালনে আগ্রহী ছিলেন স্ত্রী। ফেরআওনের সহধর্মিণী আসিয়া।

১৬(৬). দুই প্রাসাদে স্ত্রীদ্বয়ের ভূমিকায় তফাৎ ছিল।

ক. ইউসুফের প্রাসাদককত্রী ছিলেন কষ্ট আর বিপদের উৎস। কালক্রমে
একজন হতে চেয়েছেন 'বিশেষ সঙ্গী'।

ক. মুসার প্রাসাদকত্রী ছিলেন নিরাপত্তা আর শান্তির উৎস। শুরু থেকেই তিনি
হতে চেয়েছেন একজন মা।

১৭(৭). দু'জনেই যৌবনে উপনীত হয়ে নবুওয়াত লাভ করেছেন। দু'জন
সম্পর্কে কুরআন কারীমের বক্তব্যও প্রায় এক,

ক. ইউসুফ আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত
ও ইলম দান করলাম। যারা সৎকর্ম করে, এভাবেই আমি তাদেরকে
প্রতিদান দিয়ে থাকি (ইউসুফ ২২)।

ক. মুসা আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

যখন মুসা বলবত্তায় উপনীত হল ও হয়ে গেল পূর্ণ যুবা, তখন আমি
তাকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। যারা সৎকর্ম করে, এভাবেই
আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি (কাসাস ১৪)।

একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে, দু'জনের যৌবন প্রাপ্তি ও নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে বলা
হল, কিন্তু মুসা আ.-এর ক্ষেত্রে (استوى) শব্দটা কেন বাড়ানো হল? উত্তরে কেউ
কেউ বলেছেন,

ইস্তেওয়া (الاستواء) শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ আছে। মানুষের গঠন সম্পর্কে শব্দটা ব্যবহৃত হলে তখন অর্থ হবে, শারীরিক গঠন ও শক্তিমত্তায় পূর্ণতায় পৌঁছা। মুসা আ.এর শারীরিক গঠনে বিশেষত্ব ছিল। তিনি সাধারণের চেয়ে লম্বা ছিলেন। তার শারীরিক শক্তিও অন্যদের তুলনায় বেশি ছিল। সূরা কাসাসের তিনটা আয়াতে তার শক্তিমত্তার কথা ফুটে উঠেছে,

৞(ক). কিবতী ও ইসরায়েলীর ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন। তখন অনিচ্ছাকৃত ঘুমির আঘাতে কিবতি মারা পড়েছিল (১৫)।

৞(খ). আত্মরক্ষার্থে মিসর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। পুরুষদের ভীড়ে নিজের মেষকে পানি পান করাতে পারছেন না। এগিয়ে গিয়ে একাই পানি পান করানোর ব্যবস্থা করলেন (২৪)।

৞(গ) ঘরে ফিরে এক মেয়ে পরদেশীর মহাবুভবতার কথা বাবাকে বললেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, একজন মজদুর এমন (القَوِيُّ) শক্তিশালী হওয়া উচিত (২৬)।

পক্ষান্তরে ইউসুফ আ.-এর জীবনে শক্তিমত্তার দিকটা সামনে আসেনি। তার তাকওয়া ও রাষ্ট্রপরিচালনার দিকটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

৞(৮). আবু ও আম্মু সন্তান হারিয়ে শোকাহত। কুরআন কারীমে দু'জনের চিত্রই আছে।

৞ক. ইয়া'কুব বলেছেন,

يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسُفَ وَابْنُ عِثْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

আহা ইউসুফ! আর তার চোখ দু'টি দুঃখে (কাঁদতে কাঁদতে) শাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল (ইউসুফ ৮৪)।

৞খ. মুসার আম্মু সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا

এদিকে মুসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল (কাসাস ১০)।

৞(৯) ভাই-বোনের কাছ থেকে দু'জনে দু'রকম আচরণের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ক. ইউসুফকে ভায়েরা কষ্ট দিয়েছিল। কূপে ফেলে দিয়েছিল।

খ. মুসাকে তার বোন সাহায্য করেছিল। পিছু পিছু এসেছিল।

১০(১০). দু'জনের অভিভাবকই সন্তানকে ফিরে পেতে উদ্যোগী হয়েছেন।
কক. মুসার মা তার বড়বোনকে পাঠিয়েছেন,

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ

মুসার মা তার বোনকে বললেন, শিশুটির একটু খোঁজ নাও (কাসাস ১১)।

কখ. ইয়াকুব হারানো ছেলের অবস্থান আঁচ করতে পেরে, ভাইদেরকে তার সন্ধান পাঠিয়েছেন,

يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ

ওহে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও (ইউসুফ ৮৬)।

১১(১১) দু'জনেই নিজ সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। দু'জনকেই আল্লাহ তা'আলা সন্তান হারানোর আগে আশ্বাস দিয়েছেন, তারা সন্তান ফিরে পাবেন।

কক. ছেলের স্বপ্ন থেকেই ইয়াকুব বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছেলে বড় হয়ে নবী হবেন। তাই বড় ছেলেদের কথা বিশ্বাস করেন নি।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ইয়াকুব বললেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহর কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না (৮৬)।

কখ. মায়ের মন তো, তাই ছেলের সামান্যতম বিচ্ছেদও সহ্যে পারেন নি।

إِنَّا رَأَوْهُ إِلَيْنِكَ وَجَاءَ عَلَوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

বিশ্বাস রেখ, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং রাসূলগণের মধ্য হতে একজন রাসূল বানিয়ে দেব (কাসাস ৭)।

কগ. ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আগে, আল্লাহ বাবাকে পূর্বাভাস দিয়েছেন,

وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيسَى قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَقْبَدُونِ

যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বললেন, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি (৯৪)।

কঘ. মায়ের সাথে যেন ছেলের শিঘ্রি দেখা হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থা নিলেন,

وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

আমি পূর্ব থেকেই ধাত্রীদুগ্ধ গ্রহণে তার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম। শেষে মুসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব, যারা তোমাদের পক্ষ হতে এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী (১২)।

৷(১২) প্রাসাদে প্রতিপালিত হলেও, পরবর্তীতে দু'জনের সাথে প্রাসাদবাসীর টক্কর লেগেছে। পরিণতি অবশ্য দু'জনের দু'রকম হয়েছে।

৷ক. প্রাসাদে আনীত হয়েছেন। বড় হয়েছেন। গৃহকর্তীর সাথে টক্কর লেগেছে। জেলে গেছেন। পরে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সসম্মানে ফিরেছেন। স্বীকৃতি পেয়েছেন, রাজা ঘোষণা দিয়েছেন,

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে, তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে (৫৪)।

৷খ. রাজার দুলালের মতো বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু বড় হওয়ার পর পালকপিতার সাথে টক্কর লাগল। দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন। আবারও টক্কর লাগল। আবারও দেশ ছাড়লেন। রাজা তাকে ধাওয়া করে পিছু পিছু এলেন। মুসার সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেল,

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ الْمَذْرُوءَ

তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব (শু'আরা ৬১)।

৷(১৩). উভয়েই যৌবনে উপনীত হওয়ার পর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

৷ক. ইউসুফ সম্মুখীন হয়েছিলেন নারীর রূপের ফিতনার। ফিতনায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলে গিয়েছিলেন।

৷খ. মুসা সম্মুখীন হয়েছিলেন কিবতীহত্যার ফিতনায়। যার ফলে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

৷(১৪). ইউসুফের ঘটনায় বাবার কথা সরাসরি আলোচিত হয়েছে। মায়ের কথা আলোচিত হয়নি। শুধু একবার পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ

সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল (১০০)।

অপর দিকে মুসার ঘটনায় মায়ের কথাই আলোচিত হয়েছে। বাবার প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবেই আসেনি।

১(১৫). দু'জনের ঘটনাতেই একজন বয়োবৃদ্ধ (شَيْخٌ كَبِيرٌ)-এর কথা আলোচিত হয়েছে।

ক. মুসা আ.এর ঘটনায় দুই বোন বলেছেন (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ (২৩)। ইনি মুসার স্বশুর।

খ. ইউসুফের ঘটনায়, ভাইয়েরা বলেছে (إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا) এর অতিশয় বৃদ্ধ এক পিতা আছেন (৭৮)। ইনি ইউসুফের পিতা।

১(১৬). দু'জনেই উন্নত চরিত্রের চরম পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

ক. ইউসুফ আ. মিসরশাসকের স্ত্রীর প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। তার ছলনায় ধোঁকা খাননি। নিজেকে হারামে জড়াননি।

খ. মুসা মাদইয়ানে গিয়েছেন। দু'টি যুবতী মেয়েকে দেখেও তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন। ভব্যতার সীমা ছাড়াননি।

১(১৭). সূরা ইউসুফে আলোচিত হয়েছে ইউসুফ আ.-এর ঘটনা। সূরা কাসাসে আলোচিত হয়েছে মুসা আ.-এর ঘটনা। দুটি সূরাই শুরু হয়েছে হুরূফে মুকাত্তা'আত দিয়ে। আয়াতের পরের অংশও হুবহু এক,

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

এগুলো সত্যকে পরিস্ফুটকারী কিতাবের আয়াত।

১(১৮). দু'জনকেই কূপে ফেলা হয়েছিল। দু'জনের ক্ষেত্রেই ইলতিকাত কুড়িয়ে পাওয়া বা কুড়িয়ে নেয়া শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে,

ক. ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে বলল, তাকে কূপে ফেলে দাও,

يَكْتُمُوهُ بَعْضُ السَّيِّئَةِ

যাতে কোনও কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যায় (১০)।

খ. মুসাকে দরিয়ায় ফেলা হল। ভাসতে ভাসতে ফেরআওনের প্রাসাদের কাছে গেলেন,

فَالْقَطْعُ أَلْفِرْعَوْنَ

অতঃপর ফির আওনের লোকজন তাকে তুলে নিল (৮)।

৫(১৯). দু'জনের ঘটনাতেই কয়েকটা বিষয়ের প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান।

ক. শোক বা (حزن) হুয়ন।

খ. ভয় বা (الخوف) খাওফ।

গ. নিরাপত্তা বা (الأمن) আমন।

ইউসুফের ঘটনায় হুয়নের প্রভাব তুলনামূলক বেশি।

ক. ভাইয়েরা বাবার কাছে বায়না ধরল, ইউসুফকে সাথে নিয়ে যাবে। বাবা বললেন,

إِنِّي لَيُخْزِنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ

তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার (বিরহজনিত) কষ্ট হবে। এবং

আমার এই ভয়ও আছে (وَأَخَافُ) যে, নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে

ফেলবে (১৩)।

খ. আগে হারিয়েছিলেন ইউসুফকে। এবার বড় ছেলেও মিসর ছেড়ে এল না। ছোট ছেলে বিন ইয়ামীনও আসেনি। বৃদ্ধ বাবার দুঃশোক আবার নতুন করে তাজা হল। ইউসুফের কথা মনে পড়তে লাগল। আহা ইউসুফ!

أَيُّصْثَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ

তার চোখ দু'টি দুঃখে (কাঁদতে কাঁদতে) শাদা হয়ে গিয়েছিল (৮৪)।

গ. ইউসুফকে হারিয়েছেন কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনো বৃদ্ধ পিতা সন্তানের জন্যে কাঁদছেন। বড় ছেলেরা বলল,

ثَالِهٌ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না

আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন (৮৫)।

ইয়া'কুব সন্তানদের কথায় দমে গেলেন না। সন্তানহারা পিতার শোক কি কারো কথায় প্রশমিত হয়? তিনি বললেন

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহর কাছেই করছি (৮৬)।

ঘ. অধিকাংশ মানুষই আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও, তার সাথে শিরক করে এমন মানুষকে হুমকি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ

তবে কি তারা এ বিষয়ের একটুও ভয় রাখে না যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাবের কোনও মুসিবত এসে পড়বে (১০৭)।

অপর দিকে মুসা আ.-এর ঘটনাতেও শোকের হাহাকার আছে। তবে ইউসুফের তুলনায় কম। ভয়ের আলোচনা তুলনামূলক বেশি।

৩৩ক. একটা আয়াতে মায়ের মনোবেদনা ফুটে উঠেছে।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا

এদিকে মুসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল (১০)।

৩৩খ. মুসার জন্ম হল। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মাকে বললেন, দুধ পান করাতে। তারপর,

فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَإِلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي

যখন তার ব্যাপারে কোনও আশঙ্কা বোধ করবে, তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর ভয় পেও না ও দুঃখ করো না (৭)।

৩৩গ. ঘুঘি খেয়ে কিতবী মারা যাওয়ার পর, নিরাপত্তাজনিত সংকট দেখা দিল। তখন

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

মুসা ভীতাবস্থায় পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে নগর থেকে বের হয়ে পড়লেন (২১)।

৩৩ঘ. ফিরআওনের হাত থেকে বাঁচতে মাদইয়ানে গেলেন। সেখানে দুই মেয়ের বাবা মুসাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন (لَا تَخَفْ) কোনও ভয় করো না (২৫)। আবার লাঠিটা যখন সাপে রূপান্তরিত হল, মুসা ভয় পেয়ে গেলেন, তখন খোদ আল্লাহ তা'আলাই (لَا تَخَفْ) বাক্যটা বলেছেন (৩১)।

৩৩ঙ. সাপ দেখে, হাত থেকে অকস্মাৎ আলো ঠিকরাতে দেখে, মুসা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে ভয় দূর করার উপায় বাতলে দিলেন,

وَأَضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

ভয় দূর করার জন্যে তোমার বাহ নিজ শরীরে চেপে ধর (৩২)।

৩৩চ. মুসাকে বলা হল, ফিরআওনের কাছে যাও। তাকে দাও। মুসা তখন দু'টি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন,

فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে ৩৩।

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে ৩৪।

৫(২০) দুই ঘটনায় দু'জন শায়খ। দু'জনেই একটা কথা বলেছেন,
ক. ছেলেরা বিন ইয়ামীনকে সাথে নিয়ে যেতে যাচ্ছে মিসরে। তাকে না নিলে
খাবার পাওয়া যাবে না। ইয়া'কুব সন্তানদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে শপথ
গ্রহণ করলেন, তারা বিন ইয়ামীনকে ফিরিয়ে আনবে। অঙ্গীকার গ্রহণ শেষ হলে
তিনি বলেছেন

اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

আমরা যা বলছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক (৬৬)।

খ. মুসাকে তার শ্বশুর আট বা দশ বছরের চুক্তিতে আসার আহ্বান
জানালেন। তিনি বক্তব্য শেষ করলেন একই বাক্য উচ্চারণ করে (২৮)।

৫(২১). আল্লাহ তা'আলা দু'জনকেই প্রতিষ্ঠা (الْمَكِين) দান করেছিলেন।

ক. জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার সাথে কথা বললেন। রাজা তার সাথে
কথা বলে মুগ্ধ হয়ে বললেন,

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে, তোমার
প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে (৫৪)।

খ. ইউসুফ দেশের দুরবস্থা দেখে রাজাকে বললেন

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত
করুন।

এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا خَيْشًا

এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে এমন ক্ষমতা দান করলাম
যে, সে সে দেশের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত (৫৬)।

গ. মুসাকেও আল্লাহ তা'আলা তামকীন দান করেছিলেন।

وَنَمَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ

আমি চাচ্ছিলাম সেদেশে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে (৬০)।

(২২) বুরহান (برهان) বা প্রমাণ দু'জনের জীবনেই বড় প্রভাব ফেলেছে।

কক. আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে মন্দকর্মের দিকে ফুসলাল।

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল,
যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত (২৪)।

কখ. গুহ্রহাত ও ভীতি দূরীকরণ,

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ

এ দু'টি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বলিষ্ঠ প্রমাণ (৩২)।

ক(২৩) দু'টি ঘটনাতেই সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্ব ছিল।

কক. ভাইয়েরা সন্ধ্যায় এসে বলল, ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। তারা মিথ্যা বলেছে, তবুও তারা দাবী করেছে,

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, আমরা যতই সত্যবাদী হই
(১৭)।

কখ. সন্ধ্যায় তারা জামায় (بَدِمَ كَذِبٌ) মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে এনেছিল।

কগ. প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিচারে, রায় দেয়া হয়েছিল,

-জামা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকলে,

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদী ২৬।

-জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকলে,

فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদী (২৭)।

কঘ. মুসা আ. একা একা ফিরআওনের দরবারে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন।
আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন, হারুনকেও আমার সাহায্যকারীরূপে পাঠিয়ে
দিন, যাতে সে (يُصَدِّقَنِي) আমার সমর্থন করে (৩৪)।

ক(২৪) দুই প্রজন্ম হলেও দু'জনের ঘটনায় অদৃশ্য এক যোগসূত্র আছে।

কক. ইউসুফকে বাজার থেকে কিনে নিয়েছেন আযীয (স্বামী)। মুসাকে নদী
থেকে তুলেছেন ফেরআওনের স্ত্রী। দুই অভিভাবকই একই কথা বলেছেন।

একজন বলেছেন স্ত্রীকে, আরেকজন বলেছেন স্বামী (ফিরআওন)-কে। কয়েক প্রজন্ম পরে। বাক্যটা হুবহু এক,

عَسَى أَنْ يَفْعَلْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। ইউসুফ ২১। কাসাস ৯।

৞খ. বাক্যটিতে দু'টি এখতিয়ার ছিল, উপকার লাভ অথবা সন্তান হিশেবে গ্রহণ। সূরা ইউসুফে উপকারের জন্যে গোলাম হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কাসাসে মুসাকে সন্তান হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। দুই এখতিয়ার দু'জায়গায় বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৞(২৫). দু'জনেই ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

৞ক. ইউসুফ 'ফিতনা' বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রাসাদে। নারীর ফিতনা (যিনার)। মুসা ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রাসাদের বাইরে। শক্তির ফিতনায় (হত্যার)।

৞খ. ইউসুফ নির্দোষ হয়েও জেলে গিয়েছেন। মুসা কিবতিকে হত্যা করেছেন। কিন্তু ফিরআওনের হাত থেকে বাঁচতে মিসর ছেড়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

৞গ. উভয় ঘটনার তদন্তে সাক্ষী তলব করা হয়েছে। ইউসুফের ঘটনায় সাক্ষ্য এসেছে পক্ষে। মুসার ঘটনায় সাক্ষ্য এসেছে বিপক্ষে।

৞(২৬) দু'জনেই বিপদে পড়েছিলেন। দুই ব্যক্তি দু'জনের মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল,

৞ক. ইউসুফ জেল গেলেন। দুই সঙ্গীকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। একজন রাজার সাক্ষি হল। সে রাজার কাছে ইউসুফের কথা বলল (৪৫)।

৞খ. কিবতী লোকটা ঘুষি খেয়ে মারা গেল। রাজার লোকেরা মুসাকে হত্যার ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করতে বসল। তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে মুসাকে সব জানিয়ে দিল (২০)।

দুই ব্যক্তিই ছিল রাজার লোক। দরবারের খবরাখবর সম্পর্কে অবগত।

৞(২৭). উভয় ঘটনা 'রকব' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

৞ক. ইউসুফ জেলে যাওয়ার আগে বলেছেন

رَبِّ الْجَنِّ أَخْبَأْنِي

হে প্রতিপালক, কারাগারই আমার বেশি পছন্দ (৩৩)।

৩৩খ. আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন,
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ

ইউসুফের প্রতিপালক তার দু'আ কবুল করলেন (৩৪)।

৩৩গ. কারাসঙ্গীদকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাতলে দিয়ে বললেন
ذِكْرًا مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

এটা সেই জ্ঞানের অংশ, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন
(৩৭)।

৩৩ঘ. দুই কারাসঙ্গীকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সময়ও বলেছেন
أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ

ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় নাকি আল্লাহ? (৩৯)।

৩৩ঙ. বাবা-মাকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, আব্বাজী! এই হল আমার
স্বপ্নের ব্যাখ্যা,

فَدَجَّلَهَا رَبِّي حَقًّا

যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন (১০০)।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা
করেন (১০০)।

৩৩চ. তারপর ইউসুফ (রَبِّ) বলে দু'আ করেছেন।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِنِّي بِالصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্বেও অংশ দিয়েছেন
এবং দান করেছেন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান। হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর
স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আপনি
দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিবেন, যখন আমি থাকি
আপনার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন (১০১)।

৩৩ছ. মুসা আ. প্রতি পদে পদে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন। ১৬-১৭-২১-
২২-২৪ মোট পাঁচবার। শেষটা তো বিখ্যাত দু'আ। দুই বোনকে পানির ব্যবস্থা
করে দিয়ে, গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে যা উচ্চারণ করেছিলেন।

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবেন
আমি তার ভিখারী (২৪)।

৷(২৮) সূরা কাসাসে মুসার কথা আলোচিত হয়েছে। সূরা ইউসুফের শুরুতেই
আছে,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

আমি আপনাকে উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি (৩)।

আর কাসাসে আছে, মুসা বৃদ্ধের কাছে পৌঁছে

وَقُصِّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ

তার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল (২৫)।

এই (قَصَص) শব্দমূলটা ইউসুফে এসেছে ৫ বার। কাসাসে দুই বার।

৷(২৯). পুরো ঘটনার দিকে চোখ বুলালে বোঝা যায়, ইয়াকুব আগে থেকে
জানতেন, সবকিছুর পরিণতি কোন দিকে গড়াবে। তিনি একটা বাক্য দুইবার
বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না (৮৬, ৯৬)।
তার মানে ইয়াকুবকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন। মুসার মাকেও আল্লাহ
আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ

অমি মুসার মাকে ইলহাম করলাম (৭)।

৷(৩০) উভয় সংকটের পেছনেই শয়তানের সক্রিয় ভূমিকা ছিল,
৷ক. কারাসঙ্গীকে বলেছিলেন, তার কথা যেন রাজার কাছে বলা হয়। কিন্তু

فَأَنسَأَ الشَّيْطَانُ

শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল (৪২)।

৷খ. ইসরাঈলি ও কিবতীকে মারামারি করতে দেখে, কিবতিকে ঘুষি মারলেন।
কিবতি মারা গেল। মুসা বুঝতে পারলেন, কাজটা অন্যরকম হয়ে গেল, তিনি
অনুতাপে বলে উঠলেন

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

এটা শয়তানের কাণ্ড (১৫)।

১২(৩১) দুই সূরাতেই 'পান' করার ব্যাপারটা আছে। সূরা ইউসুফে পানপান (السَّيِّئَةِ)-এর কথা আলোচিত হয়েছে। সূরা কাসাসে পান করানোর প্রসঙ্গ তিনবার এসেছে (২৩-২৪)।

১৩(৩২) কথা বলার ধরনও দুই গল্পে প্রায় এক। রাজা মহলের নারীদেরকে ডেকে এনে বললেন (مَا خَطْبُكُنَّ) তোমাদের কী অবস্থা হয়েছিল? (৫১)। মুসা মাদয়ানে এসে দেখলেন, দুই তরুণী পশুপাল আগলে রাখছে। তিনি জানতে চাইলেন (مَا خَطْبُكُنَّ) তোমরা কী চাও? (২৩)।

১৪(৩৩). উভয় ঘটনায়, নারী-পুরুষের সচ্চরিত্র আর অসচ্চরিত্রের চিত্র ফুটে আছে,

কক. ইউসুফের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রানী বলল (هَيْتَ لَكَ) কাছে এসো! ইউসুফ আঁতকে উঠে বললেন, (مَعَاذَ اللَّهِ) আল্লাহর পানাহ।

কখ. মুসাকে ডাকতে এলেন এক যুবতী, (تَنبِيْ عَلَى اسْتِخْيَارٍ) লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে (২৫)।

কগ. দুই ঘটনায় পুরুষের চরিত্র নিষ্কলুষ হলেও, নারীর চরিত্র ব্যতিক্রম। রাণী নির্লজ্জ আচরণ করেছে। অন্যদিকে দুই যুবতী দারুণ লজ্জাশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

১৫(৩৪). তাওহীদ ফিল হাকিমিয়াহ। হুকুম বা শাসনব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহরই হবে।

কক. হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)। ইউসুফ ৪০, ৬৭।

কখ. সবকিছুই ধ্বংসশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। (لَهُ الْحُكْمُ) শাসন কেবল তাঁরই (৮৮)।

১৬(৩৫). কুয়া ও পানি তোলার ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কক. ইউসুফ কূপে আটকে আছেন। যাত্রীদের পানির প্রয়োজন হল। (فَازْتَلَوْا) তারা তাদের একজন লোককে পানি আনতে পাঠাল (১৯)। (وَارْتَدُّوا)

কখ. মিসর থেকে বের হলেন। তারপর (وَرَزَّ مَاءَ مَدْيَنَ) মাদয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল।

৩৩গ. উভয়ের সংকটমুক্তি যেন কুয়া থেকে পানি তোলার সাথে আটপুঠ জড়িয়ে গেছে। একজন কুয়ার মধ্যে পড়েছিলেন, আরেকজন এসে তুলেছে। রাজার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। মুসা কুয়ার পাড়ে বসেছিলেন, একজন উদ্ধার করে এসে ঘরে বাবার কাছে ডেকে নিয়েছে।

৫(৩৬). জালিমদের পরিণতি সব সর্বকালে একরকমই হয়ে থাকে। ইউসুফ ও মুসা উভয়ের মুখ দিয়ে একই স্বগতোক্তি উচ্চারিত হয়েছে,

إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ

সত্য কথা হচ্ছে, যারা জুলুম করে তারা কৃতকার্য হয় না (ইউসুফ ২৩, কাসাস ৩৭)।

এ-বাক্যটা কুরআন কারীমে মোট চারবার এসেছে।

৫(৩৭). পূর্ববর্তীদের পরিণতি ও আখেরাতের প্রসঙ্গও এসেছে।

৩৩ক. পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখতে বলা হয়েছে, কেমন ছিল পূর্ববর্তীদের (عَاقِبَةُ) পরিণতি। মুত্তাকীদের জন্যে (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) আখেরাতের আবাস কতই না শ্রেয়। (ইউসুফ ১০৯)

৩৩খ. মুসা বললেন, উৎকৃষ্ট ঠিকানা (عَاقِبَةُ الدَّارِ) কে লাভ করবে, সেটা আমার রবই জানেন। (৩৭)

৩৩গ. কারুনকে বলা হল, তুমি তোমার সম্পদের মাধ্যমে (نَارُ الْآخِرَةِ) আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর। সে অহংকার করল (৭৭)।

৩৩গ. পরকালীন আবাস (الدَّارُ الْآخِرَةُ) ভালো মানুষদের জন্যে। (عَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ) মুত্তাকীদের জন্যেই উত্তম পরিণতি। (৮৩)

৫(৩৮). উসবাহ (عُصْبَةٌ) অর্থ দল। সূরা ইউসুফে এসেছে দুইবার (৮, ১৪)। ভাইদের যবানীতে। কাসাসে এসেছে একবার, কারুনের প্রসঙ্গে।

৫(৩৯). কল্যাণকামিতার ধরন এক হয় না। আন্তরিকও হতে পারে, অভিনয়পূর্ণও হতে পারে।

৩৩ক. বাবাকে আশ্বস্ত করতে, ভাইয়েরা বলেছে, (وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ) আমরা ইউসুফের পরম হিতাকাজী (১১)।

৩৩খ. দরবারের এক লোক এসে, মুসাকে বলল, তুমি শহর ছেড়ে বের হয়ে যাও, তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে, বিশ্বাস করো, (إِنِّي لَأَمِّنٌ لِّكَ مِنَ الْغَافِقِينَ) আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন (২০)।

গু. ভাইয়েরা ছিল ছদ্ম শুভাকাজী। দরবারী মানুষটা ছিলেন সত্যিকারের শুভার্থী।

৪(৪০). দুই সূরায় একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে,

ক. ইউসুফ আ.এর ঘটনা শেষ করে, নবীজি সা.-কে বলা হচ্ছে, আপনি বলে দিন, আমি (عَلَىٰ بَصِيرَةٍ) পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি (১০৮)।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি মুসাকে দিয়েছি (بَقَائِرَ لِّئَاسٍ) মানুষের জন্যে তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ কিতাব (৪৩)।

৪(৪১). একটা গুণ দুই নবীর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। দু'জনেই আমীন (أَمِينٌ) ছিলেন। এবং সেটার স্বীকৃতি অন্যদের মুখ দিয়েই বের হয়েছিল।

ক. ইউসুফকে আমীন বলেছিলেন রাজা। ইউসুফ ৫৪

খ. মুসাকে আমীন বলেছিলেন বৃদ্ধার কন্যা। কাসাস ২৬।

৪(৪২) উভয় সূরার শেষদিকে এসে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীজি সা.-কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

ক. সে অনুসারে নবীজি বলেছেন, আমি (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ) আল্লাহর দিকে ডাকি, পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে। (ইউসুফ ১০৮)

খ. আপনি আপনার রবের দিকে ডাকুন (وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ)। কাসাস ৮৭। বাক্যটা সূরা হজেও একবার এসেছে।

৪(৪৩). সংক্ষেপে আরও কিছু বিষয়,

১. সূরা ইউসুফে বাবার কথা। কাসাসে মায়ের কথা।

২. ইউসুফে ভাইদের কথা। কাসাসে বোনের কথা।

৩. ইউসুফে বাবা ছেলের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। কাসাসে মা।

৪. ইউসুফে বিচ্ছেদের কারণ ভাই। কাসাসে মিলনের কারণ বোন।

৫. ইউসুফে ঘটনা শুরু হয়েছে মিসরের বাইরে। শেষ হয়েছে মিসরে।

কাসাসে ঘটনা শুরু হয়েছে মিসরে। শেষ হয়েছে মিসর ত্যাগের মাধ্যমে।

৬. ইউসুফ প্রাসাদে বড় হয়ে ভবিষ্যতে প্রাসাদের অধিপতি হয়েছেন (৭৮)।

মুসা প্রাসাদে বড় হয়ে ভবিষ্যতে 'আরেকজনের মেঘচারক হয়েছেন (২৭)।

৩৮. ইউসুফের যুগের শাসককে রাজা (الْمَلِكُ) বলা হয়েছে (৪৩)। রাজা ইউসুফকে ভালোবাসতেন (৫৪)। একজন নবীকে ভালোবাসার প্রতিদান আগ্রাহ তা'আলা হাতেনাতে দিয়েছেন। ইউসুফ দেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচিয়েছেন। মুসার যুগের শাসককে ফেরআওন বলা হয়েছে (যুখরুফ ৫১)। ফিরআওন মুসা আ.-কে ঘৃণাবশত হত্যা করতে চাইত (গাফের ২৬)। এই ঘৃণার কারণে, আগ্রাহ তা'আলা ফিরআওনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (আ'রাফ ১৩০)

নবীগণের ঘটনা জেনে আমাদের কী লাভ? অনেক লাভ। কুরআন কারীমের নবীগণের ঘটনা বলার একটাই উদ্দেশ্য, আমরা যেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

কারেক্টারিস্টিকস অব লীডার

সূরা কাহফ আর সূরা ইউসুফ। প্রথম প্রথম মনে হয়, দুটোই গল্পবলা-দাদু সূরা। কিন্তু গল্পের আড়ালেই যে রীতিমতো 'গোল্ডমাইন'-স্বর্ণখনি লুকিয়ে আছে, মনোযোগ না দিলে বোঝা মুশকিল। আমাদের মাদরাসায় এখন তিনদিনব্যাপী কুরআন তরজমার বিশেষ এক কার্যক্রম চলছে। সূরা ইউসুফও আছে পাঠ্যসূচীতে। এ-সূরা পড়তে গিয়ে, আবারও মনে হলো, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে সূরাটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

□

জুমাবারে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করতে গিয়েও একই অবস্থা। কী সুন্দর গল্প। কী সুন্দর ইতিহাস! একজন নেতার কী কী গুণ-বৈশিষ্ট্য (কারেক্টারিস্টিকস) থাকতে হবে? যুলকারনাইন সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়লে বেশ কিছু চারিত্রিক ও বাহ্যিক গুণাবলী বের হয়ে আসে।

☞ এক. তামকীন। একজন নেতার তামকীন মানে সক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা থাকতে হবে। নিজের এলাকায় আইন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হতে হবে। প্রয়োজনবোধে অন্য এলাকায়ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার মত লোকবল থাকতে হবে। তবেই তাকে পরিপূর্ণ নেতা বলা যাবে।

إِنَّمَا كُنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ

আমি তাকে যমীনে (তামকীন) শক্তি-ক্ষমতা দান করেছিলাম। (৮৪)

□

☞ দুই. ইলম-জ্ঞান হলো অগ্রগমনের মূল সোপান। লক্ষ্যে পৌছতে হলে ইলম-প্রযুক্তি জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। একজন নেতাকে অবশ্যই জ্ঞান-ইলমের অধিকারী হতেই হবে। না হলে তার নেতৃত্ব বেশিদিন টিকবে না।

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًا

আমি তাকে সবকিছুর উপকরণ দিয়েছিলাম। (৮৪)

III

৩ তিন. ইলমকে কাজে পরিণত করা। ইলম শুধু শিখলেই চলবে না, তদনুযায়ী আমলও করতে হবে। কুরআন শুধু ইলমের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, সেটাকে কাজে পরিণত করার দিকেও জোর তাকিদ দিয়েছে। শুধু ইলম থাকাই একজন নেতার জন্য যথেষ্ট নয়, প্রায়োগিক দিকটাও অপরিহার্য।

فَاتَّبِعْ سَبِيلًا

সে একটি পথ (সবব)-এর অনুগামী হলো। (৮৫)

III

৩ চার. তাকওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। একজন নেতা চলবেন সুস্পষ্ট নীতির ওপর। তার সব কাজের ভিত্তি থাকবে আল্লাহর প্রতিদানের আশা ও আল্লাহর শাস্তির ভয়। নিজের চাহিদামত চলবেন না। প্রজাদেরকেও নিজের মতের ওপর ছেড়ে দিবেন না। তাদেরকেও প্রতিদান ও শাস্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করবেন। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

যুলকারনাইন, (তোমার সামনে দু'টি পথ আছে।) হয় তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে, নয়ত তাদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে! (৮৬)

III

৩ পাঁচ. আদল-ইনসাফ। ন্যায়বিচারই হলো সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত। জুলুম-অবিচার শুধু অশান্তিই ডেকে আনে। জালিমকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন। মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য।

أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ

আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন (জুলুম) করবে, তাকে আমি শাস্তি দেবো। (৮৭)

III

৩ ছয়. কর্মশক্তিবৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। ভালো কাজের স্বীকৃতি দিলে কর্মপ্রেরণাও বৃদ্ধি পায়। শিল্প-উৎপাদন বাড়ে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাজে নব প্রাণের সঞ্চার হয়। যুলকারনাইনের মধ্যে এ-গুণটা বিদ্যমান ছিলো।

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং আমিও আদেশ দানকালে তাকে সহজ কথা বলব। (৮৮)

III

সাত. ডায়ানামিক (বহুমুখী) তৎপরতা। একজন নেতা হবেন অত্যন্ত তৎপর। গতিশীল। উদ্যমী। কর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছা সঞ্চারণ করবেন। কেন্দ্রে বসে বসেই শুধু পরিচালনা করবেন না। স্থবির হয়ে থাকবেন না। তৃণমূল পর্যায়েও সশরীরে উপস্থিত হবেন। সংবাদবাহকের ওপর সব সময় নির্ভর করে থাকবেন না। যুলকারনাইন বলতে গেলে বিশ্বের এমাথা-ওমাথা চষে বেড়িয়েছেন। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের জন্য।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

যেতে যেতে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল...। (৮৬-৯০)

III

আট. যোগাযোগ ও অভিযোগ শ্রবণ। নেতা অবশ্যই অধীনস্থদের কথা শুনবেন। তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। প্রজা ও তার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে না। সর্বস্তরের মানুষের কথাই গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন। মুখোমুখি। ফেস টু ফেস। ওয়াজহান লি-ওয়াজহিন। মুবাসারাতান। সরাসরি।

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ

তারা বলল, ইয়া যুলকারনাইন!...। (৯৪)

প্রজারা বললো, আপনি ইয়াজুজ ও মাজুজ থেকে বাঁচার জন্য, আমাদের ও তাদের মাঝে একটা দেয়াল বানিয়ে দিন। আমরা আপনাকে এর বিনিময়ে কর দিবো। যুলকারনাইন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, সেটাই আমার জন্য শ্রেয়। তোমাদের কর দিতে হবে না। (৯৫)

এ-দুই আয়াতকে একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে কিছু বৈশিষ্ট্য বের হয়ে আসে।

III

নয়. অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করা। নেতার উচিত নয়, নিজের কাজের বিনিময়ে প্রজাদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু গ্রহণ করা, উৎকোচ নেয়া।

III

৩ দশ. দায়িত্ববোধ থাকা। নেতার মধ্যে অবশ্যই প্রখর টনটনে দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। প্রজার স্বার্থের প্রতি চৌকান্না থাকতে হবে। কোনো প্রকার প্রাণ্টিযোগের আশা ছাড়াই।

□

৩ এগার. পরিচর্যা হাত, নির্লোভ মন। নেতা প্রজাদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে, সুযোগ গ্রহণ করবেন না। প্রকল্প বাস্তবায়ন করার দোহাই দিয়ে তাদের সম্পদ লুট করার পায়তারা করবেন না।

□

৩ বারো. মাজলুমের সাহায্য। মাজলুমকে সাহায্য করা অপরিহার্য একটি কাজ। ধর্মীয় দায়িত্ব। এখানে আর্থিক হিশেব-নিকেশের কোনো স্থান নেই। যুলকারনাইন তাই করেছেন।

□

৩ তেরো. সামষ্টিক-যৌথ কাজ। একা একাই কাজে না নেমে, সবাইকে নিয়ে নামা। কাজে বরকত আসবে। গতি আসবে। যুলকারনাইন বলেছেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করো। (৯৫)

□

৩ চৌদ্দ. কর্মী বুঝে দায়িত্ববন্টন। সবার দ্বারা সব কাজ হয় না। একজন নেতাকে বুঝতে হবে কার কী ক্ষমতা! কার কী যোগ্যতা! যুলকারনাইন সম্প্রদায়ের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কায়িক শ্রম চেয়েছিলেন। জ্ঞান বা সম্পদের সাহায্য চাননি।

□

৩ পনের. সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান। নেতা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিবেন। তিনি কী চান, তা পরিষ্কার ভাষায় খুলে বলবেন। যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। যুলকারনাইন বললেন,

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও...। আওনে হাওয়া দাও...। (৯৬)

□

৩ ষোল. সম্পদ ও কাঁচামালের যথাযথ ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতিতেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে দেন। মানুষের উচিত, সেসব যথাযথ

কাজে লাগানো। যুলকারনাইন দেখলেন সে-সম্প্রদায়ের কাছে তামা ও পোহ আছে। তিনি তা দিয়েই প্রাচীর নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

□

৩ সতের. শিক্ষাদান ও দিকনির্দেশনা। যুলকারনাইন তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করতে হয়। যাতে ভবিষ্যতে নিজেরাই কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

□

৪ আঠার. হাতেকলমে কাজ শিক্ষা দেয়া। যুলকারনাইন তাদেরকে কাজে শরীক করেছিলেন। বাস্তবে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নেতা কেবল আদেশদাতাই নন, শিক্ষকও বটেন। কর্মীও।

□

৫ উনিশ. নেতা শ্রেফ বক্তৃতা দিয়েই বেড়াবেন না, প্রজাদের স্বার্থে স্থাপনা নির্মাণ করবেন। এজন্য নিজের সার্বিক শক্তিকে যথাযথ কাজে লাগাবেন। জনগণ থেকে চাঁদা তোলা ছাড়াই। একাউন্ট খোলা ছাড়াই। তবে স্বেচ্ছাশ্রম নিতে পারেন।

□

৬ বিশ. কম পরিশ্রমে বেশি লাভ। নেতা চেষ্টা করবেন অধিক ফলপ্রসূ ও সহজ পন্থা অবলম্বন করতে। যুলকারনাইন চাইলে পারতেন, দেয়াল নির্মাণ না করে, ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে লড়াই করে পরাজিত করতে। তাদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে। কিন্তু তিনি সে পথে পা না বাড়িয়ে, সহজ পথের দিকে গেলেন। প্রতিরোধ-দেয়াল নির্মাণে ব্রতী হলেন। যুদ্ধের চেয়ে এটা বেশি সুরক্ষিত। ফলদায়ক।

□

৭ একুশ. বিনয়, আল্লাহ অভিযুক্ত। সব কাজের তাওফীক আল্লাহই দান করেন। সব নেতারই এটা মনে রাখা দরকার। আমি কিছুই নই, নিমিত্ত মাত্র। কাজ তো আল্লাহই করান। কাজ গুরু না করেই নেমফলক হাঁকানো কাজের কথা নয়। যুলকারনাইন সবিনয়ে নিবেদন করেছেন,

هَذَا رَحْمَةً مِنِّي

এটা আমার রবের রহমত! (৯৮)

কারেক্টারিস্টিকস অব প্রাইম মিনিষ্টার

একজন রাষ্ট্রনায়কের কী কী গুণ থাকা উচিত?

সূরা ইউসুফে কতো যে শিক্ষা লুকিয়ে আছে! কেয়ামত পর্যন্ত বের করে গেলেও আহরণ ফুরোবে না। কুরআন কারীমে বর্ণিত ঘটনাগুলো আসলেই একেকটা সুগভীর সমুদ্র! কী নেই? ইলম, হিকমত, নসীহত, জীবনদর্শন, আকীদা, দিকনির্দেশনা, প্রতিপালনপদ্ধতি-সবই আছে। আছে বৃদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি। আছে অপূর্ব সব কথোপকথন!

নিছক ইতিহাস বর্ণনা করা কুরআন কারীমের উদ্দেশ্য নয়। তেমন হলে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য থাকত। কিন্তু কুরআন কারীমে সে-ধরনের কোনো তথ্যবহুল (মানে সনতারিখসহ) আলোচনা নেই। কুরআন কারীমের মূল উদ্দেশ্য কী? -মানুষের হিদায়াত!

এই হিদায়াতের জন্য যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন ঠিক ততটাই আলোকপাত করা হয়েছে। বাকিটুকু অপূর্ব সংঘমের সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সংঘমকেই অলংকার শাস্ত্রে বলা হয় 'ঈজায়' (إيجاز)।



একটা জাতিকে পরিপূর্ণরূপে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজন হয় দুটি উপাদানের।

(এক) কর্মঠ কর্মীদল বা সুদক্ষ নেতৃত্ব কিংবা প্রজ্ঞাবান শাসক।

(দুই) অভিজ্ঞ দিক-নির্দেশক পরিষদ।

সেই শাসক যদি নবী হন? তাহলে বিশেষকগণ তাদের মধ্যে চল্লিশটারও বেশি গুণাবলী আবিষ্কার করেছেন। আর শাসক নবী না হয়ে সাধারণ কোনো মানুষ হলে তার মধ্যে চল্লিশটা গুণাবলীর সবগুলোই থাকতে হবে, এটা জরুরী নয়। প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকলেই চলবে।

ইউসুফ আ. ছিলেন একাধারে নবী ও শাসক। তার মধ্যেও সবগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুফাসসিরগণ কুরআন কারীম ঘেঁটে কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করেছেন, যেগুলো ইউসুফ আ.-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং কুরআনেও উল্লেখ আছে।



নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু খিলাফতব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি! তাহলে হযরত ইউসুফের প্রতি নজর বুলানো যাক, একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কি কি গুণ লাগবে।

২ (এক) চারিত্রিক পবিত্রতা। আত্মসংবরণক্ষমতা। লোভের মুহূর্তে নিজেকে ধরে রাখার চিত্তশক্তি থাকতে হবে। সামনে পাপের সুযোগ এলেও নিজেকে ধরে রাখার শক্তি থাকতে হবে। সুযোগকে পায়ে দলে এড়িয়ে যাওয়ার মতো হিম্মত আর বুকের পাটা থাকতে হবে।

ইউসুফ আ.-এর সামনেও সুযোগ এসেছিল। নির্জন ঘর। যুগশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রাজজায়ার বিলোলিত কাতর মদির আহ্বান। সব পায়ে দলে ইউসুফ আ. দরজার দিকে ছুট দিলেন।

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

আমি এরূপ করেছিলাম তার থেকে অসৎ কর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২৪)



২ (দুই) প্রচণ্ড রাগ হলেও সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নিজের বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা অভিযোগ তুললেও হজম করার মতো সহনশীলতা থাকতে হবে। ক্রোধ সংবরণ ক্ষমতা একজন শাসকের প্রধানতম গুণ! ভাইয়েরা নির্জলা মিথ্যা বললো অম্মানবদনে! ইউসুফ আ. কিছুই বললেন না।

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَمُوا يَوْسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُدِيهِمَا لَهُمْ قَالِ
أَنْتُمْ شُرَكَائِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

ভাইয়েরা বলল, যদি বিন ইয়ামিন চুরি করে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে, চুপিসারে (মনে মনে) বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ আর তোমরা যা বলছ তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। (৭৭)



২ (তিন) নরমের স্থানে নরম হওয়া, গরমের স্থানে গরম হওয়া। সব সময় কোমল হয়ে থাকলে রাষ্ট্র চলবে না। দুষ্টলোকেরা সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করবে না। অপ্রয়োজনীয় ক্ষমা আর অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা বিপদ ডেকে আনে।

وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَاهِزِهِمْ قَالُوا ثَوْنِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ لَا تَرْفُونَ لِي أَوْ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا

خَيْرُ الْمَنْزِلِينَ
ইউসুফ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তাদেরকে বলল, (আগামীতে) তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার

কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না আমি পরিমাপ-পাত্র ভরে দিই এবং আমি উত্তর অতিথিপরায়ণও বটে। (৫৯)
এখানে ইউসুফ অত্যন্ত দয়ালু। যারাই আসছে, মুঠোভরে নিয়ে যাচ্ছে। কাউকে ফেরাচ্ছেন না। আবার কঠোরও হচ্ছেন,

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসে তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো রসদ থাকবে না। তখন তোমরা আমার কাছেও আসবে না। (৬০)

□

৪ (চার) আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। তবে সেটা হবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সাহায্যে। তাওয়াক্কুলবিহীন আবোলতাবোল আত্মবিশ্বাস বিপদ ডেকে আনবে।

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

ইউসুফ বললেন, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা)-কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি। (৫৫)

রাজার দরবারে ইউসুফ নিজেই নিজেকে পেশ করেছেন। কোনো সংকোচ ছাড়াই বলেছেন, আমি এই কাজের যোগ্য। আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলেছেন।

□

৪ (পাঁচ) স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণশক্তি থাকতে হবে। শত্রু-মিত্র চিনতে হলে এটা থাকা আবশ্যিক। পুরনো স্মৃতি মনে না থাকলে, শাসনকার্য পরিচালনা করা দুষ্করই বটে।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

(দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে) ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তারা তার কাছে উপস্থিত হলো। ইউসুফ তো তাদেরকে চিনে ফেলল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না। (৫৮)

সেই কবে ছোটবেলায় ভাইদের সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। ভাইয়েরা তাকে কূপে ফেলে দিয়েছে। একদম শৈশবের ঘটনা। দীর্ঘদিন পর দেখেই চিনে ফেললেন ভাইদেরকে।

□

৪ (ছয়) চিন্তা-চেতনা স্বচ্ছ ধারালো আর নিষ্কলুষ হতে হবে, তাহলে স্বপ্ন ও কল্পনাও হবে ঝকঝকে।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيُّهَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, আব্বাজী, আমি (স্বপ্নযোগে) এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি দেখেছি, তারা সকলে আমাকে সিজদা করছে। (৪)



৳ (সাত) ইলমের প্রস্তুতি, ইলমের প্রতি পিপাসা থাকা এবং ইলম অর্জনে সিদ্ধি লাভ করা। সর্বোপরি অর্জিত ইলমকে কাজে পরিণত করা একজন শাসক ও নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

আমি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করেছি। আমাদের এ-অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো জিনিসকে শরীক করব। এটা (তাওহীদের আকীদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নেয়ামতের) শোকর আদায় করে না। (৩৮)

দীর্ঘদিন পরিবার থেকে দূরে ছিলেন। ভিন্ন এক পরিবেশে। অন্য এক আবহে। তবুও সত্যসন্ধান ও সত্যানুসরণে ছেদ পড়েনি। ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে শিখে আসা আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। আরও উৎকর্ষমণ্ডিত করে তুলেছেন। সেটাকে চর্চা করে করে চূড়ান্ত স্তরে। তাওহীদে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি সচেতনও ছিলেন।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্বের অংশ দান করেছ এবং আমাকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান দ্বারাও আমাকে ধন্য করেছ! (১০১)

যা শিখেছেন পরিপূর্ণ আস্থা আর 'তামকীনের' সাথেই শিখেছেন। নিজে কী জানেন, সেটা নিয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর ইলম অর্জন যে আল্লাহর বিরাট একটা অনুগ্রহ, সেটা স্বীকার করতেও কসুর করেননি।



৳ (আট) শাসকের মনে দুর্বলের প্রতি দয়া থাকতে হবে। আচরণে সেটা প্রকাশও পেতে হবে। নিজে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে গদীয়ান হলেও, তার বিনয়ে

কোনো ঘটতি আসবে না। নগন্য মানুষ হলেও তার ব্যবহারে কোনো তারতম্য হবে না। ইউসুফ নিজের রাজদরবারে লালিতপালিত হলেও, কারাগারে সাধারণ দুই বন্দীকে কী মনোরম শব্দে সম্বোধন করেছেন,

يَا صَاحِبَي السِّجْنِ

হে আমার কারা-সঙ্গীদয়! (৩৯)

তারপর আপনজনের মতো 'কনসালটেশিতে' ব্রতী হয়েছেন,

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا

খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের রহস্য বলে দেবো। (৩৭)

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝাঁপিও খুলে বসেছেন,

لِي تَرْكَتُمْ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না আমি তাদের দ্বীন বর্জন করেছি।

(৩৭)

ইউসুফের অমায়িক আর আপন করা ব্যবহারে বন্দীদয় মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের ভক্তি গদগদ মন্তব্য,

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

আমরা আপনাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি! (৩৬)

□

৪ (নয়) প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার গুণও একজন শাসকের থাকতে হবে। নইলে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। জনগণ ফুঁসে উঠবে।

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৯২)

ভাইয়েরা অনেক বড় অপরাধ করেছিল। বৈমাত্রের ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বৃদ্ধ পিতাকে চরম মর্ম যাতনায় ভুগিয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ সেসবকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। মাফ করে দিলেন। উল্টো আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চাইলেন।

□

৪ (দশ) পরিবার পরিজনের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আত্মীয়-স্বজনকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। নিজে বড় হয়ে তাদের ভুলে যাওয়া একজন শাসকের জন্য নিরাপদও নয়।

وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো! (৯৩)

□

✍ (এগার) একজন শাসককে কথা বলতে জানতে হবে। বাগী হতে হবে।
কথার জাদুতে মানুষকে মুগ্ধ করার শক্তি থাকতে হবে।

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

বাদশাহ যখন ইউসুফের সাথে কথা বললো তখন বাদশাহ বললো,
আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে। তোমার
প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে। (৫৪)

ইউসুফ ছিলেন জেলে। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে দরবারে এলেন। একবার কথা
বলেই রাজা একেবারে 'ইমপ্রেসড'! মুগ্ধ।

□

✍ (বারো) শাসনকাজ চালাতে হলে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা জরুরী। উন্নয়নের
একটা রোডম্যাপ থাকা আবশ্যিক। বিভিন্ন খাতে নানা মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা থাকা
চাই! সুনির্দিষ্ট সময়-ফ্রেমের ভিশন থাকলে, গতিশীল উন্নয়নের পালে হাওয়া
লাগে। বিশেষত দারিদ্র দূরীকরণে শাসকের পদক্ষেপ হওয়া উচিত বাস্তবমুখী
ফলপ্রসূ আর জীবনঘেষা।

فَمَا خَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

এ সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য গ্রহণ করবে তা শীঘ্রসমেত রেখে
দিও! (৪৭)

ইউসুফ মিসরের জন্য 'চৌদ্দসালা' খাদ্য-কর্মসূচী দিয়েছেন। এগ্রিকালচারাল
রোডম্যাপ দিয়েছেন। পরে দেখা গেছে, ইউসুফের দূরদৃষ্টি কতোটা সূদূরপ্রসারী
ছিল! সেই কৃষি-প্রকৌশলের সুফল মিসর আজো ভোগ করছে!

مُحْسِن (مُحْسِن)

মুহসিন মানে কী?

অনুগ্রহকারী। সৎকর্মশীল।

একজন মানুষকে মুহসিন হতে হলে, ন্যূনতম কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে?
উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করতে পারি।

এক. বাবার দুই বিয়ে। আগের ঘরের সন্তানরা সবাই বড় বড়। প্রতিষ্ঠিত। শক্তিমান। স্বাভাবিক কারণেই বাবার স্নেহমমতা দ্বিতীয় সংসারের প্রতি বেশি থাকবে। এ-ঘরের ছেলেসন্তান তো এখনো ছোট। তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। এটা দেখে বড় ঘরের সন্তানদের মনে হিংসা! তাদেরকে পেয়ে আমাদের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু তা কি হয়? বাবা কখনো ছেলেকে ভুলে যেতে পারে? হ্যাঁ, ছেলের কোনো আচরণের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে পারেন। এমন জেদাজেদি-রেষারেষিতেও, আরেক সংসারের ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, আন্তরিক থাকা। অনুগত থাকা। মিলেমিশে থাকাকেই 'ইহসান' বলে। এমন ব্যক্তিকেই মুহসিন বলা যায়। ইয়াকুব ও ইউসুফ আ.-এর আদর্শ এমনটাই ছিল।

□

দুই. একজন অসহায় মানুষ। আরেকজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাকে অনুব্রত বাসস্থান দিয়েছেন। সন্তানের আদরে বড় করেছেন। এমন মহৎ ব্যক্তির ঘরে আবার 'ভিন্ন চরিত্রের' মহিলা।

তিনি আবার ঘরের চাকর/পালকপুত্রের সাথে 'অন্য সম্পর্ক' স্থাপনে আগ্রহী। স্বামীর অগোচরে শুধু পরকীয়াই নয়, আরও বড় গুনাহের জন্য প্রস্তুত। মহিলার কুমন্ত্রণায় সাড়া না দিয়ে, মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাকেই ইহসান বলে। তাকে বলা হবে মুহসিন। ইউসুফ আ.।

□

তিন. একজন আমাকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দিল। লোভ দেখালো। ভয় দেখালো। জেল-জুলুমের হুমকি দিল। রিমান্ডে নেয়ার ধমকি দিল। আমি কী করবো? নতি স্বীকার করবো? না, তা কী করে হয়? অন্যায়ের কাছে মাথা না নুইয়ে যদি জেলে যাই, তাহলে আমি 'মুহসিন'। ইউসুফ আ.।

□

চার. বিনা অপরাধে কারাবন্দী হয়েছি। মন খারাপ করে বসে থাকবো? গাল ফোলাবো? উহু, তা করলে কি দুনিয়া চলবে? সেখানে গিয়েও দাওয়াতের কাজ করতে হবে। দাওয়াতের ন্যূনতম সম্ভাবনাও হাতছাড়া করা যাবে না। জেলখানার কয়েদী-খুনে-বদমাশ সবাইকে আত্মশুদ্ধির দাওয়াত দিতে হবে। তাহলেই আমি হবো 'মুহসিন'। ইউসুফ আ.।

□

পাঁচ. পানসা-আনুনা দাওয়াত দিলে হবে? কয়েদীদের তাসের আড্ডায় গিয়ে. একগাল হেসেই 'দাওয়াত' শুরু করে দিব?

কয়েদীরা তবে রে মোল্লা বলে, তেড়েফুঁড়ে আসবে না? তাহলে উপায়?
আগের ওদের সাথে ভাব জমাতে হবে। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে জায়েজ তরীকায়
গল্পগাছা করতে হবে। ইউসুফ আ.-এর মতো স্বপ্নের ব্যাখ্যা না দিতে পারলেও
কিছু একটা করতেই হবে। সেটা হতে পারে, উত্তম আখলাক, হতে পারে
দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে হিকমত ও উত্তম কথা ব্যবহার। তাহলেই আমি মুহসিন।
একজন আল্লাহর নবীরও আদর্শ এমনি ছিল।

□

হয়. এক সময় যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তাদেরকে বাগে পেয়েও,
তাদের অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে, তাদের প্রতি সাহায্যের দরাজ হাত
প্রসারিত করাও 'ইহসান'। এমনটা করতে পারলেই আমি মুহসিন।

□

সাত. সবচেয়ে সুন্দর যে বিষয়টা তা হলো, আমার প্রতি একজন মানুষ অনুগ্রহ
করেছে। তিনি সম্মানিত ব্যক্তি। তার স্ত্রীর মধ্যে খারাপ কিছু থাকলেও, মুখ ফুটে
কারো নাম না নেয়া। অপবাদটা আমার ওপর আসলেও না। মানির মান রক্ষা
করা। অথবা অনুগ্রহকারীকে সবার সামনে খাটো না করা। তাহলেই আমি
মুহসিন।

□□□

সূরা ইউসুফে 'মুহসিনীন' শব্দটা পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইউসুফ (আ.)-কেই
প্রত্যেকবার মুহসিন বলা হয়েছে। কয়েদী দুইজন কী বলেছিল?

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

আমরা আপনাকে মুহসিন দেখতে পাচ্ছি (৩৬)

অনুসন্ধান করে দেখা যায় মুহসিন হবে কাজে। আগে কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে
হবে আমি ভালো। এবার দেখি আল্লাহ তা'আলা এই 'মুহসিন'-এর প্রতি কেমন
আচরণ করেছেন?

□

এক. কূপের মধ্যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। পাঠিয়ে দিলেন একটা কাফেলা।
দুই. নিঃসন্তান শাসকের ঘরে সন্তান নেই। বুকভরা হাহাকার। আল্লাহ মন্ত্রীকে
বাজারে পাঠিয়ে দিলেন। অসহায় একটা বালককে উঠিয়ে দিলেন রাজার ঘরে।
তিন. জেলে পড়ে আছেন। অনেক দিন হয়ে গেল। জামিন-প্যারোলে
কোনোভাবেই মুক্তি মিলছে না। তখন রাজার প্রয়োজন পড়লো স্বপ্নের ব্যাখ্যার!
তো? বের করো ইউসুফকে!

চার. মিসরের খাদ্যমন্ত্রী বানাবেন। হলো কী? দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জেল থেকে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে।

mmmm

সূরা ইউসুফ আমার অত্যন্ত প্রিয় সূরা। প্রিয় হবে না কেন? পৃথিবীর আর কোনো গল্পকে কি আল্লাহ আহসানাল কাশাস (সুন্দরতম গল্প) বলেছেন?

-জেমস জয়েসের শতাব্দী-সেরা উপন্যাস 'ইউলিসিস'কে?

-তলস্তয়ের 'রিজারেকশান' বা আন্নাকারেনিনা'-কে?

-বিভূতি মুখুজ্যের পথের পাঁচালীকে?

কোনোটাকেই না। শুধু সুন্দরতম পুরুষ ইউসুফের ঘটনাকেই আল্লাহ তা'আলা এই 'সনদ' দিয়েছেন। কুরআন কারীমকে ছাপিয়ে, অন্য কিছুকে যদি আমার বেশি সুন্দর লাগে, তাহলে বুঝতে হবে, আমার রুচিবিকৃতি ঘটেছে। আমার মধ্যে পচন ধরেছে। দ্রুত এই ব্যাধির চিকিৎসা করাতে হবে। নইলে এই রোগ পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।

সৌন্দর্য কী?

আমি কি আল্লাহর চেয়েও বেশি সৌন্দর্য চিনি? তিনি যেটা সুন্দর বলেছেন সেটাকে আমার সুন্দর না লাগলে, অসৌন্দর্যটা কার ধরা পড়ে?

-অবশ্যই আমার।

তাহলে এ ঘটনা পড়তেই হয়। পথের পাঁচালী যদি দশবার পড়ি, ইউসুফের ঘটনা দশ কোটি বার পড়া উচিত! আর সুন্দরতম গল্প হাতের কাছে থাকতে, পথের পাঁচালী নিয়ে প্যাঁচাল পাড়তে হবে কেন?

মন খারাপ হলেই আমি সূরা ইউসুফ পড়ি। সত্যি সত্যি মনটা ভালো হয়ে যায়। ভালো লাগার অনুভূতি মনের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

বঠমের খোঁজে

আমরা যখন ঘর থেকে বের হই, রাস্তাঘাটে-অফিস-আদালতে, মার্কেটে-বাজারে, মোটা দাগে দুই প্রকার নারীর মুখোমুখি হই। এর বাইরেও প্রকার থাকতে পারে। থাকেও। আমরা শুধু দুই প্রকার নারী নিয়ে আলোচনা করবো।

mmmm

প্রথম প্রকার: আযীয়ে মিসরের স্ত্রী।

-তিনি কী করেছিলেন? সুন্দর করে সেজেছেন। আলতা পরেছেন। কপালে হয়তো টিপও দিয়েছেন। চুলে বেণি করেছেন। ভালো কোনো সুবাস মেখেছেন। তারপর ডেটিংয়ের জন্য ইউসুফ আ.-কে নির্জন-গহীনে ডেকেছেন। বলেছেন,

هَيْتَ لَكَ

কাছে এসো...



বর্তমানেও জুলায়খার অভাব নেই। তারা সাজুগুজু করে বের হন। মনে মনে কামনা করেন, অন্যরা আমার সৌন্দর্য দেখুক। চোখ দিয়ে গিলুক। মন দিয়ে...। সর্বত্র এদের দেখা মেলে।



❧ দ্বিতীয় প্রকার: নবীকন্যা

-বাবা বয়োবৃদ্ধ। কাজকর্ম করতে পারেন না। একপ্রকার ঘরবৈঠা। সংসারে ছেলে নেই। সন্তান বলতে দুটো মেয়ে। ঘরে বসে থাকলে খাবার জুটবে না। পানি জুটবে না। ভেড়াগুলো না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। সেগুলোর ওলান শুকিয়ে যাবে। বাচ্চা দিবে না। বাধ্য হয়ে দুই কন্যাকে ভেড়া চরাতে বের হতে হয়। কুয়া থেকে পানি তুলতে হয়। বোন দুজন পুরো শরীর ঢেকেচুকে, শালীন পোশাক পরে, লাজনম্র পদক্ষেপে, জড়োসড়ো হয়ে, রাস্তার এক পাশ দিয়ে, মেষগুলো নিয়ে এল। কুয়াতলা তখনো পুরুষদের দখলে।

অপেক্ষা করছেন, কখন পুরুষরা পানি খাওয়ানো শেষ করবে। তারা চলে গেলে দুই বোনের পালা আসবে।

আজ অন্য দিনের তুলনায় একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। কুয়াতলার অদূরে একটা নিমগাছের তলায়, এক পরদেশী বসে বসে আছে। এদিকেই তাকিয়ে আছেন। কী মনে করে উঠে এলেন।

-কী ব্যাপার? তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? পানি পান করানোর জন্য তোমরা কেন?

-ওরা চলে না গেলে, কিভাবে কুয়াতলায় যাই! ওখানে পুরুষরা পানি পান করাচ্ছে। আমাদের ঘরে কর্মক্ষম কোনো পুরুষ নেই। আব্বাজান অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! আমরা দু'বোনের না এসে উপায় নেই।



বর্তমানেও একদল নারীকে, বাধ্য হয়ে জীবিকার টানে বাইরে বেরোতে হয়। চাকরির জন্য। জান বাঁচানোর তাগিদে। তারা বের হন, পর্দা মেনে। শালীন পোশাকে। নিচের দিকে তাকিয়ে। লাজনম্র পায়ে।



প্রথম প্রকার নারীর সাথে পাকেচক্রে আমরা মুখোমুখি হয়ে গেলে, আমরা কী করবো?

-ইউসুফ আ.-এর মতো হয়ে যাবে। ছলনায় পটে না গিয়ে, দৃষ্টি নিচু করে ফেলবো। মা'আল্লাহ (আল্লাহর পানাহ) বলে পড়িমরি করে দৌড় দিবো!
এ-ইফফাত (সচ্চরিত্রতা অবলম্বন) করলে কী হবে? দেশের প্রধান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ইউসুফ আ. হয়েছেন।

□

দ্বিতীয় প্রকার নারীর মুখোমুখি হলে কী করবো?

হাতা গুটিয়ে উদ্ধার কাজে নেমে পড়বো? জ্বি, তা করা উচিত। কিন্তু সাহায্য করতে হবে আদবের সাথে। ড্যাভড্যাভ-জুলজুল চোখে তাকানো তো যাবেই না, উল্টো কাজ শেষ করে, ভদ্র ও শালীনভাবে সরে পড়তে হবে। যেমনটা মুসা আ. করেছিলেন। পানি পান করিয়ে, আবার নিমের তলায় গিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। মোবাইল নাম্বার চেয়ে বসা, অপ্রয়োজীয় কথা বলে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করা, তাকওয়াবিরোধী আচরণ।

এমন শিভালরি (মহানুভবতা) দেখালে আমার কী লাভ হবে?

অনেক লাভ। আমি ভালো হলে, আল্লাহ তা'আলাও আমার জন্যে ভালোর ফয়সালা করবেন। শুধু কি তাই! দশ-দশটা বছর থাকার বন্দোবস্ত। একোমোডেশন। একটা সম্মানজনক 'জব'। সাথে একটা পরিশ্রমী, সৎ, বিশ্বস্ত বিবিও। মুসা আ.-এমন পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভালো কাজ করার পর, মুসার মতো তাত্ক্ষণিক প্রতিদান না পেলেও সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আখেরাতে দান করবেন। মানুষের কাছ থেকে বিনিময় পাওয়ার আশায়, পরোপকার করা ঠিক নয়।

□□□□

তাহলে এ-কথাই রইল।

-কেউ ডাক দিয়েই আমি ল্যাল ল্যাল করে ছুটে যাবো না। আহ্বানকারী যত সুন্দর বা সুন্দরীই হোক! আমি শুধু আমার রবের ডাকেই সাড়া দেব। অন্য কারও মোহমায়ার ফাঁদে পড়ব না। ইনশাআল্লাহ।

-বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে, কন্টাক্ট নাম্বার চাওয়া যাবে না। কন্টাক্ট আল্লাহই জায়গা মতো করিয়ে দেবেন!

মানিয়ে নেয়া

আমরা মানিয়ে নিয়ে পারি না। মানিয়ে চলতে পারি না। নতুন পরিবেশে ভড়কে যাই! পা হড়কে যায়! ইউসুফ আ. এক আজীব নমুনা! পরিস্থিতি যাই হোক,

নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন ।

ক. ঘরে!

খ. গভীর কূপের অন্ধকারে!

গ. রাজপ্রাসাদে!

ঘ. কারাগারে!

ঙ. শাসকের পদে!

তার মূল শক্তি কী ছিল?

ক. তাকওয়া । যুগের সেরা নারীর প্রলোভনেও তাকওয়া হারাননি।

খ. সবর! জীবনে কত কষ্ট পেয়েছেন, ধৈর্য হারাননি ।

গ. ইহসান । সদাচারিতা! শত্রুর প্রতিও তিনি সদয় ছিলেন!

পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো! মাঝেমধ্যে অকল্পনীয় বিরূপ পরিস্থিতি আসে! নবীগণের আদর্শ সামনে থাকলে, বল পাওয়া যায়! ইনশাআল্লাহ!

কুতুবুহা দানিয়াহ

১ (এক) সত্যের মৃত্যু নেই!

সত্য কখনো গোপন থাকে না । গোলান, আলবাব ও হালাবের সর্বশেষ পরিস্থিতি যাচাই করতে গিয়ে কথাটা আবার মনে হলো । কিছু মানুষ ভেক ধরে থাকে, তারা বিরাট বড় নেতা! অনেক বড় ব্যক্তিত্ব! ভেতরে ভেতরে দেখা যায়, তারা ভিন্ন কিছু!

ইউসুফ আ.-কে কারাগারে নেয়া হল । মিথ্যা অভিযোগে । শেষে কী হলো! যুলায়খা নিজেই বললো,

الْآنَ خَفَضَ الْحَقُّ

এবার সত্য কথা সবার কাছে [خَفَضَ] স্পষ্ট হয়ে গেছে । (৫১)

সত্য আসলে কখনো কখনো আড়ালে থাকে । পর্দার আড়ালে চলে যায় । দীর্ঘকাল । কিন্তু কখনো মরে যায় না । সময়মতো ঠিকই আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে!



২ (দুই) ভালোবাসার মৃত্যু নেই!

ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে বাপ-বেটাকে আলাদা করে ফেলল । ছেলেকে ফেলে দিল কূপে । বাবাকে দিল মিথ্যা প্রবোধ! ভেবেছিল, এতে করে বাবা তাদের একা হয়ে যাবেন । তারাই পুরো ভালোবাসা লাভ করবে ।

اَقْتُلُوايُوسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَيُّكُمْ

(সূতরাং এর সমাধান এই যে) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে অন্য কোনো স্থানে ফেলে এস, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে। (৯)

তারা ভেবেছিল, শরীর আলাদা হলে ভালোবাসাও আলাদা হয়ে যায়। আসলে তারা ভালোবাসার কিছুই জানে না। ভালোবাসা থাকে হৃদয়ে! সেটাকে আলাদা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? কত দীর্ঘকাল দূরে ছিলেন দু'জন! একজন কাঁদতে কাঁদতে অন্ধই হয়ে গেছেন! ভালোবাসা মরে না।

III

৪ (তিন) ভালোবাসার ঈর্ষা।

স্বামী আরেক বিয়ে করলে খারাপ লাগে কেন? ঈর্ষা! নিজের প্রিয় স্বামীকে আরেক জনের সাথে ভাগাভাগি করতে মন সায় দেয় না! ভালোবাসার অপর পিঠেই ঈর্ষা বা হিংসা জড়িয়ে থাকে! ভাইয়েরা ইউসুফকে কেন হিংসে করতো?

اِذْ قَالُوايُوسُفُ وَاَخُوهُ اَحَبُّ اِلَىٰ اٰبِنَا۟مَنَا

ইউসুফের (সৎ) ভাইয়েরা (পরস্পরে) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বিন ইয়ামীনই) বেশি প্রিয়। (৮)

বাবার স্নেহ-ভালোবাসাতেও ঈর্ষা জাগতে পারে। ভাইয়েরা সম্পদের জন্য ঈর্ষা করেনি। করেছে ভালোবাসার ঈর্ষা। হৃদয়ের দান হাতের দানের চেয়ে বেশি দামী যে!

III

৪ (চার) আনন্দ-বেদনা হরিষে বিষাদ!

জামা (القَمِيص) শব্দটা ছয়বার আলোচিত হয়েছে। ইউসুফের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শব্দটা কুরআনে এসেছে। প্রতিবার আলাদা দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। মোটাদাগে তিনটাব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ক. শোকের কারণ হয়েছে। (১৮)

খ. নির্দোষ প্রমাণের কারণ হয়েছে। (২৮)

গ. আনন্দ ও সুসংবাদের কারণ হয়েছে। (৯৩)

আজ যা আনন্দের কাল তা নিরানন্দের কারণ হতে পারে। আজ যা নিরানন্দের কাল তা আনন্দের কারণ হতেও পারে। দিন বদলের সাথে সাথে মান বদল ঘটে। মেঘ দেখেই হাঁপিয়ে উঠে কাজ নেই। বৃষ্টির কান্না ফসলের হাসি নিয়ে আসে সাধারণত।



২ (পাঁচ) পথ এক পরিণাম ভিন্ন!

একঘরে থাকে, একসাথে বাস করে কিন্তু গন্তব্য ভিন্ন হয়ে যায়। একই মাদরাসায় একই ওস্তাদের কাছে পড়েও ঋদ্ধি ভিন্ন!

وَاسْتَبْخَاتِ الْبَابَ

তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌড়ে দরজার দিকে গেল। (২৫)
একজন হিদায়াতের দিকে দৌড়াচ্ছে, আরেকজন গোমরাহির দিকে। কী অপূর্ব এক সমন্বয়! একই ফলে মিঠা-তিতা! যার ভাগ্যে যেটা পড়ে। কাঁথা এক গাঁথা ভিন্ন!



২ (ছয়) ভালো সব সময়ই ভালো!

প্রকৃত ভালো যে, তাকে কেউ বদলে দিতে পারে না। সুদ-ঘুষ-ঘুষি কিছুই না। জেলখানায় ছিলেন। সহবন্দীরা তার চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছে,

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

আমরা আপনাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি। (৩৬)

কারাগারে কষ্ট আছে। ভালো হয়ে থাকার চাপ আছে। তাই বাহ্যিকভাবে ভালো দেখানো সহজ! প্রকৃত ভালো কি না, সেটা মানুষের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। অপরাধের সুযোগ পাওয়ার পরও, ভালো থাকতে পারলেই বোঝা যায়, আসল শক্তি।

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

যারা সদয় আচরণ করে আমরা আপনাকে তাদের একজন মনে করি। (৭৮)

ভাইদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, নিলেন না। ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে, ক্ষমা করে দিলেন। এবার প্রমাণ হলো, ইউসুফ আসলেই ভালো মানুষ। আগেও ভালো ছিলেন। কিন্তু সেটা নিয়ে দুষ্ট লোকেরা প্রশ্ন তুলতে পারে। উৎস বিগুন্ধ থাকলে বাইরে ধূলোঝড় সত্ত্বেও স্বচ্ছ পানিই উৎসারিত হয়। ঘোলা পানি নয়।



২ (সাত) ইতিহাস কথা কয়!

নিজের অতীত পরিষ্কার থাকলে, ভবিষ্যতও পরিষ্কার হয়ে আসে। বিচারিক তদন্তের মুখে প্রাসাদের রমণীকূলের সরল স্বীকারোক্তি,

حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ

আল্লাহর পানাহ, আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও দোষ পাইনি! (৫১)

তাই নিজের বর্তমান (যা এক সময় অতীতে রূপান্তরিত হবে) সুন্দর করে গড়ে তোলা উচিত! ভবিষ্যতে কাজে দেবে! এখন যারা আমাকে পাপের দিকে টানছে, তারাই আমার নিষ্কলুষতার স্বাক্ষর দিবে। জীবনের একটা পর্যায়ে গিলে বলতে পারবে না।

-তুমি যদি এতই সাধু হও, তাহলে আমার সাথে কিভাবে কলেজ ফাঁকি দিয়ে ঘুরতে বেরোতে পারলে?

ইফফাত বা সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া শুধু নারীর জন্য নয়, পুরুষের জন্যও আবশ্যিক! বলা ভালো, নারীর তুলনায় পুরুষেরই বেশি 'চারিত্রিক নিষ্কলুষতা' থাকা জরুরী। শুধু মারয়ামই 'আফীফাহ' হবেন, এমন নয়। বরং তারও বহু আগেই ইউসুফ সাধুত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন! মারয়ামকে কেউ ভিন্ন পথে যাওয়ার আহ্বান করেছে বলে, জানা নেই! কিন্তু ইউসুফকে রীতিমতো চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল! তিনি সব মোহ ভেঙে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন! আলাইহিস সালাম।



৪ (আট) খোদার ভয় সর্বজয়!

আল্লাহর ভয়কে তাকওয়া বলে। এটা এক অমূল্য সম্পদ। এটা না থাকলে পদে পদে ভ্রান্তি-বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে। লিফটে একা পেয়ে সুন্দরী ললনার আহ্বান? ধানক্ষেতে? পাটক্ষেতে? খড়ের গাদার আড়ালে? পাটিপাতার আড়ালে? পার্কের গোপন কোণে? রাতের আঁধারে পুকুর পাড়ে? কেউ দেখছে না বুঝি? ইউসুফ আ. সাহসী পুরুষের মতো বলে উচ্চারণ করলেন,

مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ

আল্লাহর পানাহ [مَعَاذَ اللّٰهِ]! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে

ভালোভাবে রেখেছেন। (২৩)

আমি কিভাবে এমন রবের নাফরমানি করতে পারি? সম্ভব নয়। তাকওয়ার কিছু হাতেনাতে ফল আছে। বান্দা যখন তার রবকে ভয় করে, রব তার জন্য বহু অপ্রত্যাশিত পথ খুলে দেন। সব সংকটে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

পুরো মহল যুলায়খার অধীন! সবাই তার ভক্ত-অনুরক্ত! ইউসুফের কেউ ছিল না! তিনি ছিলেন আশ্রিত! তারপরও তিনি রবের প্রতি আস্থা রাখলেন। রবও সাথে সাথে প্রতিদান দিলেন! অত্যন্ত সঙ্গীন মুহূর্তে তার পক্ষে একজনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

তার (যুলায়খার) পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল। (২৬)

একজন দাঁড়িয়ে গেছে ইউসুফের পক্ষে। তাও যে সে নয়, খোদ বিপক্ষের পরিবারভুক্ত একজন! ইউসুফ নির্দোষ! সে পাপ করেনি!

■

২ (নয়) সুগভীর আস্থা!

একজন মুমিন নিরাশ হতে পারে না। কারণ? আল্লাহ আছেন না! তিনি কিভাবে একজন বান্দার খারাপ চাইতে পারেন? তাহলে বিপদ কেন আসে? সেটা আমার কৃতকর্মের কারণে আসে বা ভবিষ্যতের বড় কোনো বিপদ থেকে বাঁচাতে এই ছোট বিপদ এসেছে! আল্লাহর আশাব্যঞ্জক বাণী থাকার পর একজন মুমিন হতাশ হতে পারে না!

ইয়াকুবও হননি। তিনি ছেলেদের চক্রান্ত সাথে সাথেই ধরে ফেলেছেন। দৃঢ়ভাবে বলেছেন,

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ الْفُسْكَرُ أَمْرًا

(এটা সত্য নয়;) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। (১৮)

ইয়াকুব কিভাবে বুঝে গেলেন? আল্লাহর প্রতি আস্থা থেকে। ইউসুফ স্বপ্নে দেখেছেন, এগারটা তারকা তাঁকে সিজদা করছে। চাঁদ-সূর্য সিজদা করছে। কই সেসবের তো এখনো কিছুই ঘটল না! এর আগে কিভাবে তাকে নেকড়ে খেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সৌভাগ্যের কথা আগাম জানিয়ে দিয়েছেন! এটা পরম সত্য! সুতরাং ইউসুফ মরতে পারে না! আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই চরম সত্য। এর বিপরীত কিছু আমার দু'চোখ সরাসরি দেখলেও সেটা মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা!

■

২ (দশ) শালীন সংযতবাক!

ইউসুফ শুধু বাহ্যিক অবয়বেই সুন্দর ছিলেন তা নয়, তার হৃদয়টাও ছিল অসম্ভব সুন্দর! পূত-পবিত্র! মন্দ কিছুর চিন্তা তো দূরের কথা, অশ্লীল কিছু তার মুখ দিয়েও উচ্চারিত হতো না!

الْبِخْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَذْعُونَنِي إِلَيْهِ

এই নারীরা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি প্রিয়। (৩৩)

ব্যভিচারের কথা তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারতেন, তা না করে ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করেছেন। মানুষটা সত্যিই সুন্দর! আমাদের পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আরও বেশি সুন্দর!!

□

৳ (এগার) কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি।
স্বার্থপর মানুষের স্বভাবই এমন। ঠেকায় পড়লে কত কাকুতি মিনতি! স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেলে অমনি উল্টো রা!

فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخِثًا تَكَتْلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَافٍظُونَ

আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই (বিন ইয়ামীন) -কে পাঠান।

(৬৩)

স্বার্থ ছিল, তাই বলেছে 'আমাদের ভাই'। কিন্তু যখন স্বার্থ ফুরোল,

إِنَّا بَلَّغْنَاكَ سَرَقًا

আপনার পুত্র তো চুরি করেছিল। (৮১)

তাদের ভাষা আমূল বদলে গেল। এমনটাই হয়ে থাকে। আশেপাশের অনেকেই এমন একচোখা!

□

৳ (বারো) ভালোবাসা করে কয়!

একজনকে দিয়ে কি আরেকজনের কাজ হয়? নির্দিষ্ট একজনের অভাব কি আরেকজন পূরণ করতে পারে? সাথে প্রায় সব সন্তানই ছিল। তারা বাবাকে অবহেলাও করত না। তবুও ইয়াকুব বলতেন,

يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسُفَ

আহা, ইউসুফ! (৮৪)

হৃদয়ের কিছু স্থান কেউ পূরণ করতে পারে না। নির্দিষ্ট একজনের জন্যই জায়গাটা বুড়ুসু হয়ে থাকে!

□

৳ (তেরো) একই সমতলে!

যে চিরতরে চলে যায় আর ফিরে আসে না। মনকে বোঝানো বড় দায়। চলে যাওয়া ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে কখনো কখনো ফিরে আসে। এক জামার হাত ধরে দুঃখটা এসছিল। আরেকটা জামার হাত ধরে সুখও এল!

أَنْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا

আমার এই জামা নিয়ে যাও। (৯৩)

ইউসুফ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের নিত্য ব্যবহার্য কত কিছুই তো ছিল। সেসব কিছু না দিয়ে জামাটাই পাঠালেন! সে কি আর এমনি এমনি!



✍ (চৌদ্দ) মনোবেদনা!

মাঝেমধ্যে কাছের মানুষগুলোর কাছ থেকে এমন এমন কষ্ট আসে, কিছু বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। এ যেন দো'ধারী তলোয়ার। আসতেও কাটে যেতেও কাটে! তখন মুখ বুজে চুপচাপ থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

فَأَسْرَاهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ

তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে)

বললো। (৭৭)

ভাইয়েরা তাকে চুরির অপবাদ দিল। চাইলে উত্তর দিতে পারতেন। না, ভালো মানুষটা সেসবের কিছুই করলেন না। না জানার ভান করলেন। উপেক্ষা করলেন। মুখের ওপর উত্তর দিলেন না। কখনো কখনো মনোভাব গোপন রাখার মাঝেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত!



✍ (পনের) আস্থা!

তারা রব সম্পর্কে নানা কথা বলে। নানা সম্ভাবনার কথা বলে। জ্ঞাননির্ভর কথাবার্তা বলে বিশ্বাস-ভক্তি ভাঙতে চায়। আমি বলবো আস্থার কথা। আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের কথা। ইয়াকুবও তাই করেছিলেন।

اذْهَبُوا فَتَخَسُّوْا مِنْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ

তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও! (৮৫)

বুড়ো পিতার কী পাহাড়সম আস্থা। সেই কবে ছোট্ট ইউসুফকে হারিয়েছেন। কিন্তু এখনো পুরোপুরি 'কনফিডেন্সের' সাথে বলছেন, যাও খুঁজে আনো! তার মানে তিনি বিশ্বাস করেন, খুঁজলেই ইউসুফকে পাওয়া যাবে। সে মরেনি। শৈশবে দেখা 'স্বপ্ন' বাস্তবায়নের আগে সে মরতে পারেই না।



✍ (ষোল) ভদ্রতাবোধ, সৌজন্য!

সুযোগ পেলেই খোঁচা মারা। কারো বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করে কথা বলা, এটা আমাদের কারো কারো মজ্জাগত অভ্যেস! এটা ভদ্রতা নয়, শালীনতা তো নয়ই! ইউসুফের কাছ থেকে একটু শেখা যাক না:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

আমার প্রতি তিনি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (১০০)

ভাইয়েরা সবাই উপস্থিত। কেনান থেকে বুড়ো-বুড়ি এসেছেন। এমন ভর মজলিসে পুরনো স্মৃতিচারণ করছেন ইউসুফ। প্রিয় রবের অনুগ্রহের কথা বলছেন। জেলখানার কথা বলেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বিপদজনক 'কূপের' প্রসঙ্গ আর টানেননি। বড় ভাইয়েরা তাতে বিব্রত হবে যে! বড় মনগুলো প্রতিশোধপরায়ণ হয় না। তারা পুরনো হিশেবগুলোকে ক্ষমার চাদরে ঢেকে দেন।



৪ (সতের) শাস্ত সমাহিত দৃঢ়োক্তি!

গলাবাজি করে কারা? যাদের ভেতরে দুর্বলতা আছে। তারা আওয়াজ দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চায়। কিন্তু যারা নির্দোষ তারা সব সময় কথা বলে ধীরস্থিরভাবে।

هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي

সে নিজেই তো আমাকে ফুসলাচ্ছিল। (২৬)

যুলায়খা স্বামীর কাছে অভিযোগ করলো। ইউসুফ কী করলেন? তেড়ে গেলেন? উহু, না। একজন নবী এমন আচরণ করতেই পারেন না। তিনি শুধু প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরলেন। মাত্র কয়েকটা শব্দে। কোনো শপথ নেই। উচুগলা নেই। শ্রোতাকে জোর করে বিশ্বাস করানোর জোরদার প্রয়াস নেই। আছে শুধু আত্মবিশ্বাসী বাহুল্যমুক্ত শাস্ত মুক্ত কণ্ঠস্বর!



৪ (আঠার) বুমেরাং তীর!

কথা বলার সময় সতর্ক থাকা জরুরী। অনেক সময় আমার কথা দিয়েই প্রতিপক্ষ আমাকে ঘায়েল করে ফেলে। প্রতিটি শব্দকেই মেপে মেপে উচ্চারণ করা উচিত।

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

আমার এই ভয়ও আছে, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে। (১৩)

ইয়াকুব হয়তো মনের খেয়ালেই বলেছিলেন নেকড়ের (ذئب) কথা। ধুরন্ধর পুত্রধনেরা সেটাকেই লুফে নিল। তারা ভাইকে কূপে ফেলে দিয়ে এসে বলল,

فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। (১৭)

✍ (উনিশ) অনাড়ম্বর!

একটু বড় পদে গেলে, নিজের নামের সাথে লকব যোগ করা ছাড়া বলতেই পারেন না, কেউ কেউ এমন আছেন। ওস্তাদের সাথে কথা বলছে বা ওস্তাদের কাছে কিছু লিখছে, নিজের নাম লিখতে বা বলতে গিয়ে একগাদা লকব লাগিয়ে বসে আছে। কেমন নির্লজ্জ আচরণ। আর ইউসুফ আ.?

أَنَايُوسُفُ وَهَذَاأَخِي

আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। (৯০)

ইউসুফ ভাইদেরকে বলেননি, আমি প্রেসিডেন্ট ইউসুফ। বড় মানুষেরা কখনো নিজের নামের সাথে বাড়তি কিছু যোগ করেন না। পদের কথা বলে বেড়ান না।

III

এবার শিরোনাম নিয়ে কথা বলা যাক! কুরআন কারীম হলো বাগানের মতো। এখানে জীবনের জন্য নানা রকমের ফলমূল পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেছেন,

-যার ফল থাকবে ঝুঁকে (নিকটে) [قُطُوفُهَا دَانِيَةً] (হাক্কাহ: ২৩)

কুরআন কারীমের কুতূফ (ফলমূল) দানিয়া (ঝুঁকে নিকটবর্তী) হয়েই আছে। শুধু আমরা ছিঁড়ে মুখে দেয়ার অপেক্ষায়!

শুকরান, ইউসুফ।

শুকরান, সাইয়িদুনা ইউসুফ! আপনার ঘটনা পড়ে আমরা জানতে পেরেছি!

১. কিছু মানুষ আমাদেরকে অপছন্দ করে। ঘৃণা করে। তারা আমাদের পেছনে লাগে। শত্রুতা করে। বিপদে ফেলার পায়তারা করে। দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে। হিংস্র হয়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা এমনটা কেন করে?

-না না, আমাদের কোনো দোষত্রুটি বা খুঁতের কারণে নয়। আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে। কিছু গুণাবলীর কারণে! এটা ঠিক, আমাদের মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু তারা আমাদেরকে সেসবের কারণে ঘৃণা করছে না। আপনাকেও কিছু লোক ঘৃণা করেছিল। আপনার সৌন্দর্যের কারণে। আপনার মহৎ গুণাবলীর কারণে! আপনার সারল্যে ও উদারতার কারণে! আপনি তাদের মতো নন এজন্য!

-এমনটা কেন হয়? কেন?

কিছু মানুষের স্বভাবই এমন। আশেপাশে 'ভালো' কোনো মানুষ থাকবে, এটা তারা সহ্য করতে পারে না। ভালো মানুষ পাশে থাকলে তার মন্দটা বেশি চোখে পড়ে যে! চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মনে করিয়ে দেয়, তুই খারাপ! সংকীর্ণমনারা এটা হজম করতে পারে না।



২. আঘাত কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আসে। ঘুণাক্ষরেও কল্পনায় আসেনি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ছুরিকাঘাত আসে। আপনি 'বনের বাঘ' থেকে বেঁচে গেছেন কিন্তু 'ঘরের বাঘ' থেকে রেহাই পাননি। ঘরের শত্রুই আপনার জন্য বিভীষণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদেরও সতর্ক থাকা উচিত। আমরা নিজেরাই আজ নিজেদের বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছি। যার হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনজন, ঘটনাচক্রে দেখা যায়, সে-ই ছুপা রক্তম নিকলে।



৩. আব্রাহ তা'আলা আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। অগণিত কল্যাণ দান করেছেন। কিন্তু নিজের সব ভালো কথা-কাজ-অর্জন, সবাইকে বলতে নেই। কিছু অর্জন একান্ত আপনজনকেই শুধু বলতে হয়। আর কাউকে নয়। আপনি স্বপ্নের কথাটা ভাইদেরকে বলার কারণেই তাদের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল।

আসলে কিছু মানুষ আছেই এমন, তাদের হৃদয়টা বড় সংকীর্ণ। দৃষ্টিটা বড়ই সীমাবদ্ধ। তারা নিজের ভালোর দিকে না তাকিয়ে সবসময় অন্যের কাছে কী কী ভালো আছে, সেটা নিয়ে পড়ে থাকে। হিশেব কষতে থাকে আর রোষে জ্বলে গুড়ে খাক হতে থাকে।



৪. অপরাধী কখনো কখনো কল্যাণকামীর বেশ ধরে আসে। ভাব দেখায়, তারা আমাদের কতো যে আপনজন! কতো হিতাকাজী! ইয়া নবী, শয়তানরা তো এমনই হয়ে থাকে। আপনার পিতা আদমকে সে কী বলেছিল খেয়াল নেই?

هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْحَدِيدِ

তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন লাভ হয়?

(দ্বহা: ১২০)

অতদূর যেতে হবে না। আপনার ভাইদের কথাই ধরুন না কেন! তারা আপনার পিতাকে কী বলেছে?

وَأَنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ

এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা তার শুভাকাজী। (ইউসুফ: ১১)

وَأَنَّا لَهُ لَكَافٍظُونَ

বিশ্বাস করুন, আমরা তাকে হেফাজত করব। (১২)

বারবার ভান করে, অভিনয় করে, আব্বুকে 'কনভিন্স' করার চেষ্টা চালিয়েছে! মধু বলে বলে বিষ খাওয়ানোর অপপ্রয়াস চালিয়েছে! মিষ্ট কথা শুনেই তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। কোনো কোনো মিষ্টতার আড়ালে রুষ্টতা থাকে। সে-ব্যাপারে চৌকান্না থাকা জরুরী।

III

৫. শত্রুরা সবাই সমান খারাপ, এমন নয়। সবার মনের ঘৃণা বা শত্রুতাবোধও এক নয়। তারতম্য থাকে। সব খারাপ ক্ষতির দিক বিচারে এক নয়। তফাৎ থাকে। শত্রু হলেও কারো কারো মধ্যে কিঞ্চিৎ 'খাইর'-এর উপস্থিতি থাকতে পারে।

ভাইয়েরা সবাই একজোট হয়েই আপনাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। একজন ছাড়া সবাই বলেছে,

اَقْتُلُوا يُوسُفَ

ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো। (৯)

কিন্তু একজন এতটা নির্দয় নির্মম হতে পারেনি। বিবেকের দায় এড়াতে না পেরে বলে উঠেছে,

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

ইউসুফকে হত্যা করো না। (১০)

শত্রু মানেই আগাগোড়া খারাপ, তা কিন্তু নয়। এই ইঁশটুকু থাকা চাই। নইলে জুলুম হয়ে যাওয়ার শংকা থেকে যাবে।

III

৬. মনের গোপন ভয়ের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে নেই। কারণ, আপনার পিতা বলেছিলেন,

وَأَخَافُ أَنَّ يَأْكُلَهُ النَّاسُ

আমার ভয় হয়, নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে। (১৩)

এরই সূত্র ধরে ভাইয়েরা বাবাকে কথার মারপ্যাচে ফেলেছে। পাগলকে বলতে নেই,
-এ্যাই, সাঁকো নাড়বি না কিন্তু!

□

৭. নিখুঁত অপরাধ বলে কিছু নেই। অপরাধী অকুস্থলে কোনো না কোনো সূত্র রেখে যাবেই! কু ফেলে যাবেই। নিশ্চিহ্ন অপরাধ বলে কিছু নেই। অপরাধবিজ্ঞান এটাই বলে।

এতগুলো ভাই মিলে শলাপরামর্শ করল। কিন্তু জামাটা ছিঁড়তে ভুলে গেল। এটা সূক্ষ্ম নয়, স্থূল ভুল। এটা কেমন নেকড়ে, ভদ্রভাবে জামার বোতাম খুলে শিকার খায়? এত ভদ্র আর শিক্ষিত নেকড়ে হলে তো মানুষ খেত না!

□

৮. কোনো বস্তু অপরাধের মাধ্যম হলে, সেটা আজীবনের জন্য খারাপ বলে নিন্দিত হয়ে যাবে, এমনটা নয়। ছুরি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হয়, তাই বলে কি ছুরি খারাপ হয়ে যাবে? পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, তাহলে কি পিস্তল খারাপ? জি না। আপনার ঘটনায় দেখেছি, 'জামা' দিয়ে অপরাধের সূচনা হলেও, পরের দিকে জামা কল্যাণ আর উপকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। একবার হয়েছে দায়মুক্তির কারণ। আরেকবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কারণ। আমরা বস্তুটাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করছি, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

৯. দুনিয়া খুব একটা ভালো জায়গা নয়। আপনার মতো মানুষকে মাত্র কয়েক দেহহামে বিক্রি করা হলো, কেনা হলো! দুনিয়ার মোহে পড়া যাবে না। লোভে আসক্ত হওয়া যাবে না।

□

১০. মকতব-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি হলো মাধ্যম মাত্র! শিক্ষকগণও নিছক মাধ্যম। তারা প্রকৃত শিক্ষক নন। প্রকৃত শিক্ষক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই নানান উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেন। আপনাকে মিসরে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিল। কেন?

وَلِنَعْلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

কথাবার্তার সঠিক মর্ম শেখানোর জন্য। (২২)

জীবনচলার পথে কত কিছুই তো শিখি। এসব শিক্ষার পেছনে আল্লাহর ইশারা থাকে। তার কুদরতি হাত থাকে।

آيَةُ حُكْمًا وَعِلْمًا

আমি তাকে ইলম ও হিকমত দান করেছি। (২২)

আল্লাহ তা'আলার একটা সুনাত হলো, তিনি বান্দাকে তার তাকওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী ইলম দান করেন।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ كُفْرُ اللَّهِ

তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করবেন। (বাকারা: ২৮২)

এগুলো হৃদয়ের ব্যাপার। আকল বা মেধার নয়। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না, আল্লাহই এসব শিক্ষা দিয়েছেন। হৃদয় ও ঈমান দিয়ে বুঝতে হবে।



১১. একজন মহৎ ব্যক্তি কখনো নীচ হতে পারেন না। ক্ষুদ্র আচরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে ইহসান-সদাচারের বিনিময়ে অসদাচরণ করা অসম্ভব। সজ্জন ব্যক্তি যে কূপ থেকে পানি পান করে, সে কূপে থুথু ফেলে না। আপনি কী চমৎকারভাবে বলেছেন,

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

আল্লাহ পানাহ, তিনি আমার মনিব! তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন। (২৩)



১২. ভিক্ষা চাওয়ার সময় ভিক্ষুক নম্রতা অবলম্বন করে। এটাকে প্রকৃত বিনয় বলা যায় না। এই নম্রতার সাথে স্বার্থ জড়িত। একজন মানুষকে 'আমানতদার' কখন বলা যাবে? যখন তার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও 'খেয়ানত' করে না। একজন মানুষকে সচ্চরিত্রবান কখন বলা যায়? যখন স্বলন হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিষ্কলুষ থাকতে পারে!

আপনারও ওপথে পা-বাড়ানোর পরিপূর্ণ সুযোগ ছিল, প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতছানি ছিল। কিন্তু আপনি নিজেকে সংবরণ করেছেন। খেয়ানত করেননি। ব্যভিচারে লিপ্ত হননি। অনেক বড় শিক্ষা পেলাম হে আল্লাহর নবী!



১৩. নিষ্পাপ থাকা কারো নিজের একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচার ক্ষমতাও কারোর একার নেই। যদি না আল্লাহর তাওফীক

সঙ্গে থাকে। যে সুদিনে, সচ্ছলতার সময়ে আল্লাহর সাথে থাকে, আল্লাহ দুর্দিনে তার সাথে থাকেন।
আপনার জীবনকথা পড়েই এটা শিখতে পেরেছি! আপনি সব সময় আল্লাহর সাথে ছিলেন। নারীর পাতা ফাঁদে আপনিও জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন! আমরা সাধারণ মানুষ এসব দেখে ভরসা পাই!

□

১৪. আমরা যদি গুনাহ করতে না চাই, অন্যায় কাজ করতে না চাই, গোটা দুনিয়া মিলেও আমাদেরকে সে কাজে নামাতে পারবে না। তাই পরিবেশ-পরিস্থিতির অজুহাত দেয়া ছেড়ে দিয়েছি।

ফুয়াযা আপনার মনিবের স্ত্রী। দরজা বন্ধ করে আহ্বান জানাল। হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে ফুসলাল। কী নেই তার! রূপ যৌবন জীবন ক্ষমতা সবই আছে! কিন্তু আপনি শূন্য হাতেই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী ভঙ্গিতে বললেন,

-আমি এসব চাই না, (مَعَاذَ اللَّهِ) আল্লাহর পানাহ!

আপনার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা জীবনের পদে পদে কাজ দেয়। দিয়েছে। দিচ্ছে। দিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

□

১৫. আল্লাহ যখন চান একটা বিষয়কে প্রকাশ করবেন, তামাম দুনিয়া মিলেও সেটাকে গোপন রাখতে পারে না। সবাই ভীত! কেউ আপনার পক্ষে সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসছে না। তখন একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু আপনার পক্ষে উচ্চকিত হলো! আল্লাহ তার যবান চালু করে দিয়েছিলেন।

আমরা বিষয়টা ভুলে যাই। মনে করি পাপ করছি, কেউ দেখছে না। কেউ কিছু বলবে না।

□

১৬. কারাগারে থাকবে পাপীরা। অপরাধীরা। গুণ্ডা-বদমাশরা। খুনে-ডাকাতরা। চোর-ছাঁচোররা। কিন্তু আপনাকে দেখে সান্ত্বনা পাই! কখনো কখনো কারাগারে নিষ্পাপ মানুষকেও থাকতে হয়। বাধ্য হয়ে। এটা সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। পৃথিবীর শুরু থেকেই জুলুম চলছে।

□

১৭. ঈমানের স্বাদ জীবনের তিক্ততা ভুলিয়ে দেয়। আপনার ঈমানের মধুর অনুভব আপনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে কারাগারের তিক্ত বাস্তবতাকে। অথচ আপনি চাইলে, যদি (আল্লাহ না করুন) আপোষ করতেন, তাহলে বিরাট প্রাসাদে থাকতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রাসাদ তার বিশালতা সত্ত্বেও হয়ে পড়তো পাপাচারে সংকীর্ণ। পক্ষান্তরে ঈমানের কারণে সংকীর্ণ কারাগারকোষ্ঠ হয়ে পড়েছে বিশাল এক দুনিয়া। এসব আমাদেরকে বড় হিম্মত আর কুওয়াত যোগায়।



১৮. দাওয়াতের কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। স্থান-কাল-পাত্র নেই।
ক) দাস হয়ে প্রাসাদে থেকেও দাওয়াত দেয়া যায়। আপনি দিয়েছেন।
খ) বন্দী হয়ে কারাগারেও দাওয়াত দেয়া যায়। আপনি দিয়েছেন।
গ) শাসকের মসনদে বসেও দাওয়াত দেয়া যায়। আপনি দিয়েছেন।
আমাদের জন্য কোনো অজুহাতই আর বাকী রাখেননি।



১৯. সব বস্তুরই একটা মৌলিক গঠন-উপাদান আছে। মানুষেরও আছে। প্রতিটি মানুষের 'স্বভাব'-এরও একটা মৌলিক দিক থাকে। ভালো নয়তো মন্দ। এটার পরিবর্তন হয় না। যে কোনো পরিস্থিতিতেই যে যার আপন স্বভাবের উপরই থাকে।

জেলখানায় আপনাকে বলেছে,

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

আপনাকে আমরা সদয় আচরণকারী মনে করি। (৩৬)
তখন শাহীতে বসার পরও বলেছে, আপনাকে মুহসিন মনে করি।
আমরা যে ক্ষমতা পেয়ে বদলে যাই? আপনার আদর্শকে ধরে রাখতে পারি না
যে?



২০. অনেক বড় বড় পাপের পেছনেই থাকে 'হিংসা'। সৃষ্টির প্রথম পাপও ছিল 'হিংসা' কারণে। ইবলীস সিঁজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণ কী ছিল? হিংসা। জমীনে প্রথম পাপের কারণ কী ছিল? হিংসা। কাবিলের মনে হিংসা আর হিংসা! কেন তার কুরবানী কবুল করা হলো না। আপনাকে কুপে ফেলার পেছনেও সেই পুরনো কারণটাই ক্রিয়াশীল ছিল। হিংসা। হাসাদ। আমি এজন্য হিংসাকে হিংসা করতে শিখেছি, ঘৃণা করার শিক্ষা পেয়েছি। আমি হিংসাকে পরিহার করে চলব।

২১. খাদ্য-সংকট, দারিদ্র্য, বেকারত্ব কেন হয়? অর্থ-সম্পদের ঘাটতির কারণে? রাজস্বকরের কমতির কারণে?

-না, এমন নয়। বেশির ভাগ সময়ই সংকটই তৈরি হয়, অদক্ষ প্রশাসন ও অব্যবস্থাপনার কারণে।

আপনি জেলখানা থেকে বের হলেন। মিসরবাসীকে দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করলেন। অবাক করা বিষয় হলো, আপনি নতুন কোনো ঋণ-বিদেশী বিনিয়োগ-অনুদান ছাড়া, সেই পুরনো রাজস্ব দিয়েই সংকট দূর করেছেন। শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে সম্পদের সুষম বণ্টন করেছেন। তাতেই সমস্যা দূর হয়ে গেছে।

২২. হক ও বাতিলের যুদ্ধ চিরকালীন। আদি থেকে বহমান। কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। যুদ্ধ এক ধাঁচের, শুধু সৈন্যের পরিবর্তন হচ্ছে। আপনার সাথে যুলায়খার যুদ্ধও সেই পুরনো। প্রতি যুগেই এই যুদ্ধ ছিল আছে থাকবে। এটা পবিত্রতা আর অপবিত্রতার যুদ্ধ। ইফফাত এবং শাহওয়াতের যুদ্ধ। ভাইদের সাথে দন্ডটাও ভালোবাসা ও হিংসার দন্ড। আমরাও এই দন্ডের বাইরে নই। প্রতিনিয়ত এই চিরন্তন চিরায়ত দন্ডের সম্মুখীন হচ্ছি। আপনার কাছ থেকে প্রেরণা নিচ্ছি।

২৩. আগোছালভাবে কিছুই হয় না। কোনো লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। গন্তব্যে পৌছা যায় না। পরিকল্পনা আর ব্যবস্থাপনা ছাড়া বড় কাজ করা সম্ভব নয়। দুর্ভিক্ষ এসেছে, আপনি পরিকল্পনামাফিক কর্মসূচী দিয়ে সেটা দূর করেছেন। পুরো পরিবারকে মিসরে টেনে আনতে হবে, সুকৌশলে ছোট ভাইকে রেখে দিলেন!

আমরা শিখি সত্য, কিন্তু বাস্তবে কাজে লাগাতে পারছি কই! আপনার প্রতি শ্রদ্ধার শেষ নেই।

২৪. আল্লাহ তা'আলা একেকটা যুদ্ধের জন্য এমন এমন অস্ত্র বেছে নেন, কেউ আগাম কল্পনাও করতে পারে না, কী হবে সেই অস্ত্র। আল্লাহ তা'আলা চাইলে ফেরেশতা পাঠিয়ে কারাগারের দেয়াল ভাঙতে পারতেন। পারতেন আপনাকে বের করতে! কিন্তু বের করলেন কিভাবে? অকল্পনীয় অচিন্তনীয়ভাবে শাসকের মাথায় এক 'দুর্বোধ্য' স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিলেন। ব্যস, বাকী কাজ আপনা-আপনি হয়ে গেছে।



২৫. পদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? নিজেকে জাতে তোলা? নিজেকে সম্মানিত করা? উঁচুতে তোলা? উঁহ না, । আপনার কাছ থেকে শিখেছি, পদটা গ্রহণ করতে হবে দায়বোধ থেকে । বিবেকের তাড়না থেকে । আপনি খাদ্যবিভাগের দায়িত্ব নিজ থেকে নিতে চেয়েছেন, বিবেকের দায় থেকে । পকেটের খাই থেকে নয় । আপনার দৃঢ় প্রতিতি জন্মেছিল, আপনি দায়িত্বটা নিলে বিলি-বটনটা সুষ্ঠুভাবে হবে । মানুষের আসানী হবে । আপনার যদি জানা থাকতো, এই পদের জন্য আপনার চেয়েও যোগ্য কেউ আছে, তাহলে আপনি ভুলেও এমন প্রস্তাব পাড়তেন না ।



২৬. ভালোবাসারও ঘ্রাণ আছে । যে সে এই ঘ্রাণ পায় না । মাহবুবের ঘ্রাণ কেবল আরেক মাহবুবই পায় । অন্য কেউ নয় । আপনার জামা তখনো অনেক দূরে! কিন্তু বুড়ো অন্ধ বাপটা ঠিকই 'ইউসুফের' ঘ্রাণ পেয়ে গেছে!
ইউসুফ, বলুন তো! কী করলে এমন ঘ্রাণশক্তি অর্জন করতে পারবো?



২৭. সন্তানদের মাঝে আচরণগত ইনসাফ বজায় রাখা বাঞ্ছিত বিষয় । কোনো কোনো বাবা নিজের অজান্তেই এক সন্তানকে অন্যদের তুলনায় বেশি আদর দিয়ে ফেলেন । এতে অন্য সন্তানেরা মনে মনে হিংসায় জ্বলে উঠতে পারে । আপনার বাবা আপনাকে অন্য ভাইদের তুলনায় বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন । এটা তার ইচ্ছার বহির্ভূত ছিল । আল্লাহর ফয়সালাই এমন ছিল । ফাঁক দিয়ে লাভ হলো আমাদের । আমরা সতর্ক হতে পারলাম । কোনো এক সন্তানকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভালোবাসা দেবো না । তবে সন্তানের আচরণের কারণে, কারো প্রতি বেশি ভালোবাসা জন্মাতে পারে । এটাই স্বাভাবিক । সেক্ষেত্রে আমরা ভালোবাসাটা মনে রাখবো । আচরণে প্রকাশ পেতে দেবো না । ঠিক আছে না?



২৮. জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে । কিন্তু এসব কাউকে বলতে যাবো না । একমাত্র আল্লাহর কাছেই মনের অর্গল খুলে ধরবো । আমরা আপনার ঘটনায় দেখেছি মানুষ দু'প্রকার,
ক) প্রিয়জন । যে আমাকে ভালোবাসে ।
খ) অপ্রিয়জন । যে আমাকে অপছন্দ করে ।
আমার কষ্টে প্রিয়জন কষ্ট পাবে । কিন্তু সমাধান করতে পারবে না ।

আমার কষ্টে অপ্রিয়জন খুশি হবে। সমাধান করার প্রশ্নই ওঠে না।
কিন্তু একমাত্র আল্লাহই আমার কষ্টে পাশে থাকবেন। সমাধান করবেন।

□

২৯. মাঝেমধ্যে ভীষণ দোঁটানায় পড়ে যাই। সামনে পথ খোলা থাকে দু'টি।
ক)পাপের পথ। সুদের চাকরির পথ। ঘুষের চাকরির প্রাচুর্যের পথ। তাগুতের
সাথে আপোষের পথ। মিথ্যার পথ। মুসলিম গণহত্যায় অংশ নেয়া দেশে
চাকুরির পথ।

খ) তাকওয়া'র পথ। স্বল্প বেতনের হালাল রুজির পথ। অভাবের পথ।
আমি কোনটা বেছে নেবো? এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন আপনিও হয়েছিলেন।
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'টি পথের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার
দিয়েছিলেন। আপনি কোনটা বেছে নিয়েছিলেন?

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَذْغُونَنِي إِلَيْهِ

এই নারীরা আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা
কারাগারই আমার বেশি পছন্দ। (ইউসুফ: ৩৩)

আমারও এবার বেছে নেয়ার পালা। সবার বেছে নেয়ার পালা। যে যার
তাকওয়া অনুযায়ী পথ বেছে নেবে।

□

৩০. মাঝেমধ্যে মনে হয়, আর বাঁচার উপায় নেই; সব শেষ হয়ে গেছে।
আত্মহত্যা করাই একমাত্র উপায়। সামান্য খড়কুটোও নেই যে আঁকড়ে ধরা
যাবে। কিন্তু কুরআন বলছে ভিন্ন কথা।

جَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ

একটি যাত্রীদল এল। তারা তাদের একজন লোককে পানিআনতে
পাঠালো। (ইউসুফ: ১৯)

ভাইয়েরা আপনাকে অন্ধকার কূপে ফেলে চলে গেল। বাবা জানতেও পারবেন
না। মিথ্যা বলে তাঁকে বুঝ দেয়া যাবে। কিন্তু তারা আল্লাহর কথা ভুলে
গিয়েছিল। তাদের মাথায় ছিল না, বাবা না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই দেখছেন।
শয়তান তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে আপনার বাঁচার কোনো
আশাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিকই একটি যাত্রীদল পাঠিয়ে দিলেন।
হতাশা ও কষ্টের সাগরে ডুবে থাকলেও আমাকে এটা মনে রাখতে হবে,
-আল্লাহ তা'আলা ঠিকই সময়মতো 'আশার কাফেলা' পাঠিয়ে দেবেন! যেমনটা
আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। একটু ধৈর্য ধরতে হবে!



শুকরান! ইয়া সাইয়েদী!
সত্যি সত্যি আপনার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা!
আলাইকাস সালাম!
আমাদের নবীকেও সালাম!
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

ইউসুফি সৌন্দর্য

সূরা ইউসুফ পুরোটাই হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রশংসা । পুরো সূরা জুড়েই তার গুণপনার কথা আলোচিত হয়েছে । কি কি গুণ?

- ☞ আলিম [عَلِيمٌ]: জ্ঞানী ।
- ☞ হাকিম [حَكِيمٌ]: প্রজ্ঞাবান ।
- ☞ মুহসিন [مُحْسِنٌ]: সৎকর্মশীল । অনুগ্রহকারী ।
- ☞ সিদ্দীক [صِدِّيقٌ]: পরম সত্যবাদী ।
- ☞ সাবির [صَابِرٌ]: ধৈর্যশীল ।
- ☞ তাকি [تَقِيٌ]: আল্লাহভীরু ।



কী বোঝা গেল? তাকে পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে? কই সৌন্দর্যের জন্য তো 'জামাল' বা 'জামীল' গুণবাচক কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলো না? শুধু ইশারায় এক জায়গায় নারীকে হাত কেটে ফেলার কথা আছে । পরোক্ষ সৌন্দর্য বর্ণনা । কিন্তু শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে কিছু গুণাবলীর । তাহলে?

“সৌন্দর্য নয়, গুণাবলীই আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় । ধর্তব্য ।”

নবীওয়ালা সুন্নত

এই সুন্নাতগুলো বোঝার জন্য, সূরা ইউসুফ ও ইউসুফ আ.-এর ঘটনা মোটামুটি জানা থাকলে ভালো । তাহলে সুন্নাতগুলো সহজে ধরতে পারা যাবে । সূরা ইউসুফ পড়ে দুই নবী (ইয়াকুব ও ইউসুফ আ.)-এর কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে ।

- ☞ সন্তান হারিয়ে কাঁদা দোষণীয় নয় । নবীওয়ালা সুন্নত ।
- ☞ অপেক্ষা যত দীর্ঘই হোক, আশা না হারানো নবীওয়ালা সুন্নত ।
- ☞ সন্তান যত বড় অপরাধই করুক, মাফ করে দেয়া নবীওয়ালা সুন্নত ।

- ৩ যত বড় বিপদই হোক, আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ শুধু বাবা-মাকে দেখতে যাওয়া নয়, খোদ বাবার-মায়েরও সন্তানকে দেখতে যাওয়া নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ বাবা-মাকে ছেড়ে, বিদেশে বা শহরে প্রয়োজনে 'জব' করতে যাওয়াও দোষণীয় নয়।
- ৩ 'জব' করতে গিয়ে বাবা-মাকে না ভুলে, বুড়ো-বুড়িকে শহরে নিজের কাছে এনে রাখাও নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ চাকুরে ছেলের রুজিতে বুড়ো বাবা-মায়ের জীবন-যাপন দোষণীয় নয়।
- ৩ বেকার বড় ভাইকে নিজের রুজির অংশ দিয়ে, সম্পত্তির ভাগ দেয়াও নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ বুড়ো-বুড়ি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে না চাইলে, কৌশলে নিয়ে আসাও নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ নিজে প্রতিষ্ঠিত হলে, আমার প্রতি ভাইদের পূর্বের শত্রুতামূলক আচরণ ভুলে তাদের চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেয়াও নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ সরকার দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ হলে, তার অধীনে চাকরি করাও দোষণীয় নয়।
- ৩ সুন্দরী ললনা 'প্রপোজ' করলে, তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করাও নবীওয়ালা সুন্নত। শুধু সুন্নতই নয়, সমস্ত নবীর আদর্শও বটে।
- ৩ গ্রাম ছেড়ে উন্নত জীবনে আশায় শহরে আসাও নবীওয়ালা সুন্নত।
- ৩ খাদ্যবিভাগে চাকরি করাও দোষণীয় নয়। তবে নিয়ত হতে হবে উম্মতের খেদমত।
- ৩ মন্ত্রীপরিষদে যোগ দেয়াও নবীওয়ালা সুন্নত। যদি সরকার ন্যায়পরায়ণ হয় এবং আল্লাহর আইনে দেশ শাসন করে।
- ৩ সরকারি চাকরি থেকে পদোন্নতি পেয়ে সরকার প্রধান হওয়াও দোষণীয় নয়।
- ৩ ব্যস্ততার কারণে নিজে না গিয়ে বাবা-মাকে অন্যের মারফতে নিয়ে আসার মধ্যে বেয়াদবির কিছু নেই। এটাও নবীওয়ালা আমল।
- ৩ বিদেশে চাকরি বা পড়াশোনা করতে গিয়ে বিয়ে থা করে সেখানে সেটেল হয়ে যাওয়াও দোষণীয় নয়। এটা অবশ্যক কিছু নয়। সেটেল হয়েছেন ইউসুফ আ.। ফিরে এসেছেন মূসা আ.।

সরকারের জুলুমের কারণে, বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়াও সন্দেহীয় নয়। সরকার বদল হলে বা অবস্থার পরিবর্তন হলে ফিরে আসারও নদীওয়ালা আমল। মুসা আ. বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ফিরে এসেছেন।

মাদরাসাতু ইউসুফ

- (ক) অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়।
- (খ) বিপদাপদ বেশিদিন থাকে না।
- (গ) হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ফিরে আসে।
- (ঘ) শোকাহত ব্যক্তিও এক সময় আনন্দিত হয়।
- (ঙ) সাধারণ মানুষও জ্ঞান-গুণ থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে।
- (চ) ভাইয়েরা যতই শত্রুতা করুক, ক্ষমা করলে নিজের মর্যাদা বাড়ে।
- (ছ) নিজের যোগ্যতা থাকলে, অসংকোচে যেতে গিয়ে, চাকরির জন্য বায়োডাটা দেয়া যেতে পারে। খোদ ইউসুফ আ. এমনটা করেছেন।

নবীর আদর্শ

ইউসুফ আ.-কে আমার খুব ভালো লাগে। তিনি যেমন সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, ঠিক তেমনি তার ভদ্রতাবোধও ছিল অসাধারণ রকমের উচ্চ পর্যায়ের। তার কাছ থেকে আমি অনেক অনেক আদব শিখি। বড়ই শরীফ তার মেজাজ-মর্জি।



আমরা সূরা ইউসুফে আছি। আপন ছোট ভাই বিন ইয়ামিনের কাছে বোয়া যাওয়া 'রাজকীয় পানপাত্র' পাওয়া গেল। অন্য ভাইয়েরা নিজেদের বাঁচাতে সাথে সাথে বলে উঠলো,

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرِقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ

شُرُكَاؤُنَا وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

যদি সে চুরি করে থাকে, (এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই!) এর আগে তার ভাই (ইউসুফ)-ও চুরি করেছিল! ইউসুফ ব্যাপারটা (মনের মধ্যে) লুকিয়ে রাখলেন, তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। (৭৭)

ভাইয়েরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। ইউসুফ চুরি করেননি। কিন্তু তারা তো তখনো ইউসুফকে চিনতো না। তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে। সত্য প্রকাশ করে ভাইদেরকে হাতেনাতে লজ্জা দিতে চাইলেন না। মনের কষ্ট মনেই রেখে দিলেন।



এক. আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় কথা দিয়ে, আচার-ব্যবহার দিয়ে নানা রকমের কষ্ট দেয়। তাদের দেয়া কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করা, নবীওয়ালা সুনত। ভদ্রতা। তবে হ্যাঁ জুলুম করলে, সেটা ভিন্ন কথা!

দুই. সামান্য একটা বাক্য, কয়েকটা কথা কি জন্মের সম্পর্কে ছিন্ন করে দিতে পারে? ভাই-বোন, চাচা-মামা বলুক না যা ইচ্ছে, গালি দিক না! একজন নবীর আদর্শ মেনে, কষ্টটা বুকে গহীনে পুঁতে ফেলতে বাধা কোথায়?

তিন: দুর্জনের কথা শুনে নিজের ভালো কাজের উৎসাহ কেন হারিয়ে বসবো? এটা নবীর আদর্শবিরোধী কাজ হয়ে যাবে না!

কী সুন্দর মানুষ! কী সুন্দর আদর্শ! আরে, যুলায়খা কি এমনিতে প্রেমে পাগল হয়েছিল! যুলায়খার কথাই শুধু বলি কেন, শহরের অন্য মেয়েগুলো তো রীতিমতো হাতই কেটে ফেলেছিল! আহা বেচারিরা!

ওহো! তাই বলে এটা মনে করা যাবে না: পুরো শহরের নারীকুলের 'হার্টথ্রব' হওয়াও বুঝি...! এটা শয়তানের এলাকা। একমাত্র শয়তানি চিন্তার পুরুষই বেগানা নারীদের কাছে 'হারাম তরীকায়' প্রিয় হতে চাইবে। দুটো মন সব সময় শয়তানি চিন্তার দিকে ঘোরে! আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউযুবিল্লাহ। আলাইহিস সালাম!

সুচিন্তা

ভাইয়েরা পরামর্শে বসেছে। ইউসুফকে নিয়ে তারা কী করবে। বেশিরভাগই হত্যার পক্ষে পরামর্শ দিল। শুধু এক ভাই ব্যতিক্রমী মতামত পেশ করল,

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না। বরং তাকে কোনো এক অন্ধকূপে ফেলে দাও, যাতে কোনো কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (সূরা ইউসুফ: ১০)

৩ (এক) ছোট্ট একটা পরামর্শ, ইতিহাসই বদলে দিয়েছে। শুধু মিসর নয়, বিশ্বের। ভাইয়ের পরামর্শে ইউসুফকে হত্যা করা হলো না। বেঁচে গেলেন তিনি। মিসরে এলেন। দুর্ভিক্ষমুক্ত করলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। পরে পরিবারের বাকীরা এল। এই বংশে মূসার আ.-এর মতো মহান নবীও মিসরে জন্ম নিলেন। ফির'আওন বধ হলো। তাওরাত এল। আরও কত কি!

৪ (দুই) যত তুচ্ছ বিষয়েই হোক, মানুষের কল্যাণকামিতা থেকে পিছপা না হওয়া।

৫ (তিন) আশেপাশের মানুষ যতই বৈরি হোক, নিজের সুচিন্তা প্রকাশে দ্বিধা না ভোগা।

৬ (চার) কেবল ভিন্নমত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, পাশপাশি উদ্ধারের পথও বাতলাতে হবে। নইলে ভিন্নমত ধোপে টিকবে না।

৭ (পাঁচ) পরামর্শ করতে অভ্যস্ত হওয়া। মন্দ কাজের ইচ্ছা হলেও পরামর্শ করতে বসা। বলা যায় না, পরামর্শের বদৌলতে মন্দ অভিপ্রায় থেকে ভালো কিছুতে উত্তরণও হয়ে যেতে পারে।

৮ (ছয়) নিজেকে ইতিবাচক চিন্তায় অভ্যস্ত করে তোলা অত্যন্ত জরুরী। ছোট্ট একটি চিন্তা বদলে দিতে পারে অনেক কিছুই।

আশাবাদ

বুড়ো মানুষটার বয়েস প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই। ছেলে হারিয়েছেন সেই কবে! ত্রিশ-চল্লিশ বছরের কম হবে না। ক'দিন আগে আরো দুই ছেলেও কাছছাড়া হয়ে গেছে। তারপরও বুড়ো কী বলে?

-আমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করে যাব (فَصَبِرْ جَوِيلًا)!

এত কিছুর পরও বুড়ো আশাবাদী।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

আল্লাহর আমার সব ছেলেকে আমার কোলে ফিরিয়ে দেবেন! (সূরা ইউসুফ: ৮৩)

□□□

একটা মানুষ এত দীর্ঘ সময় আশাবাদী কিভাবে থাকলেন? কান্দতে কান্দতে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারিয়েছেন। কী অসাধারণ পিতৃত্ব! আলাইহিস সালাম।

অপত্য স্নেহ

কান্দতে কান্দতে বুড়ো বাবার দু'চোখ শাদা হয়ে গেছে। শোকে। কষ্টে।

وَايْتَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ

আর শাদা হয়ে গেল তার দু'চোখ, শোকের কারণে! (সূরা ইউসুফ: ৮৪)

□□□

বাবার চোখ শাদা হলো, চোখ মুছতে মুছতে। ছেলে হারানোর বেদনায়। কিন্তু ছেলে ইউসুফের চোখ অক্ষত রইলো যে! তাহলে কি সর্বকালেই, বাবারাই সন্তানকে বেশি ভালোবেসেছেন? আর অকৃতজ্ঞ ছেলেগুলো বাবাকে...। না না, ইউসুফ আ. অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনিও বাবাকে মনে রেখেছেন। তবে বাবার মতো করে মনে রাখতে পারেননি, এই যা!

স্বপ্নের সূরা

সূরা ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আহসানাল কাসাস'। সুন্দরতম গল্প। আমার মনে হয়, সূরাটার আরেক নাম 'স্বপ্নের সূরা' হতে পারে।

একজন নবীর স্বপ্নের কথা আছে। একজন রাজার স্বপ্নের কথা আছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সূরাটা শুরু হয়েছে স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে। শেষ হয়েছে স্বপ্নপূরণের মাধ্যমে।

তাহলে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর কাছে স্বপ্নের গুরুত্ব কম নয়। আমারদেরও উচিত স্বপ্ন দেখা। সেটা বাস্তবায়নের জন্য মুজাহাদা চালিয়ে যাওয়া। তবে স্বপ্নটা অলীক না হওয়াটা কাম্য।

ফেরতযোগ্য পণ্যমূল্য

সারাদিন কুরআন কারীমের একটা বাক্যই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে,

هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

আরে এ যে আমাদেরও দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে! (সূরা ইউসুফ: ৬৫)

ভাইয়েরা খাদ্যশস্য কিনতে মিসর এসেছে। টাকাপয়সা নিয়ে। কেনানে (কিলিস্তিনে) তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ চলছে। ইউসুফ আ. ভাইদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, এদের পণ্যমূল্য গোপনে খাদ্যশস্যের সাথে দিয়ে দাও!

ভাইয়েরা বাড়ি ফিরে বস্তা খুলে অবাক!

আরে, আমাদের টাকা তো ফেরত দিয়ে দেয়া হয়েছে!

□□□

মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে, এমন এক কাফের রাষ্ট্রে হামলা করার পর, মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা বার্তায় লেখা হয়েছে,

هذه بضاعتك ردت إليك

এই নাও, তোমার পণ্যমূল্য তোমাকেই ফেরত দেয়া হলো!

মনোচিকিৎসা

আমার মনখারাপ ভাবটা সব সময় লেগেই থাকে। নানাজন নানা পরামর্শ দিয়েছে। তাদের কথা মেনে দেখেছি। কিছু হয়নি। বিষণ্ণতা রোগ পিছু ছাড়ছে না। কাজে মন বসে না। সংসারে সুখ পাই না। খাওয়া-দাওয়ায় আগ্রহ পাই না। সারাক্ষণই অজানা কী এক ভাবনা ভেতরটাকে কুরে কুরে খায়! ভয়, একটা কিছু করুন! মাঝেমধ্যে মনে হয়, আত্মহত্যা করে ফেলি!

-আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান!

-কিছুই বাদ রাখিনি! অনেক টাকা ফি দিয়েছি। আপনি জানেন বোধ হয়, আমেরিকার বেশির ভাগ মানুষই কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভোগে! তারা মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যায়। গাঁটের পয়সা খরচা করে, ডাক্তারের কাছে সব কথা বলে মনটা হালকা করার জন্য! আমিও ওদের দেখাদেখি গিয়েছি। কাজ হয়নি! উল্টো ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেহঘড়ির বারোটা বেজেছে। ঘুমের অভ্যেস পুরো বদলে গেছে। ডাক্তারকে জানিয়েছি! তিনি বলেছেন প্রথম প্রথম এমন হবে! পরে ঠিক হয়ে যাবে! ঠিক তো হয়ইনি, বরং আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে!

-আপনি বিশ্বের সেরা ডাক্তারদের দেখিয়েছেন। আমি সাধারণ একজন গ্রামে পড়ে থাকা মানুষ! কী করতে পারি?

-গ্রামের বাড়িতে ফেরার পর, আমার সমস্যা জানার পর, এক আত্মীয় বললো: আপনি নাকি কী সব তদবির করেন! কুরআন-হাদীস পড়ে ঝাঁড়ফুক করেন! সাথে ওষুধপাতিও খেতে দেন!

-তা দিই। কিন্তু আপনার মতো রুগি আমার কাছে আগে কখনো আসেনি। আমি আমার ওস্তাদের কাছে এ-বিষয়ে কিছু শিখিনি।

-একটা কিছু করুন! শুনেছি কুরআন মানুষের জন্য আরোগ্যের কাজ করে!

-আপনি কুরআন পড়তে পারেন?

-ছোটবেলায় পড়েছিলাম। দেশ ছাড়ার পর আর পড়া হয়নি। পারি কিনা জানি না। তবে আমি ছয়র, চেষ্টা করলে নতুন কিছু শিখতে বেশি সময় লাগে না! আপনি বলুন কী করতে হবে!

-বেশি কিছু করতে হবে না। কুরআন কারীমে একটা সূরা আছে।

-কোন সূরা?

-সূরা ইউসুফ! আপনাকে সেটা পড়তে হবে। যখনই মন খারাপ হবে, আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দিবে, মনের ওপর জোর খাটিয়ে সূরাটা পড়ে নিবেন বা শোনার ব্যবস্থা করবেন। কেউ আছে পড়ে শোনানোর মতো? না থাকলে একজন হাফেযের ব্যবস্থা করতে পারি! এত আশা করে এসেছেন আমার কাছে!

-রেকর্ড শুনলে হবে?

-ও আচ্ছা, মনে ছিল না। হবে। এক সপ্তাহ পর আবার আসবেন!



দুদিন পরই প্রবাসী ভদ্রলোক এলেন, কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেন,

-আমার আফসোস হচ্ছে!

-কিসের আফসোস?

-কেন যে আরো আগে দেশে এলাম না, তাহলে আপনার সাথে দেখা হত!

-সূরা ইউসুফ পড়ার পর ভালো লাগছে বলছেন?

-জি, অন্যরকম এক শীতল অনুভূতি মনের মধ্যে কাজ করছে! ভেবেছিলাম কুরআন কারীম পড়াটা একদম ভুলেই গেছি! কয়েকবার শুনে শুনে কুরআন কারীমে আঙুল মেলানোর পর, আর শুনতে হয়নি, আস্তে আস্তে ঝাপসা ভাব কেটে গেছে। এখন চালু করে না হলেও, মোটামুটি 'হেজ' করে পড়তে পারছি!

-আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তদবিরটা কাজে লাগবে। কারণ সূরাটা নাখিলই হয়েছে সান্ত্বনার জন্য। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য।

-কারণ?

-নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। সূরাটা নাখিল হয়েছে শোকের বছর। প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মারা গেছেন। অতি আপনজন চাচাও চলে গেছেন। শে'বে আবু তালেবে অবরুদ্ধ ছিলেন। কুরাইশদের কেউ বনু হাশেমের সাথে কেনাবেচা পর্যন্ত করতো না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কষ্টের সময়

সূরা ইউসুফ পড়ে সান্ত্বনা লাভ করতেন। আর সূরা ইউসুফ পুরোটাতেই নানা সমস্যা-সংকটের কথাই আলোচিত হয়েছে।

-আমার মতো নামধারী বকধার্মিকরা কতো কিছুই যে জানি না। সমস্যাগুলো কেমন ছিল? আমার সাথে মিল আছে?

-সূরায় রাজনৈতিক সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, চারিত্রিক সমস্যা, নারীঘটিত সমস্যা, প্রচারমাধ্যম বিষয়ক সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। সূরাটিতে মানবীয় অনেক অনুভূতির কথা আলোচিত হয়েছে। মজলুমের অনুভূতির কথা আলোচিত হয়েছে। শোক-সন্তাপ, দুঃখ-কষ্ট, মিলন-বিচ্ছেদসহ আরও আরও নানা অনুভূতির কথা আলোচিত হয়েছে।

-শুধু সমস্যার কথাই আলোচিত হয়েছে?

-জি না, সমাধানও আছে। এ সূরায় সবরের ফলাফল দেখানো হয়েছে। সংকটে আস্থার রাখার ফলাফল দেখানো হয়েছে। অবিচল ঈমানের ফলাফল দেখানো হয়েছে। নুসরতের ফলাফল দেখানো হয়েছে। আনন্দের অপূর্ব রূপ দেখানো হয়েছে।

-এক সূরাতেই এতকিছু?

-জি। আপনার যত প্রকারের সমস্যা হতে পারে, আপনার যত ধরনের মানসিক সংকট হতে পারে, আপনি খেয়াল করে পড়লে, সূরাটাতে খুঁজে পাবেন।

-এবার স্টেটসে ফিরে গেলে নিজেই একটা, ফার্ম খুলে বসতে পারবো। মানুষের কষ্ট দূর করতে সাহায্য করতে পারব।

-সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহ নিজেই সূরার ভূমিকাতে বলে দিয়েছেন, 'আমি আপনাকে এক সুন্দরতম গল্প শোনাতে যাচ্ছি'

কল্পনা করতে পারেন, আল্লাহ স্বয়ং নবীজিকে আদর করে, ভালোবেসে গল্প শোনাতে উদ্যত হয়েছেন! হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভারাক্রান্ত মনটা নির্ভর করতে উদ্যোগী হয়েছেন!

আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে! সম্বোধনটা নবীকে করা হলেও, বর্তমানে কিন্তু আল্লাহ আপনাকেই সম্বোধন করছেন!

-আ আ আমাকে! আমাকে! আমাকে! ওহ আল্লাহ!

মেধাবী নির্বোধ!

১ (এক)

কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলে মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছুই বোঝা যাবে না। গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছি। চিন্তায় কিছুই ধরা দেয় না। চিন্তার দিকে মন যায়ও না। তবুও পড়ে যেতে ভালো লাগে। আবার কখনো ব্যতিক্রমও হয়। কুরআন কারীমই একমাত্র কিতাব, যা বুঝে পড়লেও লাভ, না বুঝে পড়লেও লাভ। বুঝে পড়লে হিদায়াত লাভ হয়, না বুঝে পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। হালের কিছু অবিস্ময়কারী বলে বেড়ায়, না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই। পরিষ্কার হাদীস-বিরোধী কথা! সাধারণ মানুষকে কুরআন কারীম থেকে দূরে সরানোর কূট-ফন্দি!

III

সূরা ত্বাহা কুরআন কারীমের ঘটনাবহুল সূরাগুলোর একটি। মূসা আ.-এর ঘটনাই মূলত এখানে আলোচিত হয়েছে। সামেরীর কথা পড়তে গিয়েই মূলত 'নির্বোধ মেধাবী' কথাটা মাথায় এসেছিল। গত চারদিন আগে। সাথে সাথে লিখতে বসলে অনেক কিছুই হয়তো লেখা যেত। লিখতে বসতে বিলম্ব করায় লেখার মূল ভাবটা হারিয়ে গেলেও, লাভের ঘরটা শূন্য থাকেনি। বনী ইসরাঈলের ইতিহাসটা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়া গেছে। মূসা আ. গেছেন তুর পাহাড়ে। চল্লিশ দিনের 'চিল্লা'তে। আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে। দুষ্ট বনী ইসরাঈল এই ফাঁকে তেড়িয়া হয়ে উঠল। তারা ফির'আওনের ধাওয়া খেয়ে সিনাইতে আশ্রয় নিয়েছে। সাথে ছিল কিবতীদের স্বর্ণ। আমানত বা গনীমতসূত্রে পাওয়া। কোনোটাই তাদের শরীয়তে বৈধ ছিল না। হারুন আ. নির্দেশ দিলেন স্বর্ণগুলোকে একটা গর্তে ফেলতে। সবাই ফেলল। আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। গলে একটা তালে পরিণত হলো স্বর্ণগুলো।

III

সামেরী ছিল একটু ব্যতিক্রম। গর্তের স্বর্ণগুলো নিয়ে সে একটা গো-বৎস তৈরি করল। নিজীব স্বর্ণবাছুরের মধ্যে একমুঠো বালু ফেলে দিল। ব্যস সাথে সাথে মৃতবৎস হাম্বা হাম্বা রবে ডেকে উঠলো। সবাই অবাক! সামেরীর গর্বিত বক্তব্য, -কী দেখছ! এটাই মূসার রব! আসল রবকে ভুলে মূসা তুর পাহাড়ে গেছে! অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গো-বৎসের অর্চনায়। হারুন আ. চেষ্টা করেও ফেরাতে পারলেন না।

III

আল্লাহ মানুষকে মেধা দান করেন, কেউ সেটাকে ভালো কাজে লাগায়, কেউ মন্দ কাজে। বনী ইসরাঈলে তখন অনেক লোক ছিল। কিন্তু সবার চেয়ে সামেরী ছিল ব্যতিক্রম। তার ছিল প্রখর পর্যবেক্ষণশক্তি। সূক্ষ্ম হিশেববোধ! মাথা ছিল কূটবুদ্ধিতে টইটম্বর!

■

জিবরাঈল আ. নিয়মিতই আসতেন মূসা-হারুন আ.-এর কাছে। ঘোড়ায় চড়ে। সবাই সেটা দেখতো। একা সামেরীরই চোখে পড়লো, জিবরাইলের ঘোড়া যেখানে পা ফেলে, সেখানে রুখাসুখা বালুতেও সাথে সাথে ঘাস গজিয়ে যায়! অন্যরাও হয়তো বিষয়টা খেয়াল করেছে, তবে অতশত তলিয়ে দেখতে যায়নি। কিন্তু সামেরী ব্যতিক্রম! সে মাথা খাটিয়ে বুঝতে পেরেছিল, ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটিগুলোতে 'প্রাণ' আছে। এগুলোর সাথে মৃত কিছুর স্পর্শ হলেই, তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে! বাস্তবেও তাই ঘটলো। সামেরী নিশ্চয় আগেই ল্যাবরেটরিতে 'এক্সপেরিমেন্ট' চালিয়েছিল, নইলে এত আত্মবিশ্বাসের সাথে কিভাবে সবার সামনে গো-বৎসের মধ্যে বালু ঢেলে দিয়েছিল!

■■■■

২ (দুই)

সামেরীরা ছিল মিসরে 'ইমিগ্রান্ট'। অভিবাসী। তারা মূলত ফিলিস্তিনের লোক। মিসর ছিল তাদের জন্য কলোনি। সেই ইয়াকুব আ.-এর সাথে সবাই মিসরে এসেছিল। আর যাওয়া হয়নি। আজো তারা মিসরে আছে। মূর্তিপূজারীদের সাথে থাকতে থাকতে, তাদের কৃষ্টি-কালচারের প্রভাব বনী ইসরাঈলের ওপরও পড়েছিল। জাদুবিদ্যা, স্বর্ণবেচাকেনা, মিসরীয়দের মতো গোমূর্তি (ওপিষ)-প্রীতি ইত্যাদি। সামেরীও ছিল সাংস্কৃতির অগ্রাসনের শিকার। তার ব্রেনটাও ড্রেনের কাজ দিয়েছে। ভালোটা না নিয়ে, মন্দটা নিয়েছে।

■

-হালেও, আমাদের অনেকে পাশ্চাত্যে পড়তে যায়, ভারতে পড়তে যায়, তারাও মেধাবীই বটে। কিন্তু তাদের কারো কারো মেধা সেখানকার ভালোটা না নিয়ে, মন্দটাই নেয়। অথচ সেই বনী ইসরাঈলেও ভালো মানুষ ছিল। তারা কিবতীদের অপ্রথা-কুপ্রথা প্রভাবিত হয়নি। তাদের গুরুদেবতা ওপিষের প্রেমে মুগ্ধ হয়নি। তাওহীদের প্রতিই অটল-অবিচল ছিলো।

■

আমাদের যুগেও সবাই কিন্তু সামেরী নন, কিছু 'মুয়াহহিদ'ও আছেন। যারা আজীবন পাশ্চাত্যে থেকেও, তাদের মন্দ দিকগুলো নিজের মধ্যে 'আসর' করতে দেননি। তবে হ্যাঁ, তাদের ভালো দিকগুলো দু'হাতে আঁজলাভরে নিতেও কসুর করেননি।

আমাদের যুগেও সামেরীর মতো 'মেধাবী নির্বোধ'গুলোই সব সময় ফঁাকড়া বাঁধায়। তাদের কানে আযানের সুমধুর ধ্বনি অন্য কিছু হয়ে পৌঁছে! তাদের কর্ণকুহরে ওয়াজের সুললিত স্বর, কুললিত হয়ে সমে!



এ-ধরনের মেধাবী নির্বোধের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। অথবা বলা যায় বেড়েই ছিল, কিন্তু প্রকাশ পায়নি। ভয়ে। এখন সুযোগ বুঝে, লাই পেয়ে, আশকারা পেয়ে মাথা তুলে ঘাই মারছে।

মূসা আ.-এর অনুপস্থিতির সুযোগেও সামেরী গংরা সাহস পেয়েছিল। আর এখন সাহস পাচ্ছে, মূসার উত্তরসূরীদের নিষ্পৃহতার কারণে, সাহসহীনতার আর কাপুরুষতার কারণে, তাগুতের মুদাহানত আর কিতালভীরুতার সুযোগে নব্য সামেরীরা নিত্য নতুন নামে মাথা চাড়া দিয়ে ঘাই মারছে!



মূসা ফিরে আসার পর, আবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মূসারা কবে ফিরবে?

ফির'আওন!

কুরআন কারীমে বহুল আলোচিত একটা নাম হলো ফির'আওন। তাকে নিয়ে কিছু ভাবনা পেশ করা যাক।

১. সৈরাচারী শাসকের নিখুঁত প্রতিকৃতি। একদলীয় শাসনের দক্ষ কারিগর। মনে হয় ফির'আওনই বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম বাকশাল (কিবতীয়) কায়ম করেছিল। কোণঠাসা করে রেখেছিল তৎকালীন বিরোধী দল বনী ইসরাঈলকে। তবে হ্যাঁ, ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থায় কোনো সরকারি দল বা বিরোধী দল বলে কিছু নেই। খিলাফত ব্যবস্থায় থাকবে মজলিসে শূরা।

২. আল্লাহর কুদরতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। হাজার হাজার শিশুকে জবেহ করেছে, মূসা যেন আসতে না পারে। যার আগমন ঠেকাতে এত আয়োজন সে ঠিকই এসে গেল। খোদ তার ঘরেই লালিত-পালিত হলো।

৩. মানুষের হৃদয়ের মালিক আল্লাহ। মানুষের হাতে এর নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই। কখন কার মনকে আল্লাহ কোন দিকে ঘুরিয়ে দিবেন আগে থেকে বলা যায় না। ফির'আওন চেয়েছিল মূসাকে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত করবে। আল্লাহর ফির'আওনের স্ত্রীর হৃদয়কেই শিশু মূসার প্রতি আবৃষ্ট করে দিলেন। এক মায়ের জায়গায় আল্লাহ দুই মায়ের ব্যবস্থা করলেন।

৪. মানুষ চাইলেই আরেকজনকে নষ্ট করতে পারে না। বিভ্রান্ত করতে পারে না। গোমরাহ করতে পারে না। সে লোক যতবড় ক্ষমতাধরই হোক না কেন? ফির'আওনও পারেনি। সে দরবারে বাসে দস্তোজি করছে,

أَرَبُّكُمْ الْأَعْلَى

আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব। (নাযিআত: ২৪)

অথচ পাশের কামরাতেই স্ত্রী আসিয়া বলছেন,

-সুবাহা-না রাব্বিয়াল আ'লা (আমার শ্রেষ্ঠ রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

৫. প্রতিটি ঘরেই হাজারো রহস্য লুকিয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রী এক ছাদের নিচে বাস করে সত্য, কিন্তু চিন্তাটা এক থাকে না। একজন দাস বানাতে চায় মানুষকে। আরেকজন দাসী হতে চায় মানুষের স্রষ্টার।

৬. একজন মুমিন ঈমানের ওপর অটল থাকলে পুরো একটা দেশের সম্মিলিত শক্তিও কিছু করতে পারে না। সমস্ত জাদুকর মিলেও কিছু করতে পারেনি। উল্টো মূসার অনুসারী হয়ে গেছে।

৭. রক্তের সম্পর্ক বড়ই শক্তিশালী। শত ভয় থাকা সত্ত্বেও ভাই তার ভাইয়ের জন্য, বোন তার ভাইয়ের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে। মূসার বোন জানতেন, রাজপ্রাসাদে গেলে তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে। কিন্তু ভাইয়ের টানে না গিয়ে পারেননি। প্রয়োজনের সময় চুপ করেও থাকতে পারেনি। ভাই কারো দুধই পান করছে না দেখে এগিয়ে গিয়ে নির্ভয়ে বলেছে,

هَلْ أَذْكَرُ عَلَى أَهْلِ يَسْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُوَ لَهُ نَاصِحُونَ

শেষে মূসার বোন বলল, আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের পক্ষ হতে এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী? (কাসাস: ১২)

৮. আবার মূসা আ.-ও ভাইয়ের বক্তব্য দেয়া ও কথা বলার যোগ্যতা দেখতে পেয়ে, ভাইকে সামনে আনতে চাইলেন। সরাসরি আল্লাহর কাছে বললেন,

أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

আমার ভাই হারুন আমার চেয়েও বিস্তৃতভাষী। (কাসাস: ৩৪)

৯. জল্লাদ বা স্বৈরশাসক নিজে নিজে তৈরি হয় না। মানুষই তৈরি হওয়ার সুযোগ করে দেয়। মানুষ যখন গোলামী মানসিকতার হয়ে পড়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, তখনই তাদের ওপর জল্লাদ চেপে বসে। নিজের পিঠে কাউকে বসার সুযোগ না দিলে কেউ বসতে পারে? বনী ইসরাঈলও তাদের গোলামী ও ভীকু মানসিকতার কারণে ফির'আওনকে জল্লাদ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এখনো একই নিয়ম খাটে।

১০. আল্লাহ কাউকে সাহায্য করতে চাইলে বড় কিছু লাগে না। কোনো উপকরণ ছাড়াই পারেন। মূসার লাঠিটা ছিল নিছক ঠেস দেয়ার জন্য। গাছের পাতা পাড়ার জন্য। কার্যকালে সেটাই হয়ে গেল সেকালের সর্বোচ্চ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র।

১১. আল্লাহর সাহায্য না থাকলে, বিশ্বের পরাশক্তি হলেও কিছু যায় আসে না। সামান্য একজন মানুষের কাছেও পরাজিত হতে হয়। সামান্য একটা লাঠির বিরুদ্ধেও নিজের অত্যাধুনিক অস্ত্র অসার প্রমাণিত হয়। লক্ষাধিক সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়েও কিছু করার থাকে না।

১২. পৃথিবীর সবকিছুই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলে। এর হেরফের ঘটে না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে প্রয়োজনের সময় এসব নিয়ম ভেঙে দেন। ব্যত্যয় ঘটান। যেমন,

ক. নদীর স্বাভাবিক ধর্ম ছিল শিশু মূসা ডুবে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে নদী হয়ে গেলো 'ডাকপিয়ন'। ছেলেকে পৌছে দিল শত্রুর আস্তানায়। যে শিশুটাকে কিনা তারা হত্যার জন্য খুঁজছে।

খ. সমুদ্রে যেখানে জাহাজ চলাচল করতেই বেগ পেতে হয়। সেখানে একদল মানুষ পায়ে হেঁটে পার হয়ে গেল। ঠিক একই স্থানে আরেক দল মানুষ ডুবে মরলো। সামান্য সময়ের ব্যবধানে।

১৩. বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর আজ্ঞাবহ। হুকুমের দাস। বান্দা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রণসজ্জায় সজ্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার দীর্ঘদিনের চেষ্টা-সাধনার প্রস্তুতিকে নিমেষে এক ফুৎকারে বিভিয়ে দেন। পানিতে ডুবিয়ে। ছোট্ট একটা পোকা দিয়ে।



কুরআন কারীমের প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে, শত নয় হাজার নয়, অগণিত শিক্ষা বেরিয়ে আসবে। কিয়ামত পর্যন্ত বেরোতেই থাকবে শিক্ষার ধারা।

দ্বিটি

কুরআন কারীমের ঘটনাগুলো এমনি এমনি বর্ণনা করা হয়নি। পুরো কুরআন কারীম মানুষের হিদায়াতের জন্য নাথিল হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি বিধান সব সময়, সব জায়গার জন্য উপযোগী। কোনো অজুহাতেই কুরআনী বিধান থেকে সরে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। মানুষের মন তৈরি নয়, মানুষ কুরআনকে মানতে প্রস্তুত নয়, এখনো পরিবেশ তৈরি হয়নি এ-ধরনের অজুহাত বস্তুতঃ কুরআনের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা। এক প্রকারের অনাস্থা।



কুরআন কারীমে বারবার ফির'আওনের কথা আলোচিত হয়েছে। একজন দাঙ্গিক স্বৈরশাসক হিশেবে ফির'আওনকে তুলে ধরা হয়েছে। একজন স্বৈরশাসকের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

(এক) প্রথমত অনুগত শক্তিশালী বিশাল একটা বাহিনী থাকতে হবে। যাদেরকে দিয়ে আভ্যন্তরীণ কাজ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক কাজও করানো হবে।

وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ

বহুসৈন্যের অধিকারী ফির'আওন। (ফজর: ১০)



(দুই) দক্ষ গোয়েন্দা বিভাগ। এটা ছাড়া যে কোনো শাসকই অচল। বিশেষ করে স্বৈরশাসক। ফির'আওন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর বের করে ফেলেছিল, কোন কোন ঘরে নবজাতক আছে। কারা কারা তার বিরোধিতা করছে। তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হওয়ার কারণে শিশুদেরকেও সে রেহাই দেয়নি। দক্ষ গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়া তার পক্ষে প্রতিটি প্রজার বেডরুম পর্যন্ত চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না।



(তিন) তথ্যমন্ত্রণালয়। অত্যন্ত সচল সক্রিয় তথ্য বিভাগ থাকতে হবে। নাহলে যে কেনো সময় বিদ্রোহ ঘটতে পারে। ফির'আওনের তথ্যমন্ত্রণালয় অত্যন্ত চৌকস ছিল। তারা মাটির খবর তো রাখতই, আকাশের খবরও পেড়ে ফেলেছিল। তারকা দেখেই তারা হিশেব বের করে ফেলেছিল, একটি বিপদজনক শিশু জন্ম নিচ্ছে। দিনতারিখ শুনে তারা সেই শিশুর অপেক্ষায় ওঁত পেতেছিল।

(চার) বুদ্ধিজীবী। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তারকার খবর ফির'আওনের জানার কথা নয়। রাষ্ট্রের সম্ভাব্য হুমকি ও রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা দেখবে বুদ্ধিজীবীমহল। তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকই পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফির'আওনকে জ্যোতিষীরা আগেই সতর্ক করতে পেরেছে। মূসার ব্যাপারে।

□

(পাঁচ) সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত একজন সহকারী থাকতে হবে। হামান ছিল সেই ব্যক্তি। যে কোনো কাজের কাজী। দরবারে বসছে। আবার নির্দেশ মতো সুউচ্চ টাওয়ার নির্মাণ করছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করছে।

□

(ছয়) বিরোধী দলকে বশে রাখা। প্রতিটি বিরোধী দলেই দু'একজন গান্ধার থাকে। 'মদদী' থাকে। যারা টাকা খেয়ে সরকারকে মদদ দেয়। কারুন ছিল সেই ব্যক্তি। বনী ইসরাঈলের হয়েও সে সরকারে যোগ দিয়েছিল। মন্ত্রীত্বও বরণ করেছিল।

□

(সাত) বিয়ে। একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ রাজা বিয়ে করার সময় অত্যন্ত কৌশলী যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নিজের বিয়ে হোক বা সন্তানের বিয়ে। ফির'আওন বিয়ে করেছিল ভিন্নধর্মী আসিয়াকে। এ-বিয়েতে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখনো দেখা যায়, জামাই বা পুত্রবধু বিদেশী হয়। এক টিলে অনেক শিকার।

□

(আট) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ। স্থাপনা নির্মাণ। জনগণ এসব দেখেই ভড়কে যায়। ভাবে, দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। ফির'আওন হামানকে দিয়ে উঁচু প্রাসাদ বানিয়েছিল। জনগণকে দেখানোর জন্য। দম্ভ প্রকাশের জন্যে, যা আজো মিসরে বিদ্যমান।

□

(নয়) নিজের ক্ষমতাকে নিরংকুশ করা। দেশে আর কোনো ক্ষমতাকে টিকতে না দেয়া। দমন-পীড়ন নির্যাতন চালিয়ে হলেও সব শক্তির টুটি চেপে ধরা। ফির'আওনও তাই করেছিল। এমনকি বনী ইসরাঈলের 'আল্লাহ' তার জন্য হুমকি হওয়াতে সে নিজেই 'ঈশ্বর' হওয়ার ঘোষণা দিয়ে বসলো।

□

(দশ) অত্যন্ত জি-হজুরমার্কা একটা 'সভাসদ' বা পরিষদ গঠন করা। যারা সব কথাতেই সায্য দিবে। তোষামোদ করবে। উস্কানি দিবে। বিভিন্ন আয়াতে দেখা যায়, ফির'আওনের সভাসদরা কেমন ছিল।

■

(এগার) স্বৈরাচার হলেও ধর্ম ছাড়া যাবে না। ধর্মকে কাজে লাগাতে হবে। এবং সে ধর্ম অন্য সবার ধর্মের মতো হবে না। নিজের সুবিধা মতো একটা ধর্ম হবে। ফির'আওনেরও নিজস্ব ধর্ম ছিল।

وَقَالَ الصَّالِمِينَ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ أَكْذَرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ يَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ

وَاللَّهُكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْخِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

ফির'আওনের কওমের নেতৃবর্গ ফির'আওনকে বললো, আপনি কি মুসা ও তার কওমকে মুক্ত ছেড়ে দিবেন? যাতে তারা পৃথিবীতে (অবাধে) অশান্তি বিস্তার করতে পারে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে পারে? (আরাফ: ১২৭)

এই আয়াতে বোঝা যায়, সে নিজে বড় খোদা দাবী করলেও তার নিজেরও নিজস্ব কিছু 'পূজনীয়' ছিল। (اللَّهُكَ) বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

■

(বারো) মানুষকে কাজে লাগাতে পারতো। স্ত্রী যখন বললো,

لَا تَقُولُوهُ عَنِّي أَب. يَنْفَعُنَا

তোমরা শিশুটাকে হত্যা করো না। আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারবো। (কাসাস: ৯)

ফির'আওন কিছু বলেনি। বাধা দেয়নি। স্ত্রীর চিন্তাটা তার মনে ধরেছিল। তাই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

■

(তেরো) অত্যন্ত অত্যাধুনিক প্রচারমাধ্যম। এটা ছাড়া বর্তমানে যেমন রাষ্ট্র চলে না, তখনও চলত না। যখন মুসার সাথে জাদুর প্রতিযোগিতার কথা হলো, তখন ফির'আওন সারা দেশে লোক পাঠিয়ে, জাদুকর আমদানি করল। (শু'আরা: ৫৩)

■

(চৌদ্দ) দলীয়করণ। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে, নিজের লোক বসাতে না পারলে, ক্ষমতা কিছুদিন পর মুখ খুবড়ে পড়বে। ফির'আওনও রাষ্ট্রীয় কাজে কিবতীদেরকে বসিয়ে রেখেছিল। তারাই সবকিছু বিশ্বস্ততার সাথে দেখাশোনা করত।

□

(পনের) পর্যাণ্ড সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করা। ডাক দিলেই হাজির এমন। ফির'আওন তা পেরেছিল। প্রতিযোগিতার দিন তার ডাকে সারাদেশ থেকে মানুষ ভেঙে পড়েছিল।

□

(ষোল) শাসকের জন্য অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয় হলো, প্রজাদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা শ্রেণীর সাথে আঁতাত গড়ে তোলা।

(ক) আঁতাতের প্রথম পক্ষ হবে শাসক ও তার একান্ত অনুগত কিছু লোক। ফির'আওন নিজেই অত্যন্ত সচল পক্ষ ছিল।

(খ) আঁতাতের দ্বিতীয় পক্ষ হবে, দক্ষ ও পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদরা। হামান ছিল এ পক্ষের লোক। এরাই মূলত তাওতের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করে। জনগণকে তাবে' রাখে।

(গ) পুঁজিপতি-ধনিক-বণিকশ্রেণী। এ-পক্ষে ছিল কারুন। সে নিজের অটেল সম্পদ দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিল। শাসকের বাজেট ঘাটতিকে সামাল দিয়েছিল।

এই ট্রিনিটি বা ত্রি-পাক্ষিক জোট গড়ে তুলতে পারলে, একজন শাসক আরামসে ইচ্ছেমত দেশ শাসন করতে পারে! যতদিন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা! কুরআন কারীম অবশ্য এই জোটের ভিতকে পাপ ও সীমালঙ্ঘন (الإثم والمعدوان)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আখ্যায়িত করেছে।

□□□□

পরিশিষ্ট এক: এই যে এত এত দক্ষতা, এত এত কৌশল! এসব কিছুই কাজে আসবে না। আল্লাহ জালিমদেরকে ধ্বংস করেই ছাড়েন। (ফজর: ৬-১২ ও অন্যান্য আয়াত)

পরিশিষ্ট দুই: আল্লাহ তা'আলা শুধু জালিম শাসকের নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি, প্রজা-সেনাবাহিনী-উজির-নাজির সবার নিন্দা করেছেন। তার গযবের আওতায় এনেছেন। প্রজাদেরকেও পাপী-ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রোপাগান্ডা

মুসা আ. ভুলক্রমে একজনকে 'ওয়াকায' মানে ঘুঘির আঘাতে মেরে ফেলেছিলেন! আর ফির'আওন হাজার-হাজার নিরপরাধ বনী ইসরাঈলকে হত্যা করেছিল। স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে। তারপরও মুসার সাথে যখন দেখা হলো, কী বললো?

-তুমিই তো

وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অপরাধ যা করার তা করেছ, তুমি হলে কৃতঘ্ন! (৩৮ আরা: ১৯)

■

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকেই দেখা যায়, বাতিল সব সময় গায়ের জোরে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চায়। দুর্বলের ওপর সমস্ত দোষ চাপাতে চায়। শক্তিশালী মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে ধামাচাপা দিতে চায়। মানুষের মনোযোগকে ভিন্নদিকে 'ডাইভার্ট' করতে চায়। ফিরআওনও তার মিডিয়া ব্যবহার করে, নিজের অগণিত অপরাধ বেমালুম চাপা দিয়ে, মূসা আ. কখন কী করেছেন, সেটার খতিয়ান ভুলে ধরছে! 'তেতুলতত্ত্ব' আবিস্কার যে যুগেও ছিল!

অসহনীয় 'তিন'!

রাব্বের কারীম কুরআনে কতো কী যে আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন! কেয়ামত পর্যন্ত তা বের করে শেষ করা যাবে না। আর মুফাসসিরীনে কেরামও মাশাআল্লাহ! কিভাবে যে তারা এতকিছু উদ্ধার করেন! হয়রান হয়ে যেতে হয়!

■■■

আজ জুমাবার, সূরা কাহফ নিয়ে বসেছিলাম। এখান থেকেই কয়েকটা মুক্তো বের করার প্রয়াস চালিয়েছিলাম, শর্ত ছিল, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। একদম চুপচাপ থাকতে হবে আর যাই ঘটবে, টু'শব্দটি না করে দেখে যেতে হবে। কিন্তু মূসা আ.-এর পক্ষে শর্ত রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেলো। পথ চলতে চলতে, নানা অদ্ভুত ঘটনা দেখতে দেখতে, প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না। থাকবেনই বা কী করে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে, ঘটনাগুলোতে চুপ থাকা একজন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আসেন অন্যায়ের মুলোৎপাটনের জন্য!

■

মূসা আ. ও খিযির আ.-এর ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনেক কিছুই বের হয়, আমরা এখানে তিনটা দিকের ওপর সামান্য আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ!

■

তিনটা বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ ধৈর্য ধরতে পারে না। বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই বোধ হয় খিযির আ. বলেছিলেন,

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

নাও, তুমি যেসব বিষয়ে এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারেনি, শুনে নাও!
(মর্মার্থ, ৮২)

■

মূসা ও খিযির আ. শিক্ষাসফরে বের হয়েছেন। জলপথ ধরে। চারদিকে চোখ রাখছেন। কোথায় কী হচ্ছে। অনেক ঘটনা ঘটলেও মোটাদাগে তিনটা ঘটনার কথা কুরআন কারীমে আলোচিত হয়েছে।

ক) নৌকা ফুটো করা।

খ) বালকহত্যা।

গ) দেয়াল মেরামত।

■

তিন ঘটনা থেকে তিনটি বিষয় বের হয়ে আসে,

১ (এক) একটা কাজ শুরু করেছে, বেশ আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে। ফলাফলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। এমন অস্থির সময়ে, বাধা এলে বা ব্যর্থতা এলে মানুষ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কোনও ঘটনাকে তলিয়ে দেখারও ফুরসত মেলে না। নৌকা ফুটো করার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। মূসা আ. ইলমের সন্ধানে বের হয়েছেন। খিযির আ.-এর সাথে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নৌকা ফুটো করাকে অন্যায় বলে মনে হয়। বাস্তবে যদিও অন্যায় ছিল না।

২ (দুই) পথ চলতে চলতে কতো জনের সাথেই তো দেখা হয়, চেনাজানা হয়, পরিচয় হয়। মায়া-মহব্বত গড়ে ওঠে। এমন কাউকে অথবা নিজের একান্ত আপনজন মারা পড়লে, ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন। খিযির আ. যখন আপাত নিরপরাধ বালকটিকে হত্যা করলেন, মূসা আ. নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি।

৩ (তিন) সবাই চায় তার আগামীকালের খাবারের সংস্থান হয়ে যাক। ভবিষ্যতের আর্থিক নিশ্চয়তা থাকুক। এজন্য তারা সব সময় মনে মনে এক ধরনের প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশায় প্রহর গোনে! এই প্রত্যাশায় কোনো রকমের ছেদ পড়লে অস্থির হয়ে পড়ে। ইয়াতীম বালক দুজনের জন্য রাখা সঞ্চিত ধনভাণ্ডার উদ্ধার হওয়াও ছিল প্রত্যাশিত! কিন্তু সেটা পিছিয়ে গেলো।

■■■

আরও কয়েকটি কাহফীয় মুক্তো।

১. বিপদ এলে বা কোথাও অসঙ্গতি ধরা পড়লেই সব শেষ হয়ে গেল, এমন নাও হতে পারে। চলার পথে সাময়িক বিঘ্নতা অনেক সময় সামনে ওঁৎ পেতে

ঘাপটি মেরে থাকা বিপদ থেকেই বাঁচিয়ে দেয়। নৌকা ফুটো করেছে বলে রাগ হচ্ছে? একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল, দেশের রাজা সমস্ত ভালো নৌকা বাজেয়াপ্ত করে দখল করে নিচ্ছে! সুতরাং বিপদ এলে ঘাবড়াতে নেই। (৭৯)

২. প্রিয়জন মারা গেছে? ব্যাপারটা আল্লাহর ফায়সালা বলে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন। খিযির আ. বালকটাকে হত্যা করেছেন। ফলে কী হলো?

ক) বালকটা বড় হলে জঘন্য দাগী অপরাধী হত, তা থেকে বেঁচে গেল। পাপমুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে গেল।

খ) তার মাতা-পিতাও ছেলের অবাধ্যতার কষ্ট সহ্য করা থেকে রেহাই পেয়ে গেল। দুষ্ট ছেলের বদলে ভালো নেককার সন্তানের আশ্বাস পেয়ে গেল।

গ) সমাজও বড় বাঁচা বেঁচে গেল। নইলে এই দুষ্ট বালক কালান্তরে একজন 'কালো জাহাঙ্গীর' হয়ে উঠলে, কেমন হত! (৮০)

৩. অবুঝের হাতে টাকা দিলে কী হয়? সে কোথায় খরচ করবে, কিভাবে খরচ করবে ভেবে কূল-কিনারা করতে পারে না। এজন্য আমি টাকা চাইলেই আল্লাহ দিয়ে দেবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। এখন দিলে, আমি হয়তো হজম করতে পারবো না!

ছেলেদুটোর সম্পদ পেতে দেবী হয়েছে। তারা যেন টাকাটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হাতে পায়, তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। নাহলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা ছিল। (৮২)

III

তিনটি ঘটনা একটা মৌলিক শিক্ষার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে,

☞ জীবনে নেমে আসা বিপদ বা অস্বাভাবিকতাকে বাহ্যিকভাবে দেখতে যতই অন্যায় আর অবिवেচনাপ্রসূত মনে হোক না কেন, বাস্তবে সেটা আমার জন্য আল্লাহর রহমতই! মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা রহীম-রহমান! এটাই তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

ইলমী সফর

মূসা আ. ইলম তলবের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। সাথে নিলেন এক খাদেমকে। ইউশা ইবনে নূন আ.। এক নবীর খাদেম আরেক নবী। বেশ শিক্ষণীয় দৃশ্যপট। আগে থেকেই বলা ছিল,
-মাছটার দিকে খেয়াল রাখবে!

কিন্তু পথচলার ব্যস্ততায় খাদেম মাছের কথা ভুলে গেলেন।

فَالْي نَيْسِكَ الْحُوتُ

আমি তো মাছের কথা ভুলে গিয়েছি। (কাহফ: ৬৩)

গুস্তাদ মাফ করে দিলেন! শাগরেদকে কিছু বললেন না। ক্ষমা করলে কী হয়?
-ক্ষমা পাওয়া যায়!

মূসা আ. একটু পরেই খিযির আ.-এর সাথে দেখা করলেন। শুরু হলো ইলমী সফর! এবার মূসা আ.ও খিযির আ. এর সাথে একটু ব্যতিক্রমী আচরণ করলেন। মাফ চাইলেন,

لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

আমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আমাকে ধরবেন না।

(কাহফ: ৭১)

খিযির আ. মাফ করে দিলেন। মাফের বিনিময়ে মাফ।

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে? (রাহমান: ৬০)



কিছু মজার বিষয় মনে এল,

এক. তাহলে সফরে বের হলে, সাথে খাদেম রাখা যাবে! এমনকি ইলমী সফর হলেও! মূসা আ. তো রেখেছেনই আমাদের পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রাখতেন!

দুই. বড় কোনো মুরুব্বির কাছে গেলেও, সাথে খাদেম রাখা যাবে!

তিন. খাদেম ভুল করলে, তিরস্কার নয়!

দু'আ ও কর্মকোশল!

মূসা আ. আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। সে দু'আতেই দিক নির্দেশনা এসেছে। তার দু'আ ছিল,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهُ مَوْلَا قَوْمٍ مُّجْرِمُونَ

তারপর সে নিজ প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, এরা তো এক

অপরাধী সম্প্রদায় (দুখান ২২)

মূসার ডাকের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা দিক-নির্দেশনা দিলেন,

فَأَنشَرِيعَادِي لَيْلًا إِنَّكَ مُتَّبِعُونَ

তুমি সবাইকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়ো। তবে খেয়াল রাখবে, তোমাদেরকে কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। সূরা দুখান: ২৩

এই আসমানী পথ-নির্দেশ থেকে বোঝা যায়:

এক: শত্রুর ভয় থাকলে, রাতের বেলা চুপিচুপি বের হয়ে পড়া খারাপ কিছু নয়। আমাদের নবীও এমনটা করেছেন। লুত (আ.)ও করেছেন।

দুই: রাতের বেলা ভ্রমনে বরকত আছে। ঈশা পড়ে গাড়িতে উঠলে, নামায কাযা হওয়ার আশংকা কম থাকে।

তিন: কেউ দিক-নির্দেশনা চাইলে, খুঁটিনাটি সব দিক ভালভাবে জানিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা সময় বলে দিয়েছেন। আবার শত্রু পিছু নেয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।

চার: পরামর্শ এমন ব্যক্তির কাছে চাওয়া, যার ওপর আস্থা রাখা যায়। যাতে তিনি যা পরামর্শ দিবেন, নির্বিধায় মানা যায়। মুসাকে বলে দেয়া হয়েছে, বের হলে কিন্তু বিপদ আছে। পিছু নেয়া হবে। কিন্তু মুসা পরোয়া করেন নি। আল্লাহ যেহেতু বলেছেন, তায় আর চিন্তা কী?

পাঁচ: বড়রা কিছু আদেশ করলে, সেখানে দ্বিধায় ভোগা ঠিক নয়। তিনি তো ভাল মনে করেই আদেশ করেছেন। বিপদ থাকলে আদেশ করতেন না। তাই মুসাও বের হলে বিপদ পিছু নিবে জেনেও, পরোয়া করেন নি।

ফলাফলটা কী দাঁড়াল?

রাতে ছিলেন ভীত। দুর্বল। চিন্তিত।

দিনের আলোয় সব ভয় কেটে গেল। বিপদ দূর হয়ে গেল। ফিরআওন পানিতে ডুবে মরলো।

উল্টোপিঠ

জীবনের কিছু ঘটনা গুরুতে হজম করতে ভীষণ কষ্ট হয়। মনটা কিছুতেই মানতে চায় না। বিপদজনক মুহূর্তে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, আল্লাহ সম্পর্কেও মন্দ ধারণা করে ফেলি কেউ কেউ।

১) খিযির আ. যদি নৌকাটা ফুটো না করতেন তাহলে কী হতো?

জালেম শাসক সেটা ফ্রোক করে নিয়ে যেত।

অথচ প্রথম দেখাতে মনে হয়েছে,

-কী অকৃতজ্ঞতা!

২) বালকটাকে হত্যা না করলে কী হতো?

বড় হয়ে বাবা-মা'কে ভীষণ কষ্ট দিত। তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলত।
৩) দেয়ালটা মেরামত না করে দিলে কী হত?

দুই অসহায় এতীমের 'হক' হাতছাড়া হয়ে যেত।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সুন্দর। সম্পূর্ণ। সাজুয্যপূর্ণ। যদিও প্রাথমিক অবস্থায়, আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে বাহ্যিকভাবে সেটাকে দেখতে 'কষ্টকর' আর কৰ্কশ মনে হয়! এটা আমার ঈমানি দুর্বলতা। এটা আমার ইলমের কমতি।

সাতটি চাওয়া

মুসা আ. আল্লাহর কাছে দু'আ করতে শুরু করলেন। একে একে সাতটা বিষয় চাইলেন।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي،
وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

হে আমার প্রতিপালক!

১. আমার বক্ষ খুলে দিন।
২. আমার কাজ সহজ করে দিন।
৩. আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন।
৪. যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।
৫. আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন। আমার ভাই হারুনকে।
৬. তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন।
৭. তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন। (তুহা: ২৫-৩২)



চাওয়া শেষ হলো। এবার পাওয়ার পালা। তার আগে আরেকটা বিষয়।

-কেন চাইলেন?

-দুটি কারণে।

كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا

১. যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ পাঠ করতে পারি।
২. বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি। (৩৩-৩৪)



লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মূসা এতকিছু চাইলেন দুনিয়াবী কোনো স্বার্থের জন্য? শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য?

-জি না, আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ ভালোভাবে আদায়ের জন্য এতকিছু চেয়েছেন। চরম শত্রু ফির'আওনের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যও কিছু চাননি।



হযরতের দু'আ থেকে চমৎকার কয়েকটা বিষয় ফুটে ওঠে।

১. আল্লাহর যিকির করতে গেলে, সোহবত (সাহচর্য)-এর প্রয়োজন।

ক) যা আমাকে হকের ওপর থাকতে সহযোগিতা করবে।

খ) অবিচলতা (ইস্তেকামত)-এর ওপর থাকতে সাহায্য করবে।

আল্লাহর জন্য কী চমৎকার জোট হয়েছিল দু'ভাইয়ের!

আচ্ছা, দু'আর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? আল্লাহর কাছেই শুনি উত্তরটা।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى

আল্লাহ বললেন, মূসা! যা কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া

হলো। (৩৬)

মূসা আ. এতগুলো দু'আ করেছেন। রাব্বের কারীম একবারেই সব কবুল করে নিলেন। আহ, কী শান্তি! কী সুখ! আমিও মনের যাবতীয় বাসনা একত্র করে আল্লাহর কাছে খুলে বলবো। আমার সমস্ত চাওয়া দরবারে ইলাহীতে খুলে বলবো। বেশি বেশি চাইবো। প্রতিবারের দু'আয় অগণিত বিষয়ের চাহিদা পেশ করবো। আমার আল্লাহ তো এটাই ভালোবাসেন। পছন্দ করেন। হয়তো সবটাই কবুল করে নিয়ে বলবেন,

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا عَبْدِي

আমার পেয়ারা বান্দা, যা কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হলো!

কুরআনি ভাবনা

কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১) ফির'আওন একে একে নয়টা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি। সর্বশেষ সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া দেখেও ঈমান আনেনি। এ-ঘটনা একটা কথাই প্রমাণ করে, অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান নসীব করেন না। অহংকারীকে হক থেকে সরিয়ে রাখেন।



২) কুরআন কারীমে মূসা আ. ও ফির'আওনের কথা বারবার এসেছে। তারা দু'জনেই ছিলেন দুই পক্ষের প্রতীক। মূসা আ. ছিলেন হকের প্রতীক। ফির'আওন বাতিলের। হক বাতিলের লড়াই চিরকালের। কিন্তু পরিশেষে বিজয় পদচুম্বন করে হকের। মূসার বিজয় দেখে মজলুম চিরকাল সান্ত্বনা লাভ করবে। ফির'আওনের পরাজয় দেখে, জালিম শিক্ষা গ্রহণ করে। বাতিল যতই শক্তিশালী হোক, তার পরাজয় অনিবার্য। হক যতই দুর্বল হোক, সবর করে টিকে থাকতে পারলে, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হবেই। কুরআন কারীমে মূসা আ. ও ফির'আওনের ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে এটাই মনে করিয়ে দেয় বারবার।



৩) সবকিছু পড়লাম কুরআন পড়লাম না, আমি হতভাগা! সবকিছু নিয়ে চিন্তা করলাম কুরআন নিয়ে করলাম না, আমি হতভাগা! সবকিছুর জন্য সময় আছে, কুরআনের জন্য নেই, আমি হতভাগা! সবকিছুতে আনন্দ পাই, কুরআনে পাই না, আমি হতভাগা!



৪) দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশার সাথে কথা বলার ছবি যদি কারো কাছে থাকে, গর্বে তার পা মাটিতে পড়ে না। বাঁধাই করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে। ভিডিওটা সযত্নে সেভ করে রাখে। জনে জনে সে ভিডিও দেখায়। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর সাথে কথা বলতে হলে, পূর্ব প্রস্তুতি হিশেবে কত কিছু করতে হয়! কত শিডিউল মেনে চলতে হয়। কত আগে থেকে সময়সূচী নির্ধারণ করতে হয়! দেখা হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়। লোকজন তার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে। চোখ তুলে তাকায়! বাড়তি খাতির-যত্ন করে। কিন্তু যিনি রাজাদের রাজা, তার কালাম পড়তে কোনো আগাম শিডিউল লাগে না। তার সাথে কথা বলতে অপেক্ষা করতে হয় না। তার দরবারে যেতেও পূর্ব অনুমতি লাগে না। যখন তখন তার সাথে কথা বলা যায়। তিনি নিজেই কথা

বনার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে দুনিয়ার রাজা বেশি গুরুত্ব পায়। দুনিয়ার রাজার সাথে সাক্ষাতই বেশি প্রাধান্য পায়। এটা দুঃখজনক।



৫) কুরআন কারীমের মূল উদ্দেশ্য বোঝার জন্য কুরআনের শব্দগুলো, আয়াতগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত! (কাসেম নানুতুভী রহ.) এ-কথার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে থানভী রহ. বলেছেন, -আপনার মতো গভীর বুঝশক্তি থাকলে, কুরআনের শব্দ থেকেই মর্ম উদ্ধার করা যাবে।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য কুরআন কারীম বোঝার জন্য উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।



৬) কুরআন কারীমের সাথে আমার সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য হয় না কেন? আন্তরিক আর গভীর কেন হয় না? না'তে রাসূল পড়লে, ইসলামী সংগীত শুনলে মন সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে যায়। কখনো চোখ দু'টো অশ্রুসজলও হয়ে ওঠে। কিন্তু কুরআন শুনলে কেন মন জেগে ওঠে না? কুরআন নিয়ে বসলে কেন মন আর্দ্র হয় না? কুরআনের প্রতি কেন আগ্রহ খুঁজে পাই না?

ব্যুৎপত্তি বিভিন্নভাবে এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

-মানুষের মন যখন সৃষ্টিজীবের কথা দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়, স্রষ্টার কথা প্রবেশ করতে পারে না। কেউ যদি জোর করে কিছুদিন কুরআন কারীমকে অন্তরে স্থান দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে আস্তে আস্তে মন থেকে সৃষ্টিজীবের কথার প্রভাব দূর হয়ে স্রষ্টার কথার প্রভাব গাঢ় হয়। তখন কুরআন শুনে কান্না আসে। কুরআন নিয়ে সময় কাটাতে মন আগ্রহী হতে শুরু করে।



৭) জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কোনো চেষ্টা বা সচেতনতা ছাড়াই শ্বাস গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কুরআন কারীম আমাদের রুহের 'অক্সিজেন'। আত্মার শ্বাস। জীবন বাঁচাতে যেমন অনায়াসে নিয়মিত নিশ্বাস নিই ও ছাড়ি, কলবকে বাঁচিয়ে রাখতেও সেভাবে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত-তাদাব্বুর আবশ্যিক। কিন্তু তা করা হয়ে ওঠে না। ফলে অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীর বেঁচে থাকলেও কুরআন বর্জন করে 'রুহ' মরে যায়।

৮) সাহাবায়ে কেরামই সর্বশ্রেষ্ঠ 'কুরআনী প্রজন্ম'। তারাই সবচেয়ে বেশি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারাই বেশি বেশি আয়াতের তাদাক্বুর করেছেন। তরতাজা ওহী পেয়েছেন। সদ্য ফোটা ফুলের মতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। ওহীর কুরআন ও জীবন্ত কুরআনের ছোঁয়ায় সাহাবায়ে কেরাম হয়ে উঠতে পেরেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জামাতে।

যে কুরআন কারীম তাদেরকে এমন সোনার মানুষে পরিণত করেছিল, তা আজো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। প্রথম দিনের মতোই নতুন। তরতাজা। সজীব। পনেরশ বছর পরও কুরআন সেই আগের শক্তি ধারণ করে আছে। আগের প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। আমরা চাইলে আজো কুরআনকে আঁকড়ে ধরে সাহাবায়ের কেরামের মতো বিশ্বজয়ী জামাতে পরিণত হতে পারি। কুরআন থেকে অমূল্য সব মণিমুক্তা আহরণ করতে পারি। কুরআন থেকে সরাসরি রবের দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারি।



৯) একটা ঘরে নানা ধরনের সরঞ্জাম থাকে। সামানা থাকে। তৈজসপত্র থাকে। হাড়ি-পাতিল থাকে। লেপ-তোষক থাকে। সোনাগহনা থাকে। টাকা-পয়সা থাকে। থালা-বাসন থাকে। এসবের কিছু সব সময় ব্যবহৃত হয়। কিছু মেহমান-অতিথি এলে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু সরঞ্জাম থাকে, কখনোই ব্যবহৃত হয় না। এগুলো ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য রাখা হয়।

তদ্রূপ পড়ার টেবিলেও অনেক রকমের বই থাকে। গল্পের, ইতিহাসের, বিজ্ঞানের, শিল্পের, কৌতুকের, ধর্মের, স্কুলের। কিছু বই সব সময় খোলা হয়। কিছু বই ছুটির দিনে ও অবসরে খোলা হয়। এসব বইয়ের সাথে কুরআন কারীম আছে তো? থাকলে সেটা কোন ভাগে আছে? সব সময় পঠিতব্য বইয়ের সাথে নাকি তাকের শোভাবর্ধক হিশেবে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে?



১০) আমি চাইলেই কুরআন কারীম ছুঁতে পারি! হাত বাড়ালেই নাগালের মধ্যেই কুরআন কারীম পাই। বিশ্বে অনেক দেশ আছে, সেখানে মুসলমানরা জীবনে কুরআন কারীম কি জিনিস, চোখেও দেখেনি। দেখলেও পুরো গ্রামে খানাতল্লাশি করলে একটা কি দুইটা কুরআন শরীফ মিলবে। কোনো গ্রামে শুধু মসজিদেই কুরআন শরীফ পাওয়া যায়। সবাই পালাক্রমে মসজিদে এসে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করে।

আমি কতবড় নেয়ামতের মধ্যে আছি, কল্পনা করে দেখেছি? আমি কুরআন কারীম সব সময় চর্মচক্ষে দেখছি! হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছি! ইচ্ছা হলে বাজারে

গিয়ে কুরআন শরীফের নতুন নোসখা হাদিয়া করছি! আমি কী দিয়ে এই অমূল্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি? আমি কি কুরআন কারীমের হক আদায় করার চেষ্টা করছি?

□

১১) একটা গাছ থেকে ফল পেতে হলে কী কী করতে হয়? জমিতে লাঙল দিতে হয়। বীজ খুঁজে আনতে হয়। পানি দিতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। সার দিতে হয়। গরু-ছাগল থেকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। চুরি এড়ানোর জন্য রাতজেগে থাকতে হয়।

কুরআন কারীমও একটি ফলদার বৃক্ষ। শাজারাহ তাইয়িবাহ। উত্তম বৃক্ষ। এ-গাছের ফল পাওয়ার জন্য কোনো রকম পরিশ্রম করতে হয় না। পানি দিতে হয় না। বর্ষার অপেক্ষা করতে হয় না। বসন্তের প্রতীক্ষা করতে হয় না। আকাশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ-বৃক্ষ ফলস্তু ভরস্তু করে পাঠিয়েছেন। শুধু পাড়ো আর মুখে দাও! নাও আর খাও!

□

১২) একটা চেরাগ, একটা হারিকেন সব জায়গায় জ্বলতে পারে না। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা লাগলে চেরাগ নিভে যায়। হারিকেন ঝিলিক মারতে শুরু করে। তেল না হলে চেরাগ-হারিকেন জ্বলে না। চেরাগ-হারিকেনে সলতে লাগে। বৈদ্যুতিক বাত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগে! গ্যাসের চুলায় গ্যাস সরবরাহ লাগে! তাও কত ফাসাদ! আজ চিমনি ভেঙে গেছে! কাল বাত্ ফিউজ হয়ে গেছে! কিন্তু কুরআন কারীম আজীবন টেকসই এক বাতি! লাইফটাইম গ্যারান্টি। এই বাতি হাতে থাকলে, যে কোনো আঁধার কেটে যায়! এ-বাতির তেল লাগে না! সলতে লাগে না! তার লাগে না! এ-বাতি শুধু দিয়েই যায়, বিনিময়ে কিছুই দাবী করে না!

□

১৩) মানুষের কলব হলো একটা ঘরের মতো। ঘরের আঁধার দূর করতে আমরা বাতির ব্যবস্থা করি। হাজার টাকা খরচ করে বিদ্যুতের লাইন টানি। নানা কিসিমের রঙবেরঙের বাতি লাগাই! কোনো বাতি ড্রিম! কোনো বাতি পঁচিশ ওয়াটের! কোনোটা পঞ্চাশ ওয়াটের! আবার কোনোটা একশ! ভোল্টেজ ভালো থাকার জন্য দামী তার কিনি! মূল লাইনে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে জেনারেটর কিনি। সোলার লাগাই! কলবঘরেও কিন্তু আলো দরকার হয়। সে আলোর নাম কুরআন কারীম। আমি কি ভেবে দেখেছি, আমার কলবঘরে আলো আছে কি নেই? সেখানে আলো না আঁধার? সেখানের বিদ্যুত সংযোগ ঠিক আছে কি না? বাত্‌টা ঠিক আছে নাকি

ফিউজ হয়ে গেছে? কত ওয়াটের বাতি জ্বলছে সেখানে? একশ ওয়াটের নাকি দীর্ঘদিন কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারনে, সেখানে কোনো বাতিই নেই? নিয়মিত বিদ্যুত বিল জমা না দেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়নি তো?

□

১৪) কিছু বন্ধু থাকে তার কাছে সব কথা বলা যায়। তার কাছে থেকে সব ধরনের পরামর্শ নেয়া যায়। কিছু হলেই তার কাছে ছুটে যাওয়া যায়। বিপদে আপদে তার কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়। কিছু বন্ধু থাকে, যার কাছে সব কথা বলা যায় না। সব বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা যায় না। সীমিত কিছু বিষয় তার সাথে 'শেয়ার' করা যায়। কিছু বন্ধু থাকে, তাদের কাছে শুধুই লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যায়?

কুরআন কারীম আমার কেমন বন্ধু? আমি কি যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীমের দ্বারস্থ হই? সুখে-দুঃখে কুরআনের কাছেই আগে ছুটে আসি! নাকি দুনিয়াবি বিষয়ে আব্রাহাম লিংকনের কাছে যাই, আখেরাতের বিষয়ে কুরআনের কাছে যাই? কুরআন কারীম কিন্তু আধা বন্ধুত্বকে পছন্দ করে না। হয় পুরো বন্ধুত্ব না হয় না। মাঝামাঝি কিছু নেই।

□

১৫) বন্ধুর অনেক প্রকার থাকে! কেউ হয় সার্বক্ষণিক বন্ধু, কেউ দৈনিক বন্ধু। কেউ সাপ্তাহিক বন্ধু তো কেউ পাক্ষিক বন্ধু। কেউবা মাসিক বন্ধু। কেউ বাৎসরিক বন্ধু আবার কেউ মাঝেমধ্যে বন্ধু। কুরআন কারীমের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন? কুরআন কারীম আমার কেমন বন্ধু? সার্বক্ষণিক? দৈনিক? সাপ্তাহিক? মাসিক? বাৎসরিক? কুরআন কারীমের সাথে আমার কি চৌপ্রহরের সম্পর্ক? নাকি মাঝেমধ্যে বা মৌসুমি বন্ধু? কুরআন কারীম তো আমার সার্বক্ষণিক বন্ধু হওয়ার কথা!

□

১৬) কুরআন কারীম হেফয করতে পারিনি? কুরআন কারীম আমি পড়তে পারি না? তো কী হয়েছে? নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আমিও কুরআনের খেদমতে শরীক হতে পারি। চাইলে কত কতভাবে কুরআন কারীমের খেদমত করা যায়! আমি যা পারি সেটাই বারবার পড়তে শুরু করতে পারি। অন্যকে হেফয করার কাজে সহযোগিতা করতে পারি। এক নোসখা কুরআন কারীম হাদিয়া দিতে পারি। একটা আয়াত শিখে নিতে পারি। ফেসবুকে নিজের ওয়ালাে একটা আয়াত লিখে দিতে পারি। কুরআন কারীম বিষয়ক ওয়েবসাইটের ঠিকানা যোগাড় করে অন্যদেরকে দিতে পারি! আরও কত কত উপায় আছে!

১৭) আরবদের বড় একটা সুবিধা হল, কুরআন কারীম তাদের ভাষায় নাথিল হয়েছে। কুরআন কারীম বুঝতে, তাদাক্বুর করতে তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। একটু চেষ্টা করলেই কুরআনের ভাষা তারা আয়ত্ত করতে পারে। আমাদের ভাষা আরবী নয়। অনেক স্তর ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে কুরআন বোঝার স্তরে উপনীত হতে হয়। এ-কারণে নিশ্চয় আমরা আরবদের চেয়ে বেশি সওয়াব পাবো।

১৮) একটা সাগর যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়। অতলান্তিক বলা হলেও তার তল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ডুবুরিরা সাগর সঁচে অমূল্য সব বস্তু কুড়িয়ে পাওয়া যায়। তারা সমুদ্রমস্থান করে নানাবিধ রত্ন যত্ন করে তুলে আনেন। কিন্তু একই স্থানে বেশিদিন ডুবসাঁতার কাটা যায় না। দুয়েকবারের পরই রত্নভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে। খুঁজতে হয় নতুন কোনো খাঁড়ি! নতুন কোনো প্রবাল প্রাচীর! সেটাও এক সময় নিঃশেষ রিস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কুরআন কারীম? এক অফুরন্ত ভাবের সাগর। একটা আয়াতই সমগ্র সাগরের চেয়ে বেশি রত্ন ধারণ করে। জলসায়রের রত্ন শেষ হয়, আয়াতসায়রের অর্থ কখনোই শেষ হয় না। সেই চৌদ্দশ বছর আগে শুরু হয়েছে একেকটি আয়াতের গভীরে 'ডুবসাঁতার'। আজো সমান গতিতে চলছে আহরণপর্ব! শেষ হওয়ার নামগন্ধও নেই।

১৯) সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলে থমকে দাঁড়াই। সুন্দর একটা মানুষ দেখলে আড়চোখে তাকাই। সুন্দর একটা পাখি দেখলে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। কিন্তু এই চেয়ে থাকার প্রতি আগ্রহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবত থাকে! এক সময় আগ্রহ ফিকে হয়ে যায়। সৌন্দর্যের আবেদন কমে যেতে থাকে। কিন্তু কুরআন কারীমের সৌন্দর্যের আবেদন কখনোই ফুরোয় না। ফুরোবে না। তবে দুঃখের কথা হলো, ঠুনকো সৌন্দর্যে আমি সাময়িকভাবে মোহিত হলেও কুরআনি সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করে না! এটা আমার সৌন্দর্যবোধের ঘাটতি। এই ঘাটতি দ্রুত পুষিয়ে নেয়া আবশ্যিক। যাতে আমি আজীবন কুরআনি সৌন্দর্যের রূপসুধা আকর্ষণ পান করে যেতে পারি। কুরআনি তাদাক্বুরে ডুবে ডুবে জল খেতে পারি।

২০) চুইংগাম নির্দিষ্ট সময়ের পর তেতো আর নিরস লাগতে শুরু করে। ফল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত আঁটিতে গিয়ে থামতে হয়। কিন্তু কুরআন কারীমের

একটা আয়াত যতই চিবুতে থাকব ততই রস বেরোতে থাকবে। যত বেশি চিবু তত বেশি সুস্বাদু রস নিঃসৃত হতে থাকবে। লেবু বেশি চিবুলে তেতো হয়ে যায়। কুরআন বেশি চিবোলে আরও বেশি মিষ্টি হয়ে যায়। একটা আয়াত যত বেশি বার পড়ব, তত বেশি হীরা জহরত বের হতে থাকবে।



২১) মায়ের দুধ খাওয়া হয় দুই থেকে আড়াই বছর। গরুর দুধ পাওয়া যায় বছরখানেক। মধুর চাকে মধু পাওয়া যায় সাধারণত বছরে একবার। প্রায় সব গাছেই ফল পাওয়া যায় বছরে একবার! খেজুর গাছের রসও বছরে একবার মেলে। কিন্তু কুরআন কারীম বারোমাসই ফল দেয়। সপ্তাহে সাতদিনই রস দেয়। দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই দুধ দেয়। ঘণ্টায় ষাট মিনিটই মধু দেয়। মিনিটে ষাট সেকেন্ডই সুধা বর্ষণ করে। কুরআন কারীম এক জীবন্ত বৃক্ষ। বারোমাসে। চিরদিনের। আজীবনের। এপার ওপার দুকূলের।



২২) কুরআন কারীম হৃদয়ের প্রশান্তি! আত্মার সঞ্জীবনী সুধা। নিরাশার আশা। কুরআন কারীমে গল্প খুঁজলে গল্প পাওয়া যায়। খোঁজ করলে ইতিহাস পাওয়া যায়। শিক্ষা চাইলে শিক্ষা পাওয়া যায়। উপদেশ চাইলে উপদেশ পাওয়া যায়। দুনিয়া চাইলে দুনিয়া পাওয়া যায়। আখেরাত চাইলে তো পাওয়া যায়ই।



২৩) ভালো লাগে যখন দেখি কেউ সকাল ছাড়াও কুরআন নিয়ে বসেছে। মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও কুরআন নিয়ে মগ্ন! কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআন নিয়ে বসেছে। ক্লাসের বিরতিতে কুরআন নিয়ে বসেছে! চট করে একটা আয়াত হলেও পড়ে নিচ্ছে। একটা লাইনে হলেও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। ছোট্ট একটা সূরা হলেও পড়ে নিচ্ছে।



২৪) বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়তে শেখানো হয়! আমরা মনে করি বাচ্চা বয়েসে কুরআন পড়তে শিখবে, বুড়ো বয়েসে কুরআন বুঝতে শিখবে। এমনকি মাদরাসাগুলোতেও এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। অথচ কুরআন কারীম ছেলে-বুড়ো সবার জন্য। যদিও শিশুর ওপর কুরআনী অনুশাসন (হুদুদ-কিসাস) বর্তাবে না, তবুও চেষ্টা করলে, একটা শিশুও কুরআন কারীম বুঝতে পারে। শিশুকে তার ভাষায় কুরআন কারীম বোঝাতে হবে। প্রতিদিন একটা আয়াত শিখলেও দশ বছরের আগেই তার পুরো কুরআন কারীমের অর্থ শেখা হয়ে যাবে। আর সব আয়াত তার শেখার দরকার নেই হয়তো। তবে বিশেষ বিশেষ আয়াতগুলো তো তাকে নিয়মিতই শোনানো যেতে পারে। গল্পচ্ছলে। হাসিচ্ছলে। আদরচ্ছলে। সোহাগচ্ছলে। শাসনচ্ছলে।



২৫) একটা গল্প আছে, ছেলেকে তেতো ক্যাপসুল খাওয়ানো যাচ্ছে না। সবাই মিলে বুজি বের করল, ছেলে মিষ্টি খেতে পছন্দ করে। ক্যাপসুলটা মিষ্টির মধ্যে দিয়ে গিলে ফেলতে বলা হবে। ছেলেও সেয়ানা কম নয়।

-বাবু, মিষ্টি খেয়েছ?

-জি, খেয়েছি! আর মিষ্টির বিচিটা ফেলে দিয়েছি।

কুরআন কারীমও আজ আমার কাছে তেতো ক্যাপসুলের মতো হয়ে গেছে। কুরআন কারীম গেলাতে আজ আমার জন্য 'ছানাবালুশা'র বাড়তি আয়োজন রাখতে হয়। দুষ্ট মন মিষ্টি খেয়ে 'বিচিটা' ফেলে দিতে উদ্যত হয়। আরও কার্যকরী কোনো উপায় খোঁজার প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

বাচ্চারা সরাসরি কুরআনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে না, এটা জানা কথা। কিন্তু তাদের উপযোগী করে কুরআনের আয়াতগুলো উপস্থাপন করতে পারলে, তারা বিচি বলে ফেলে দিবে না। এক্ষেত্রে মিষ্টিটা হতে পারে, একটা শিক্ষণীয় গল্প। হতে পারে, একটা ঘুমপাড়ানি 'সুর'। হতে পারে কোনো পুরস্কারের অবয়বে উৎকীর্ণ। একটা গল্প বলা হলো, ফাঁকে একটা আয়াতও দিয়ে দেয়া হল। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একটা পুরস্কার দেয়া হলো, যার গায়ে লিখে দেয়া হল একটা আয়াত!

এ-ব্যবস্থা শুধু কি ছেলে? বুড়োদের জন্যও আজ কুরআনি মিষ্টি চাই! হরেক বকম মিষ্টি।



২৬) রমযান এলে কুরআন কারীমের প্রতি বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়। অনেকেই একটা খতম দেয়ার চেষ্টা করে। কুরআন কারীম শিখতে চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে। তারাবীহতে শোনার মেহনত করে। এভাবে যদি পুরো বছর কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকা যেত, তাহলে অবস্থাই আমূল বদলে যেত।



২৭) পাখি ডানা মেলে শূন্যে উড়ে যায়। মাছ লেজ দিয়ে সাঁতার কাটে। আমরা পা দিয়ে হাঁটি। আমরাও চাইলে শূন্যে উড়তে পারি। শূন্যে উড়তে ডানা লাগে। কুরআন কারীম আমাদের ডানা। এই ডানায় ভর করে আমরা পৃথিবীর সীমা পেরিয়ে উর্ধ্বজগতে পৌঁছে যেতে পারি। জান্নাতের মোহনীয় বালাখানায় চক্কর দিতে পারি। আরশের ছায়াতলে পৌঁছে যেতে পারি। হাউজে কাউসারের সুমিষ্ট পানীয় পান করতে পারি। সুন্দরী ছরদের সাথে মোলাকাত করতে পারি। পৃথিবীর সেরা মানুষ নবীগণের সাথে সময় কাটাতে পারি!



২৮) কেউ কূপে বা গভীর কোনো গর্তে নামলে ওপর থেকে একটা রশি নামিয়ে দেয়া হয়। রশির এক মাথা থাকে ওপরে অপেক্ষমান সহযোগীদের হাতে, আরেক মাথা থাকে নিচে নামা ব্যক্তির কাছে। এতে নিচে নামা মানুষটার মনে সাহস থাকে! তার মধ্যে উঠে আসার আশা থাকে!

কুরআন কারীমও দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নামিয়ে দেয়া রশি। কূপের রশি ছিঁড়ে যেতে পারে, উপরে থাকা মানুষগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে! কিন্তু কুরআনি রশি কখনোই ছিঁড়বে না। এই রশির অপর প্রান্তে থাকা সত্তা কখনো ওয়াদার খেলাফ করবেন না। পরম নিশ্চিত্তে আমরা কুরআনি রশিকে আঁকড়ে ধরতে পারি। নির্ভর মনে নিজের জীবন কুরআনি রশির ওপর ছেড়ে দিতে পারি!



২৯) আল্লাহ তা'আলার দু'টি কিতাব। কুরআন ও বিশ্বজগত। একটি কিতাব পাঠযোগ্য আরেকটি দর্শনযোগ্য। কুরআন কারীম পাঠের জন্য। বিশ্বজগত দেখার জন্য। কিতাবদু'টি যাবতীয় ইলম ও হিদায়াতের উৎস। কিতাব দু'টি থেকে আল্লাহ তা'আলার 'সুনান (কর্মপদ্ধতি)' ও 'ফিতরাত (কর্মকৌশল)' জানা যায়। এসব সুনান ও ফিতরাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতকে পরিচালনা করেন।

তবে কিতাব দুটির গবেষণার ফলাফলে পার্থক্য আছে। বিশ্বজগত নিয়ে গবেষণা করে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেটা প্রামাণ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়। সঠিক হতে পারে ভুলও হতে পারে। কিন্তু কুরআন কারীম থেকে প্রাপ্ত ইলম শতভাগ সত্য ও সুনিশ্চিত।



৩০) বর্ষাকালে, পুকুর বা নদীর উঁচু নিচু ঢাল ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে থাকে। ছেলেবেলায় মজার এক খেলা ছিল, পাড়ের ওপর থেকে পিচ্ছিল খেয়ে সাঁই সাঁই করে পানিতে গিয়ে পড়া। কোনো কসরত করতে হত না, হাত-পা চালাতে হত না, জায়গামতো কায়দা করে বসলেই হলো, সুডুৎ করে পানিতে! তবে কখনো এই পিচ্ছিল পথে কাঁচভাঙা থাকে, কাঁটা থাকে, হড়কে এগিয়ে যাওয়ার সময় কেটে রক্ত বের হয়ে যায়।

সাধারণত বইপত্র পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হয়, উল্টাপাল্টা কোনো তথ্য আছে কি না! আদর্শিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ক কোনো কিছু আছে কি না! পা টিপে টিপে আগাতে হয়! যাতে ভুল চিন্তার পিচ্ছিল পাড়ে হাঁটতে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে না পড়ি! এজন্য বড় সতর্কতার সাথে বই বাছতে হয়। এমনকি ধর্মের নামে প্রকাশিত বইও আজকাল নিরাপদে পড়ার জো নেই! কে কোথায় ভুল চিন্তা দিয়ে বসে আছে!

কিছু কুরআন কারীম? এক লা-জওয়াব কিতাব! আরামসে পিছল বেয়ে এগিয়ে চলো! ভাঙকাঁচ বা কাঁটার ভয় নেই। নিশ্চিত নির্ভুল এক পথ! শুধু কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই হলো, বাকিটুকুর দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার! জোব বুজে গন্তব্যে পৌঁছে যাব! সূরা ফাতিহা দিয়ে 'ফাতহ' করে মজার এক সফর শেষ করে 'নাস' হয়ে বেরোব।

ফাতহ অর্থ খোলা, জয় করা। নাস অর্থ: মানুষ।

৩১) কুরআন কারীম পবিত্রতম কিতাব। সুন্দরতম কিতাব। পূর্ণতম কিতাব। বিত্তকৃতম কিতাব। ছোটদেরকে প্রথম থেকেই কুরআনের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়া। ছোট ছোট সূরা দিয়ে শুরু হবে। উঠতে-বসতে, মন খারাপ হলে, ঘনুতে যাওয়ার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, বের হওয়ার সময়, খেতে বসলে, খেয়ে উঠলে! সব সময়ই অল্প কিছু হলেও তারা মুবশ্ব পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। কুরআন কারীম যেন তাদের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে যায়। আত্মার সঙ্গী হয়ে পড়ে।



৩২) রমযান মাস কুরআনের মাস। কুরআন নাখিলের মাস। কুরআন তিলাওয়াতের মাস। তারাবীহতে কুরআন খতমের মাস। তাহাজ্জুদে কুরআন খতমের মাস। সারাদিন সারাক্ষণ কুরআন নিয়ে পড়ে থাকার মাস। কুরআন নিয়ে বিভিন্ন আয়োজনের মাস। কুরআন নিয়ে ভাবনার মাস। কুরআন নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মাস। কুরআন নিয়ে সফরের মাস। কুরআন নিয়ে সময় কাটানোর মাস।

অপরদিকে রমযান মাস, কুরআন নিয়ে ব্যবসার মাস। কুরআন নিয়ে বাণিজ্যের মাস। কুরআন বিক্রির মাস। কুরআন কেনার মাস। যে যেভাবে গ্রহণ করে আর কি! আল্লাহর খাস বান্দাগণ শুধু কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাখুসুরেই সময় কাটান। তারা ব্যবসা করলেও, আল্লাহর সাথেই করেন। এই ব্যবসায় কোনও টাকা-পয়সার লেনদেন হয় না।



৩৩) একজন বুয়ুর্গকে প্রশ্ন করা হলো,
-কুরআন কতটুকু করে তিলাওয়াত করব?
-যতটুকু সৌভাগ্য তুমি চাও।



৩৪) এক হরফে দশ নেকি। কুরআন কারীমের দুই পৃষ্ঠায় গড়ে হরফ থাকে গড়ে ১২০০। দুই পৃষ্ঠা পড়তে সময় লাগবে, দুই থেকে চার মিনিট। কত অল্প সময়ে কি বিশাল লাভ! কিন্তু কত 'চার মিনিট' এমনি এমনি নষ্ট করে ফেলি!

৩৫) ক. কুরআন (قرآن) শব্দটা মাসদার (مصدر) বা শব্দমূল। ফু'লানুন (فعل) ওয়নে।

খ. মূলধাতু হলো, (فعل)। অর্থ, জমা করা। যুক্ত করা।

গ. নামকরণ: বান্দা তিলাওয়াত করার সময়, হরফ ও শব্দগুলোকে একত্র করে, জমা করে পড়ে। তাই কুরআনকে 'কুরআন' বলা হয়।

ঘ. সংজ্ঞার্থ: কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছে।

III

৩৬) কুরআন সংরক্ষণের দুই তরীকা!

ক. আল্লাহর কালামের সবচেয়ে বিখ্যাত নাম দুটি।

আল কুরআন (القرآن)। আল কিতাব (الكتاب)।

খ. দুটি শব্দ القرآن ও الكتاب। উভয় শব্দের মূলধাতুর অর্থ এক। الجمع ও المجمع জমা করা ও যুক্ত করা।

গ. القرآن শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'পাঠ'। আরেকটু খুলে বললে, শ্রোতা গুনতে পায় মতো করে, একজন পাঠক অক্ষর ও শব্দকে নিজের মুখ দিয়ে উচ্চারণের মাধ্যমে একত্র বা যুক্ত করাকে 'কুরআন' বলে।

ঘ. الكتاب শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'লেখা'। আরেকটু খুলে বললে, অক্ষর ও শব্দকে অর্থবোধক করে কাগজে একত্র বা জমা করাকে লেখা বলে।

ঙ. কুরআন কারীমের উক্ত দুই নাম থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে দুইভাবে সংরক্ষণ করছেন। পাঠের মাধ্যমে। লেখার মাধ্যমে।

চ. কেউ কেউ মনে করেন, হিফয করার সময়ও যদি 'পড়া ও লেখা' উভয় পদ্ধতি পাশাপাশি গ্রহণ করা যায়, বেশি ফলদায়ক হয়। মুখস্থটা বেশিদিন স্থায়ী হয়।

III

৩৭) কুরআন কারীম বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কারো কারো একটা ভুল প্রায়ই হয়ে যায়। আমরা কুরআন কারীম বোঝার জন্য বিভিন্ন তাফসীর-তরজমা নিয়ে বসি। লেকচার শুনি। আর ভাবি, কুরআন বুঝে যাব। উহু, চিন্তাটা একটু পরিবর্তন করে নেয়া প্রয়োজন।

আমরা কুরআন বোঝার চেষ্টা হিশেবে, তরজমা-তাফসীর-লেকচারের আশ্রয় নিব সত্য, তবে এটা ভেবে বসব না, এতে আমি কুরআন বুঝে যাব! মনে রাখতে হবে, প্রকৃত বুঝ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক বুঝ আসার জন্য, সামান্য 'মাধ্যম' গ্রহণ করেছি মাত্র। আমার চেষ্টা আর মেহনত হিশেবেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে 'বুঝ' দান করবেন।

বাজারে গিয়ে একটা তাফসীর কিনে বা পছন্দসই একজন শায়খের তাফসীর শুনেই, কুরআন বুঝে যাবো, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কুরআন বোঝার জন্য যত-যাই করি না কেন, পড়া ও শোনার পাশাপাশি 'দু'আও' করতে হবে। শুধু কুরআন বোঝার দু'আই নয়, কুরআনের সঠিক মর্ম বোঝার জন্য, সঠিক মাধ্যম (তাফসীর লেখক) গ্রহণ করার তাওফীকের জন্যও দু'আ করতে হবে।



৩৮) কুরআন কারীমের একটা আয়াত বারবার পড়ার উপকারিতা কী?

- এক. অর্থ বোঝা সহজ হয়ে যায়।
- দুই. হিফয পাকাপোক্ত হয়।
- তিন. সওয়াব বৃদ্ধি পায়।
- চার. আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি জাগে।
- পাঁচ. আল্লাহর ইবাদত হয়।
- ছয়. ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- সাত. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় হয়।
- আট. শারীরিক আরোগ্য লাভ হয়।
- নয়. আত্মার ব্যাধি দূর হয়।
- দশ. মানসিক রোগ দূর হয়।
- এগার. হক বোঝার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত হয়।



৩৯) বিবির স্বামীর কাছে কত ধরনের আবদার করে! বায়না ধরে! স্বামীও বিবির কাছে নানা কিছু কামনা করে! কোনো বিবির কাছে স্বামীর পানরাঙা ঠোট ভালো লাগে! কোনো স্বামীর কাছে বিবির মেহেদীরাঙা হাত ভালো লাগে!

তারা একে অপরের কাছে যেভাবে নানা রঙে রঙিন 'বস্তু' কামনা করে, তদ্রূপ যদি কুরআনরাঙা কলব কামনা করত তাহলে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানই আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে উঠত! বলাবাহুল্য আল্লাহর রঙের চেয়ে সুন্দর রঙ আর কী হতে পারে?



৪০) পরিচিত এক হুজুরনি বিবি তার হুজুর 'মিঞার' কাছে আদার জুড়েছে! -ঘরের বাইরে গেলে খয়ের দিয়ে পান খেয়ে ঠোট-জিভ লাল করে আসতে পারেন না?

স্বামী তার সোহাগী পানরসিক বিবিকে বেরসিকের মতো উত্তর দিয়েছে, -তুমি তোমার কলবকে কুরআনি রঙে রঙিন করে রাখতে পার না? ঠিক আছে, চলো

দু'জনে প্রতিজ্ঞা করি, আমি বাহির থেকে পানরাঙা চোঁট নিয়ে ফিরব, তুমি কুরআনরাঙা কলব নিয়ে অপেক্ষা করব!

-না, আপনার কথার সাথে একটু সংযোজন করি, আপনি দুই রাঙা নিয়ে ফিরবেন। পানরাঙা চোঁট আর কুরআনরাঙা কলব!



৪১) গুনাহ করতে করতে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকলেও একটিবার শুধু সাহস করে খাস দিলে কুরআন কারীম নিয়ে বসলেই হলো। মনটা নরম হয়ে আসবে! দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠবে! রবের প্রতি মনটা বিন্ম হয়ে উঠবে! তাওবার প্রতি মনটা আগ্রহী হয়ে উঠবে! কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা ও তিলাওয়াত শোনার মধ্যে আজীব এক 'আসর'। অদ্ভুত এক প্রভাব! গুনাহের দরিয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে কুরআন কারীমই হতে পারে মুক্তির 'ডিস্কি'। মনপবনের নাও!



৪২) একটু আগের কথা। মাদরাসার কাজে বাইরে ছিলাম। ফিরে দেখি মাদরাসার মাতবাখে ভাত নেই। তরকারিও নেই। দুপুরে খাওয়া হয়নি। খুঁজে পেতে সকালের কিছু পান্তাভাত পাওয়া গেল। তাই সই! একটা কাঁচা মরিচ আছে কি না দেখ!

-জি আছে!

-লে আও, খানা লাগাও!

আসরের পর, দুপুরের খাবার খেতে খেতে মনে হলো, আমি পেটের ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে, হাতের কাছে যা পেয়েছি, তাই গোথাসে গিলতে বসে গেছি! কই কুরআন কারীম নিয়ে তো এভাবে বসি না! ভাতের ক্ষুধার চেয়ে কলবের ক্ষুধা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? ভাত দিয়ে উদরপূর্তি করার চেয়ে কুরআন দিয়ে কলবপূর্তি করা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? কতশত ছুতোনাতা! কুরআন কারীম তো সকালে পড়া হয়! মসজিদে গিয়ে পড়া হয়! এখন অসময়ে কেন কুরআন নিয়ে বসা? ওজু নেই যে! আরে পাজি, তোর পেটের ক্ষুধার যদি কোনো সময়-অসময় না থাকে, কলবের ক্ষুধার কেন সময়-অসময় থাকবে! তুই তোর পেটের জ্বালা সইতে না পেরে এক শানকি পান্তাভাত মুহূর্তেই উড়িয়ে দিলি! কলবের জ্বালা সইতে না পেরে কি একটা পারা খতম করতে পারিস না? নিদেনপক্ষে একটা পৃষ্ঠা? অন্তত একটা আয়াত? কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ কুঁচো দিয়ে?



৪৩) কুরআন কারীম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য আমার আশেপাশে কত বস্ত্র আছে! আমার ঘরে কেউ কুরআন নিয়ে বসে না। বন্ধুদের কেউ কুরআন

নিয়ে ভাবে না। চারপাশের প্রায় সবকিছুই আজ কুরআনবিমুখ। ধর-বাড়ি, রাজা-ঘাট, সমাজ-রাষ্ট্র, পাঠ্যক্রম সবই কুরআনবিমুখ। পাশাপাশি আমাকে কুরআনবিমুখ করে তোলার জন্য কুফরিশক্তির নানা সক্রিয় আয়োজন তো আছেই!

কিন্তু আমি এসব বাধাকে গোণায় ধরতে যাবো কেন? দুনিয়াবি কাজে কি আমি বাধা মানি? বিঘ্নকে পরোয়া করি? তাহলে কুরআনের ব্যাপারে কেন বাধা মানবো? জ্ঞানীরা তার কাজে বাধা পেলে থমকে যায় না। হোঁচট খায় না। আমিও যত বাধাই আসুক, কুরআনকে ছাড়বো না! ইনশাআল্লাহ!

□

৪৪) পানে চুন বেশি হয়ে গেলে, জিহ্বা পুড়ে যায়। বেশি গরম চা খেলে মুখ পুড়ে যায়। তখন ভাত খেতে কষ্ট হয়। কাল কিছু খাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। অনেক মজার খাবারও বিশ্বাস হয়ে যায়।

গুনাহ করতে করতে আমার কলবটাও নষ্ট হয়ে গেছে। আমলনামা কালো হয়ে গেছে। এখন আর কুরআন কারীম ভালো লাগে না। কুরআন কারীমের স্বাদ কলবে লাগে না। কুরআনের আয়াত কলবে দাগ কাটে না। উল্টো কুরআন পড়তে বসলে কষ্ট লাগতে শুরু করে। নানা ছুতোর হা-পিত্যে শ শুরু হয়ে যায়।

□

৪৫) জীবনের বেশির ভাগ সময় কুরআন কারীম বোঝার মেহনত ছাড়া অন্য কিছুতে কেটে গেছে! এটা ভেবে এখন ভীষণ অনুতাপ বোধ হয়! ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. শেষ জীবনে কারাবন্দী থাকাবস্থায় এ আক্ষেপ করেছিলেন। সত্যিই আক্ষেপ করার মতোই ব্যাপার! এমন সুনিশ্চিত লাভজনক কাজ বাদ দিয়ে কোনো বুদ্ধিমান অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হবে?

□

৪৬) কুরআন কারীমের ভালোবাসা প্রথমে উলামায়ে কেরামের মধ্যে আসতে হবে। তাদের দেখাদেখি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও কুরআনের ভালোবাসা আসবে। আলিমদের মধ্যে কুরআনি ভালোবাসা কিভাবে আনা যায়? এর অনেক পদ্ধতি আছে। প্রাথমিক চেষ্টা হিশেবে দুটি কিতাব পড়া যেতে পারে।

ক) ফাযায়েলুল কুরআন। আল্লামা আবু ওবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম রহ.।
খ) আখলাকু হামালাতিল কুরআন। আল্লামা আবু বকর বিন মুহাম্মাদ আজুরি রহ.।

ইমাম নববী রহ.-এর কিতাবটাও বেশ উপকারী। তার কিতাবের নাম 'আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন'। আমার প্রিয় কিতাবগুলোর একটি। মাকতাবাতুল আযহারে একবার কিতাবটার পকেটসাইজ সংস্করণ পেয়েছিলাম। সে থেকে আমি কিতাবটার সাথেই থাকি।

সূচিপত্র

মাদরাসাতুল কুরআন: দরসে কুরআন	২৬১
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি স্বপ্ন	২৬২
মাদরাসাতুল কুরআন: নিযামুল আওকাত	২৬৮
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি প্রতিযোগিতায়	২৬৯
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি অনুভূতি	২৭৬
মাদরাসাতুল কুরআন: আয়াতচর্চা	২৭৮
মাদরাসাতুল কুরআন: সহজ কুরআন	২৭৯
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনপ্রেমিক	২৮০
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি ঘরানা	২৮১
মাদরাসাতুল কুরআন: কাউসার ও মা'উন	২৮৩
মাদরাসাতুল কুরআন: দারিদ্রবিমোচন	২৮৪
মাদরাসাতুল কুরআন: ওয়ালিদাইন	২৮৫
মাদরাসাতুল কুরআন: আল কাহফ	২৮৭
মাদরাসাতুল কুরআন: মুসলিহ/সালিহ	২৮৯
মাদরাসাতুল কুরআন: লক্ষ্য ও দৌড়	২৯০
মাদরাসাতুল কুরআন: চার ওয়াদা	২৯১
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি ইনসাফ	২৯১
মাদরাসাতুল কুরআন: তিন তিন	২৯২
মাদরাসাতুল কুরআন: আলেমের আল্লাহভীতি	২৯৩
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি ক্ষমা	২৯৩
মাদরাসাতুল কুরআন: যিন্দা কুরআন	২৯৪
মাদরাসাতুল কুরআন: দুনিয়ার চিত্র	২৯৫
মাদরাসাতুল কুরআন: তিনটি প্রশ্ন	২৯৫
মাদরাসাতুল কুরআন: সমৃদ্ধ আরবি ভাষা	২৯৬
মাদরাসাতুল কুরআন: দায়ী কে?	২৯৭
মাদরাসাতুল কুরআন: শহর ও গ্রাম	২৯৭
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআন	২৯৯
মাদরাসাতুল কুরআন: অবতারণের ধারাক্রম	৩০০
মাদরাসাতুল কুরআন: বৃহৎ শব্দ	৩০০
মাদরাসাতুল কুরআন: আবদ	৩০০
মাদরাসাতুল কুরআন: প্রথম ও শেষ	৩০২

মাদরাসাতুল কুরআন: আল্লাহর নাম	৩০২
মাদরাসাতুল কুরআন: রাহমান ও রাহীম	৩০৩
মাদরাসাতুল কুরআন: বাকারার ভূমিকা	৩০৩
মাদরাসাতুল কুরআন: শহীদের হাসি	৩০৪
মাদরাসাতুল কুরআন: ইসলাম	৩০৪
মাদরাসাতুল কুরআন: উট সমাচার	৩০৫
মাদরাসাতুল কুরআন: সহচর	৩০৭
মাদরাসাতুল কুরআন: কাফেরের রাগ	৩০৭
মাদরাসাতুল কুরআন: সান্ত্বনা	৩০৮
মাদরাসাতুল কুরআন: পার্থক্য রেখা	৩০৯
মাদরাসাতুল কুরআন: দাজ্জালের ফিতনা	৩০৯
মাদরাসাতুল কুরআন: পদস্থলন	৩১০
মাদরাসাতুল কুরআন: অবিচল স্থিরতা	৩১১
মাদরাসাতুল কুরআন: মুখআলগা	৩১৪
মাদরাসাতুল কুরআন: আহযাব	৩১৪
মাদরাসাতুল কুরআন: নারীর শোক-দুঃখ	৩১৫
মাদরাসাতুল কুরআন: মার্জনা	৩১৭
মাদরাসাতুল কুরআন: ফির'আওন	৩১৭
মাদরাসাতুল কুরআন: ধোঁকা	৩১৮
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনের হিদায়াত	৩১৮
মাদরাসাতুল কুরআন: ওহে সহচরগণ	৩২০
মাদরাসাতুল কুরআন: ইসমুত তাফদীল	৩২১
মাদরাসাতুল কুরআন: মুসাব্বিহাত	৩২৩
মাদরাসাতুল কুরআন: ওয়াহদাতুল কুরআন	৩২৪
মাদরাসাতুল কুরআন: ইবতিলা	৩২৫
মাদরাসাতুল কুরআন: জাহিলিয়াত	৩২৬
মাদরাসাতুল কুরআন: জাতির পিতা	৩২৭
মাদরাসাতুল কুরআন: আয়াতের প্রকারভেদ	৩২৮
মাদরাসাতুল কুরআন: কাফেরদের বৈশিষ্ট্য	৩২৯
মাদরাসাতুল কুরআন: ইহুদি মিডিয়া	৩৩০
মাদরাসাতুল কুরআন: সতর্কতা	৩৩২
মাদরাসাতুল কুরআন: সিয়াম কিতাল	৩৩৩
মাদরাসাতুল কুরআন: সংখ্যার জয়	৩৩৬
মাদরাসাতুল কুরআন: ইস্তিগফারের যোগ্যতা	৩৩৬
মাদরাসাতুল কুরআন: তাওবা	৩৩৬

মাদরাসাতুল কুরআন: মুবাহালা	৩৩৭
মাদরাসাতুল কুরআন: জীবন ও পানি	৩৩৮
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনি প্রেরণা	৩৩৮
মাদরাসাতুল কুরআন: মিসর	৩৩৯
মাদরাসাতুল কুরআন: মধ্যপন্থী উম্মত	৩৩৯
মাদরাসাতুল কুরআন: সাকীল কুরআন	৩৪০
মাদরাসাতুল কুরআন: গারুর-গুরুর	৩৪০
মাদরাসাতুল কুরআন: মাকাম-মুকাম	৩৪১
মাদরাসাতুল কুরআন: আট মাজরুর	৩৪২
মাদরাসাতুল কুরআন: ইন্নি কারীব	৩৪২
মাদরাসাতুল কুরআন: আশাপূর্ণ আয়াত	৩৪৩
মাদরাসাতুল কুরআন: সুম্মা-সাম্মা	৩৪৩
মাদরাসাতুল কুরআন: ক্বলব	৩৪৪
মাদরাসাতুল কুরআন: দায়ী	৩৪৮
মাদরাসাতুল কুরআন: জুলমের শাস্তি	৩৪৮
মাদরাসাতুল কুরআন: তাহাজ্জুদ	৩৪৯
মাদরাসাতুল কুরআন: দানের পার্থক্য	৩৫১
মাদরাসাতুল কুরআন: আল্লাহর সুনান	৩৫২
মাদরাসাতুল কুরআন: জালিমশাহী	৩৫৩
মাদরাসাতুল কুরআন: সন্তান লাভ	৩৫৪
মাদরাসাতুল কুরআন: দণ্ডক সন্তান	৩৫৫
মাদরাসাতুল কুরআন: পিচ্ছিল পথ	৩৫৬
মাদরাসাতুল কুরআন: উদ্ধার	৩৫৭
মাদরাসাতুল কুরআন: যুবকদল!	৩৫৭
মাদরাসাতুল কুরআন: সাকীনাহ	৩৫৮
মাদরাসাতুল কুরআন: সদাজাগ্রত	৩৬০
মাদরাসাতুল কুরআন: শোকর	৩৬১
মাদরাসাতুল কুরআন: আসমায়ে হুসনা	৩৬১
মাদরাসাতুল কুরআন: সততা	৩৬২
মাদরাসাতুল কুরআন: রবের কৃতজ্ঞতা	৩৬২
মাদরাসাতুল কুরআন: কন্যাসন্তান	৩৬৩
মাদরাসাতুল কুরআন: আয়াত	৩৬৩
মাদরাসাতুল কুরআন: বন্ধু আমার	৩৬৪
মাদরাসাতুল কুরআন: ভালোবাসি	৩৬৪
মাদরাসাতুল কুরআন: বিশুদ্ধ পথ	৩৬৫

মাদরাসাতুল কুরআন: সুন্দর ও সৌন্দর্য	৩৬৫
মাদরাসাতুল কুরআন: আপন কষ্ট	৩৬৬
মাদরাসাতুল কুরআন: সবরে আইয়ুব	৩৬৬
মাদরাসাতুল কুরআন: ঈমানী সম্মান	৩৬৭
মাদরাসাতুল কুরআন: উদ্ধার	৩৬৭
মাদরাসাতুল কুরআন: সন্তানপ্রতিপালন	৩৬৮
মাদরাসাতুল কুরআন: যুথবদ্ধ	৩৬৯
মাদরাসাতুল কুরআন: সুযোগের সদ্যবহার	৩৬৯
মাদরাসাতুল কুরআন: হকপ্রাপ্তি	৩৭০
মাদরাসাতুল কুরআন: রবের ভালোবাসা	৩৭১
মাদরাসাতুল কুরআন: জান্নাত ও জাহান্নাম	৩৭১
মাদরাসাতুল কুরআন: ইস্তিকামাত	৩৭২
মাদরাসাতুল কুরআন: জ্ঞানী ও বোকা	৩৭৩
মাদরাসাতুল কুরআন: রুহ	৩৭৩
মাদরাসাতুল কুরআন: মানবস্বভাব	৩৭৪
মাদরাসাতুল কুরআন: ওস্তাদগ্রহণ	৩৭৫
মাদরাসাতুল কুরআন: চিত্রশুদ্ধি	৩৭৬
মাদরাসাতুল কুরআন: উপেক্ষা	৩৭৬
মাদরাসাতুল কুরআন: জাতবিচার	৩৭৮
মাদরাসাতুল কুরআন: ঈমানের নেয়ামত	৩৭৮
মাদরাসাতুল কুরআন: অতীতের পাপ	৩৭৮
মাদরাসাতুল কুরআন: সচেতন নারী	৩৭৯
মাদরাসাতুল কুরআন: কুরআনী কর্মযোগ	৩৮০
মাদরাসাতুল কুরআন: কলবের নূর	৩৮১
মাদরাসাতুল কুরআন: পিপাসা	৩৮২
মাদরাসাতুল কুরআন: সর্বজ্ঞানী	৩৮২
মাদরাসাতুল কুরআন: ভালো-মন্দের বুঝ	৩৮৩
মাদরাসাতুল কুরআন: দুই দল	৩৮৩
মাদরাসাতুল কুরআন: গুরুত্বপূর্ণ গুণ	৩৮৪
মাদরাসাতুল কুরআন: নৈরাশ্য	৩৮৬
মাদরাসাতুল কুরআন: সাফল্য	৩৮৭
মাদরাসাতুল কুরআন: বই	৩৮৮
মাদরাসাতুল কুরআন: গোঁ	৩৮৮
মাদরাসাতুল কুরআন: প্রোপাগান্ডা	৩৮৯
মাদরাসাতুল কুরআন: আযাবের ধরণ	৩৯১

মাদরাসাতুল কুরআন: সূক্ষ্মদর্শী	৩৯১
মাদরাসাতুল কুরআন: দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ	৩৯২
মাদরাসাতুল কুরআন: গাধামানব	৩৯৩
মাদরাসাতুল কুরআন: গুনাহের প্রভাব	৩৯৪
মাদরাসাতুল কুরআন: সর্বশ্রোতা	৩৯৪
মাদরাসাতুল কুরআন: শয়তানের প্রতিনিধি	৩৯৫
মাদরাসাতুল কুরআন: উপদেশদাতা	৩৯৫
মাদরাসাতুল কুরআন: অপছন্দের বিষয়	৩৯৬
মাদরাসাতুল কুরআন: বালা-মুসিবত	৩৯৭
মাদরাসাতুল কুরআন: লাগাম	৩৯৭
মাদরাসাতুল কুরআন: নারীর বৈশিষ্ট্য	৩৯৮
মাদরাসাতুল কুরআন: প্রিয় বস্তু	৩৯৮
মাদরাসাতুল কুরআন: বিবি ও রুজি	৩৯৯

মাদরাসাতুল কুরআন

দরসে কুরআন

আলহামদু লিল্লাহ! মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীমে মাঝেমাঝে একটানা কুরআন কারীমের দরস হয়। কখনো তিন দিন ব্যাপী কখনো সপ্তাহ ব্যাপী। সাধারণত দিনে একপারা করে তরজমার দরস হয়। এই কার্যক্রমে যে দিকগুলো আমরা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করি,

১. কুরআন কারীম বিষয়ক প্রায় দশটা প্রামাণ্য লুগাতের আলোকে শব্দের তাহকীক পেশ করা।
২. প্রতিটি শব্দের আর কোন সমার্থ শব্দ কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হলে তা বলে দেয়া।
৩. প্রতিটি শব্দের কোন বিপরীত শব্দ কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তা বলে দেয়া।
৪. 'সিলা'র পরিবর্তনের কারণে অর্থ পরিবর্তনের বিষয়টা দেখিয়ে দেয়া।
৫. প্রামাণ্য তাফসীর ও নির্ভরযোগ্য (বাংলা-উর্দু-ফারসী-ইংরেজিতে) তরজমাতুল মা'আনিল কুরআনিল কারীমসমূহের আলোকে শাব্দিক তরজমা পেশ করা।
৬. প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তারকীবের আলোচনা করা।
৭. নিতান্ত প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্ত তাফসীরও পেশ করা।



প্রতি বছর যখন আমরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি, মাদরাসার সবার মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সাজসাজ রব। একদম যে দুর্বল, পড়ালেখায় একদম মনোযোগ নেই, সেও সামনের সারিতে বসার জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্রতিযোগিতা করে। আগে যে তালিবে ইলম তাহাজ্জুদের সময় থেকে শুরু সাড়ে সাতটায় নাস্তার ছুটি পর্যন্ত একটানা ঝিমুতে থাকত, সেও দেখি দিব্যি কলম-পেন্সিল নিয়ে দরসে তীব্র আগ্রহ নিয়ে বসেছে। ভীষণ ভালোবাসা নিয়ে পাক কালামের শব্দের তাহকীক লিখছে।

আমরা দরসের ফাঁকে ফাঁকে পালাক্রমে (দাঁড় করিয়ে), তাদের বর্তমান অনুভূতিগুলো শুনি। বিস্মিত হই, কুরআন কারীমের প্রতি তাদের একেকজনের মনের আবেগ দেখে!

কুরআনি স্বপ্ন

সেই (নিয়মতান্ত্রিক) তালিবে ইলমি জিন্দেগি থেকেই, একটা স্বপ্ন ছিল, কিভাবে প্রথম বছরেই, একজন তালিবে ইলমকে পুরো কুরআন কারীমের তরজমা করার যোগ্যতা অর্জন করিয়ে দেয়া যায়।

আলহামদু লিল্লাহ, গত চৌদ্দ বছরের একটানা হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, এটা সম্ভব। গত চৌদ্দ বছরে আমরা, এই কার্যক্রমের প্রস্তুতিস্বরূপ এগারটা কিতাব তৈরি করেছি। এই কিতাবগুলো আরবি শেখা, নাহ্-সারফ শেখার বিষয়ে রচিত। কিতাবগুলো সম্পূর্ণ কুরআনের শব্দ দিয়ে তৈরি। বইগুলোতে আমরা চেষ্টা করছি, বিভিন্ন দিক থেকে কুরআন কারীমের শব্দগুলো পড়তে। নানা আসিকে কুরআন কারীমের শব্দগুলো আত্মস্থ করতে। ইলমুস সরফের কিতাবের সমস্ত শব্দ-মাসদার কুরআন কারীম থেকে নেয়া। কুরআন কারীমের সমস্ত মাসদারগুলোকে একত্র করে আমরা তৈরি করেছি মাসাদিরুল কুরআন। কুরআন কারীমের অর্থ শেখার মেহনতে প্রথম কিতাব হলো 'আমার কুরআন কারীম'। এ-কিতাব সম্পূর্ণরূপে কুরআন কারীমের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।



এক ভাই জানতে চেয়েছেন,

-আমাদের কুরআনি জামাতে, এক বছরে এতকিছু কিভাবে সম্ভব হবে? পুরো কুরআন কারীমের তরজমা-তাহকীক প্রথম বছরেই কিভাবে সম্ভব হবে? এ তো রীতিমতো অসম্ভব।

-একটু খুলে বললেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। একবছর সময় কিন্তু হিশেব করে খরচ করলে কম নয়। 'আমার কুরআন কারীম' কিতাবটাকে আমরা কিছু সূত্র মেনে তৈরি করেছি। কুরআন কারীমে মূল শব্দ বা মূল ধাতু হলো প্রায় দুই হাজার। এই দুই হাজার শব্দ থেকে নির্গত শব্দগুলোই পুরো কুরআন কারীমে ঘুরেফিরে এসেছে। কুরআন কারীমের মধ্যে 'স্পেস সেপারেটেড' শব্দসংখ্যা সর্বমোট, ৭৭.৪৩০ টি। 'স্পেস সেপারেটেড' মানে হলো, বাহ্যিকভাবে দেখতে একটা শব্দই মনে হয় এমন শব্দ। যেমন (يَنْصُرُونَهُ)। এখানে ব্যাকরণগতভাবে তিনটা শব্দ। কিন্তু আধুনিক লিঙ্গুইস্টিক (ভাষাবিজ্ঞান)-এর পরিভাষায় একটা শব্দ। এই হিসেবেই কুরআন কারীমের শব্দগুলোর হিসাব বের করা হয়েছে।



অন্য হিশেবে শব্দসংখ্যা আরও কম বলা হয়। পুরো কুরআন কারীমে একশত পনেরটা (১১৫) শব্দ এমন আছে যেগুলোর,

- ক কোনোটা এক হরফবিশিষ্ট
- ক কোনোটা দুই হরফবিশিষ্ট ।
- ক কোনোটা তিন হরফবিশিষ্ট ।
- ক আবার কোনটা তিন হরফের চেয়ে বেশি ।

এই একশত পনেরটা শব্দগুলো এমন যে, কুরআন কারীমের প্রতি লাইনের দশ শব্দের পাঁচটিই ওই ১১৫ শব্দের কোনো একটা হয়ে থাকে । তাহলে হিশেবটা দাঁড়ায় এই, একশত পনেরটা শব্দের অর্থ জানা থাকলে, কুরআন কারীমের অর্ধেক শব্দের অর্থ জানা হয়ে যাবে । প্রায় উনচল্লিশ হাজার শব্দের অর্থ জানা হয়ে যাবে । আমরা অবশ্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিশেবে, শব্দসংখ্যা ১১৫ না ধরে ৩০০ ধরি ।

□

আমার কুরআন কারীম কিতাবটা দুই খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডে কুরআন কারীমের শব্দগুলোকে নানাভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে । বিশেষ করে বহুল প্রচলিত ৩০০ শব্দকে । এছাড়াও ফলমূল বিষয়ক শব্দ, পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক শব্দ, স্থানবাচক শব্দ, কালবাচক শব্দ, আকাশ বিষয়ক, জমীন বিষয়ক শব্দ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক শব্দসহ আরো নানা শিরোনামে শব্দগুলোকে একত্র করা হয়েছে । কুরআন কারীমের শব্দগুলো দিয়ে আরবির প্রাথমিক বিষয়গুলো সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে । বাক্য গঠন করার নিয়মগুলো শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ।

পুরো কুরআন কারীম থেকে খুঁজে খুঁজে দুই শব্দবিশিষ্ট মুরাক্কাবে তাওসীফি, দুই শব্দবিশিষ্ট মুরাক্কাবে ইয়াফি, দুই শব্দবিশিষ্ট জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ, দুই শব্দবিশিষ্ট জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহগুলোকে অর্থসহ সাজিয়ে দেয়া হয়েছে ।

আলহামদু লিল্লাহ! 'আমার কুরআন কারীম' প্রথম খণ্ড পড়ার পর, একজন তালিবে কুরআন কারীমের প্রায় তিন চতুর্থাংশের অর্থ শাব্দিকভাবে বুঝতে পারে ।

□

আমার কুরআন কারীমের দ্বিতীয় খণ্ডটা সাজানো হয়েছে পুরো কুরআন কারীমের আয়াতগুলোকে বাছাই করে । এই বাছাইপর্ব শেষ করতে আমাদের সাত বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে । কুরআন কারীমের একটা শব্দও যেন বাদ না পড়ে, কুরআন কারীমের একটা কঠিন জায়গাও যেন বাদ না পড়ে এই মানদণ্ডকে সামনে রেখে আমরা কাজ চালিয়ে গিয়েছি । এখনো অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে । তারপরও মোটামুটি, তালিবে ইলমদের ইলমি দস্তুরখানায় আপাতত পেশ করার মতো হয়েছে বলা যায় ।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সব সময় দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন 'প্রথম বছরেই শব্দের তাহকীকসহ পুরো কুরআন কারীমের তরজমা শিক্ষা' কার্যক্রমকে কবুল করেন। আমীন।



কুরআন কারীমের শাব্দিক তরজমা বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তিনটা বিষয়।
এক. শব্দার্থ জানা।

দুই. ইলমুস সরফ জানা।

তিন. ইলমুন নাহ জানা।

ইলমুন নাহ না জানলেও প্রথম দুইটা জানলেই মোটামুটি শাব্দিক তরজমা করে ফেলা যায়। ইলমুন নাহ তো প্রয়োজন হয় ই'রাবের জন্য। কুরআন কারীমে তো ই'রাব (যবর যের পেশ) দেয়াই থাকে। আমাদের কথা শুনে কেউ কেউ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন,

-তাহলে কি তালিবে ইলমরা কুরআন কারীম পুরোপুরি বুঝে যায়?

-জি না। 'আমার কুরআন কারীম' কিতাবটা পড়ার পর, তালিবে ইলমরা শাব্দিকভাবে কুরআন কারীমের বেশির ভাগ আয়াতের অর্থ করতে শেখে। কুরআন কারীম পুরোপুরি বুঝতে পারা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর কুরআন কারীম শাব্দিকভাবে বুঝলেও চলবে না। মাত্র তিনশ শব্দের অর্থ শিখেই কেউ পুরো কুরআন বুঝে যাবে, এটা যৌক্তিক চিন্তা নয়। 'আমার কুরআন কারীম' কিতাবটার মূল লক্ষ্য হলো, তালিবে ইলমদেরকে কুরআন কারীমের সাথে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেয়া।

-তাহলে কুরআন কারীমের সাথে প্রাথমিক পরিচয়ের স্তর অতিক্রম করে আরেকটু আগে বাড়ার কোনো ব্যবস্থা আছে?

-জি, আমরা এতক্ষণ 'আমার কুরআন কারীম' নিয়ে কথা বলেছি। এই কিতাব ছাড়া আমরা তালিবে ইলমদেরকে আরবি শেখার আরও কিতাব পড়াই। তালিবে ইলমরা সারাদিনে দুই কি তিন ঘণ্টা 'আমার কুরআন কারীম' পড়ে। বাকি সময় কুরআনি আরবি শেখার অন্য মেহনত করে।



আমরা কুরআন কারীমের শাব্দিক অর্থ শেখার জন্য, প্রতিদিনের পাঠদানকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছি। পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে না পারলেও, কিছুটা শুরু করা হয়েছে,

এক. কুরআন কারীমে শব্দগুলো শেখার জন্য একটা দরস।

দুই. কুরআন কারীমের শব্দসম্বলিত হাদীস শরীফের একটা দরস।

তিন. কুরআন কারীমের সীগাগুলোর চেনার জন্য ইলমুস সরফের দরস।

চার. কুরআন কারীমের বাক্যগুলোর গঠন শেখার জন্য একটা দরস।

পাঁচ. কুরআন কারীমের নাহ্ শেখার জন্য একটা দরস।

একেকটা দরস হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে। আর দরসগুলো স্বাভাবিক নিয়মে ধারাবাহিকভাবে হয় না। প্রথম দরস হলো, কুরআন কারীমে শব্দগুলোর অর্থ শেখার দরস, এই দরসের পর আমরা পর্যাণ্ড সময় দিই, যাতে একজন দুর্বল তালিবে ইলমও নতুন পড়াটা শিখে ফেলতে পারে। এই দরসের পড়া হয়ে গেলে তারপর আরেকটা দরস হয়। এভাবেই চলতে থাকে চক্কিশ ঘণ্টার কার্যক্রম। আবার একটা বিষয় লক্ষণীয়, ঘণ্টা পাঁচটা হলেও প্রতিটি ঘণ্টায় যে শব্দগুলো পড়ছে, সেগুলো একই। অর্থাৎ একই শব্দকে একবার আমার কুরআন কারীমে শব্দ হিসেবে মুখস্থ করছে। আরেকবার সরফের নিয়মে পড়ছে, আরেকবার নাহ্র আঙ্গিকে পড়ছে। ঘর একটা, সেটা হলো কুরআন কারীম। আমরা সেই ঘরে প্রবেশের জন্য অনেক দরজা ব্যবহার করছি। এ ছাড়াও আমরা কুরআন কারীমের শব্দার্থ মনে রাখার জন্য কিছু প্রস্তাবনা পেশ করে থাকি।

(এক) প্রতি নামাযের পর কমপক্ষে দশটা শব্দের অর্থ দ্রুত মুয়াকারা করার ব্যবস্থা। শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে না পারলে সাথে সাথে বলে দেয়া হয়। এভাবে বারবার জিজ্ঞাসা করলে একসময় দেখা যায় অর্থটা শেখা হয়ে গেছে। যত মেধাহীন তালিবে ইলমই হোক বারবার শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়েই যায়।

(দুই) প্রত্যেক তালিবে ইলমকে দায়িত্ব দেয়া, প্রতিদিন একটা করে শব্দ নির্দিষ্ট করবে, যে শব্দ সাধারণত পারার কথা নয় এমন। নিজেও শিখবে, আশেপাশের অন্যদেরকেও শুনিতে দেবে।

(তিন) মাঝেমধ্যে পুরো মাদরাসার তালিবে গোল হয়ে বসা। এক হাজার বা তার কম বেশি ভিজিটিং কার্ড আকৃতির কাগজে একটি করে কুরআনের শব্দার্থ লেখা। নিজে একবার পড়ে পরের জনের কাছে পাচার করে দেয়া। এভাবে এক বসায় সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে পুরো কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ পড়া হয়ে যাবে। পরের বার সব কার্ড না দিয়ে যেসব শব্দ সবাই পারে সেগুলো বাদ দিয়ে মেহনতটা চালিয়ে যাওয়া। আন্তে আন্তে কার্ডের পরিমাণ কমতে থাকবে।

(চার) প্রতিদিন বোর্ডে কুরআন কারীম থেকে দশটা বা বিশটা শব্দ অর্থসহ ঝুলিয়ে দেয়া।

(পাঁচ) পঞ্চাশটা (বা তার কমবেশি) কুরআনের শব্দ সম্বলিত শিট তৈরি করা। সেগুলো সবার মাঝে বিলি করে দেয়া হবে। একজনের শেখা হলে অপরজনকে দিয়ে দেবে।

(ছয়) প্রতিদিন কুরআন কারীমের দরসে শুরুতে এবং শেষে দ্রুত দশ-পনেরটা শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করতে পারি।



কুরআন কারীম বোঝার দুইটা দিক আছে।

☞ এক. শুধু শাব্দিক-বাহ্যিক দিকটা বোঝা।

☞ দুই. নাহ-বালাগাত-ই'জাযসহ বোঝা।

আমরা এক বছরে প্রথম দিকটা নিয়েই মেহনত করি। পুরো কুরআন কারীমকে ভালোভাবে বোঝাটা তো মানব-সাধ্যাতীত বিষয়। যেখানে ইবনে উমর রা. সূরা বাকারার শিখেছেন আট বছর ব্যয় করে। সেখানে আমরা কোন ছার।

আমরা যদি একজন তালিবে ইলমকে, জীবনের প্রথম বছরেরই কুরআন কারীমের বাহ্যিক রূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে বাকী জীবন সে কুরআন কারীমের অন্তর্নিহিত রূপের পেছনে ব্যয় করতে পারবে। অথবা সে মাদরাসা শিক্ষা চালিয়ে যেতে না পারলেও, পরবর্তী জীবনে কুরআন কারীমের সাথে এই প্রথম বছরের পরিচয়টা অনেক কাজে দিবে।



কারো কারো প্রশ্ন,

-প্রথম বছরেই কিভাবে সরফ পড়বে?

আমরা বলি,

-দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে যখন, মিয়ান বা অন্য কিতাব পড়ে, তখনো কি সরফের প্রথম বছর নয়? সিলাসিলাতুল আফ'আল শেখার জন্য কি কুরআন কারীম বা আরবি অক্ষরজ্ঞান ভালোভাবে থাকাটাই যথেষ্ট নয়?

-ইলমুন নাহ কিভাবে প্রথম বছর পড়বে?

-ইলমুন নাহর মৌলিক জ্ঞানটা প্রথম প্রথম না বুঝেই পড়তে থাকলে সমস্যা তো দেখি না। মুখস্থ করার দরকার নেই, শুধু দেখে দেখে পড়া। ফা'য়িলে (কর্তা) সর্বদা রফা হয়। এই কথাটা বারবার পড়তে তো কোন কষ্ট দেখি না। আর ইলমুন নাহর 'নিয়ম' খুব বেশি নয়। মৌলিক কিছু নিয়ম, বুঝে হোক বা না বুঝে, তাদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিতে পারলে, সামনের পথচলা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়।

আচ্ছা ধরে নিলাম, না বুঝে পড়ে লাভ নেই। কিন্তু তারা ক'দিন না বুঝে থাকবে? একদিন? দু'দিন? একসপ্তাহ? না বুঝে সে যাবে কোথায়? কতবার পড়ানোর পর সে বুঝবে? একশত বার? একহাজার বার? কোনো সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ আমরা প্রস্তুত।

-সবকিছুর একটা স্তর আছে, উপযুক্ত সময় আছে! দশম শ্রেণীর পড়া তাকে প্রথম শ্রেণীতে জোর করে পড়ানো কি যুক্তিযুক্ত?

-আমাদের কুরআনি মেহনতে একজন তালিবে ইলম প্রথম সপ্তাহেই শতাধিক কুরআনি শব্দ শিখে যায়। আরবিতে প্রাথমিক বাক্য গঠনগুলো শিখে যায়! এ-পর্যায়ে ইলমুন নাহর প্রাথমিক নিয়মগুলো সে বুঝবে না কেন? হ্যাঁ, জটিল নিয়ম সে বুঝবে না। আমরা তাকে এসব বোঝাতে যাইও না।

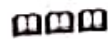
-ভাষা আগে না ব্যাকরণ আগে?

-অবশ্যই ভাষা আগে।

-আপনারা যে আগে ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন?

-আমরা কোথায় ব্যাকরণ আগে শেখাচ্ছি? প্রতিদিন আমরা প্রায় পনের ঘণ্টা সময় হাতে পাই। মাত্র আধা ঘণ্টা সময় তারা 'ইলমুন নাহর' কায়দাকানুন শেখে। মানে মুখস্থ করে। বাকি সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা 'ভাষা আগে' পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে। আর আমরা ইলমুন নাহর প্রাথমিক কায়দাগুলো মুখস্থ করানো শুরু করলেও প্রথম অবস্থায় সেগুলোর প্রায়োগিক দিকে যাই না। অন্তত কুরবানির আগে তো নয়ই।

আর আমরা শুধু একটা বিষয় পড়াচ্ছি না, সারাদিনে একসাথে সবগুলো বিষয় পড়াচ্ছি। এক সপ্তাহ পর থেকেই সব পড়ার সংমিশ্রণে-মিথক্রিয়ায় তালিবে ইলমের মনে এক ধরনের জারণক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সবগুলো দরসের পড়া সে আপনাআপনিই মনে মনে জোড়া লাগাতে শুরু করে দেয়।



কিছু দাবি থাকে থিউরিক্যাল (চিন্তাপ্রসূত)। বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। সেই দাবির সাথে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার কোন মেলবন্ধন থাকে না। এক বছরে পুরো কুরআন কারীমের তরজমা শেখার বিষয়টাও আমাদের একটা দাবি। কিন্তু এই দাবি আমরা নিজেদের ঘরোয়া পরিমণ্ডলে করেছিলাম, আজ থেকে চৌদ্দ বছর বছর আগে। তারও আগে এই দাবি নিয়ে অনেক দিন চিন্তাভাবনা চলেছে।

চৌদ্দ বছর আগে থেকেই এই দাবির স্বপক্ষে কিতাব প্রস্তুতের কাজ শুরু করেছিলাম। পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারিক পরীক্ষাও চলছিল। প্রথম প্রথম আশেপাশের তীব্র বিরোধিতা আর অবিশ্বাসের মুখে আমাদের মনেও ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিত, আসলেই এটা সম্ভব কিনা। সাত বছর আগে এই চিন্তার প্রতি আস্থা জাগতে শুরু করে। আসলে যে যাই বলুক, প্রথম বছরে পুরো কুরআন কারীমের অর্থ শেখানো সম্ভব। অবশ্য সাত বছর আগে, সময়টা পুরো কুরআন কারীমের অর্থ শেখাটাকে দুই বছরের সময়সীমায় নামিয়ে আনতে পেরেছিলাম। দুই বছর এভাবে গেল। পাঁচ বছর আগে থেকে সময় কমতে শুরু করেছে। গত তিন বছর থেকে আমরা পুরো কুরআন কারীমের অর্থ শেখাটাকে এক বছরে নামিয়ে আনতে পেরেছি। তবুও আমরা বিষয়টা বাইরে ঘোষণা বা প্রচার করতে যাইনি। আরেকটু নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এখন আলহামদু লিল্লাহ, আর কোন সন্দেহ নেই। আমরা এখন অন্যদেরকেও এই কার্যক্রমে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, এটা দাবি করা চরম ধৃষ্টতা হবে যে আমরা একেবারে নিখুঁত একটা পদ্ধতি বের করে ফেলেছি। এখনো খুঁটিনাটি অনেক খুঁত রয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে আমরা সেসব শুধরে উঠতে পারব বলে বিশ্বাস। সর্বোপরি, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা সারাক্ষণই এই কর্মসূচির কামিয়াবির জন্য দু'আ করে আসছি। বরকতের জন্য দু'আ করছি, সাহায্য চাইছি।

নিয়ামুল আওকাত

এ-বছর (১৪৩৭ হিজরী)-এর জন্য নিয়ামুল আওকাত ঠিক করেছি। যা ব্যস্ততা এখন থেকেই শুরু হয়েছে, ঠিকমতো আদায় করতে পারবো কি না, ঘোরতর সন্দেহ আছে। আশা করতে দোষ কী? তাওফীক তো রাব্বের কারীমের পক্ষ থেকেই আসে। আসছে। আসবে। ইনশাআল্লাহ।



প্রতিদিনের কুরআনকে ভালোবাসার রুটিন।

এক. আরবি তারিখ মিলিয়ে একটা পারা ইয়াদ করা। পারাটা নামাযে তিলাওয়াতের ইহতিমাম করা।

দুই: কমপক্ষে এক ঘণ্টা তাফসীরুল কুরআন শোনা। নতুন তাফসীর শোনা। আগে শুনে রাখা তাফসীরও আবার শোনা। যেভাবেই হোক শায়খ শা'রাভী রহ.-কে খতম করা। সাঈদ রামাদান আল বুতীকেও চেষ্টা করা।

তিন. জাওয়াহিরুল কুরআন থেকে কমপক্ষে দুইটা সূরার খুলাসা তাকসীর মুখস্থ করা।

চার. তাদাব্বুরে কুরআন থেকেও একটা সূরা পড়ার চেষ্টা করা।

পাঁচ. উজুহ-নাযায়ের থেকে কমপক্ষে দশটা শব্দ পড়া। মুখস্থ করা।

ছয়. মুতারাদিফাত থেকে কমপক্ষে দশটা শব্দ পড়া। মুখস্থ করা।

সাত. মুতাশাবিহাত নিয়ে কমপক্ষে অধাঘণ্টা পড়া। মুখস্থ করা।

আট. মুফাহরাস নিয়ে কিছু সময় কাটানো। মুখস্থ করা।

নয়. বিষয়ভিত্তিক আয়াত নিয়ে ভাবা। প্রতিদিন অন্তত একটা বিষয়ে আয়াতগুলো আয়ত্ত্ব করা।

দশ. উলুমুল কুরআনের একটা বিষয় নিয়ে পড়া। নোট করা। বক্তব্য-লেখা প্রস্তুত করা।

এগার. তাদাব্বুরে কুরআনের মূলনীতিগুলো নিয়ে পড়া। কমপক্ষে একটা মূলনীতি পড়া।

বার. আসরের পর বা অন্যসময় একাধিক ব্যক্তির সাথে তাকসীর নিয়ে মুযাকারা করা।

তের. একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াতগুলো কারো সাথে মুযাকারা করা।

চৌদ্দ. কাসাসুল কুরআন পড়া। প্রতিদিন একজন নবী বা একটা ঘটনা পড়া। বিস্তারিত।

কুরআনি প্রতিযোগিতায়

পটিয়ায় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বসে আছি। ছোট ছোট হাফেজ সাহেবদের সুমধুর সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনছি। কান ছিল তিলাওয়াতের দিকে। পাশাপাশি মন ছিল একটি আয়াতের দিকে। ভাবছিলাম সূরা বাকারার একটা আয়াত নিয়ে।

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ قَاتِلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

তোমরা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) যেখানে পাও হত্যা করো। তারা যেখান থেকে তোমাদেরকে বের করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান

থেকে বের করে দাও। আর ফিতনা (শিরক) হত্যার চেয়েও মারাত্মক। তারা তোমাদের সাথে লড়াই না করা পর্যন্ত তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে তাদের সাথে লড়াই করো না। যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। এমনই (হয়) কাফিরদের প্রতিদান। (১৯১)



ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের অত্যন্ত প্রিয় আয়াত। কয়দিন আগে কোথায় যেন পড়লাম, যখন মদীনায় এই আয়াত নাযিল হলো, তখন কিছু লোক মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পাক-আফগান সীমান্তে 'কাফিরিস্তান' নামে নাকি একটি জায়গা আছে। মক্কা ছেড়ে পালিয়ে আসা লোকেরাই আজকের এই কাফিরিস্তানের বাসিন্দা। অনেক খুঁজেও এমন কোনো 'স্তানের' সন্ধান বের করতে পারিনি। কতভাবে যে ইসলামবিরোধী প্রচারণা চলে!

কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমি এই আয়াতের (বাকারা: ১৯১) সূত্র ধরে কাফিরিস্তান নিয়ে ভাবছি, দেখি হিফজ প্রতিযোগিতার ছোট হাফেজ সাহেবও ঠিক এই আয়াত পড়া শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব! কাকতালীয় ব্যাপার!



সারা দিন কুরআন তিলাওয়াত শুনেই কাটিয়ে দিয়েছি। প্রতিযোগীরা বিভিন্ন সূরা থেকে তিলাওয়াত করছে, আমিও শোনার পাশাপাশি তরজমা-তাহকীক পারি কিনা যাচাই করে দেখছি। একটা শব্দ না পারলে সাথে সাথেই ট্যাব থেকে বিভিন্ন লুগাতুল কুরআন থেকে তাহকীক দেখে নিচ্ছি। ট্যাবটাতে কুরআন কারীম বিষয়ক যেখানে যত কিতাব পাই নিয়ে রাখি। বত্রিশ জিবি প্রায় পুরোটাই কুরআন কারীম বিষয়ক কিতাবে ঠাসা।

এই চলমান জখিরায়, মোটামুটি সুলভ সব তাফসীরই আছে। ইলমের বিশাল সমুদ্র নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মাসালুহম কামাসালিল হিমার, ইয়াহমিলু আসফারা। আমার দৃষ্টান্ত হলো কিতাববাহী গাধার মতো। শুধু বহনই করি, ধারণ করতে পারি না। আহ! যদি সত্যিকার বহনকারী হতাম? ট্যাবের পাশাপাশি যদি নিজের ভেতরে ধারণ করে ঘুরতে পারতাম!



ট্যাবে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, পুরো কুরআনের ডিসপ্রে। এই অ্যাপ্লিকেশনের দারুণ এক সুবিধা হলো, ডিসপ্রেসর কোনো শব্দে আঙুল ছোঁয়ালেই অর্থ ফুটে উঠে। এত সহজলভ্য হয়ে গেছে ইলমের উপকরণ! কী যে ভালো লাগে হাতের

নাগালে তাফসীরের কিতাবগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াতে! হই না অযোগ্য বহনকারী! কিন্তু সাথে করে ঘুরলে কিছু না কিছু লাভ তো আছেই।

□□□

দুপুরে জুমার আগে ওজু করতে যাচ্ছিলাম, তখন ছোট প্রতিযোগি হাফেজ সাহেব পড়ছিলেন,

وَلَقَدْ فَصَّلْتُ الْغَيْرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْقِدُونِ

যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বললেন, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি তো ইউসুফের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। (ইউসুফ: ৯৪)

আমার মনটা হু হু করে কেঁদে উঠল। পুত্রের প্রতি বৃদ্ধ পিতার ভালোবাসা কতটা গভীর হলে দূর থেকে ঘ্রাণ পাওয়া যায়? এটা ভাবতে না ভাবতেই কচি কণ্ঠে আবার ঝংকৃত হলো,

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِمَّن

اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আর সুসংবাদদাতা এসে সেটাকে (জামা) তাঁর (ইয়াকুবের) চেহায়ায় রাখলে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। (৯৬)

একজন পিতা তার সন্তানকে কতটা ভালোবাসতে পারে? কই আমি তো আমার সন্তানকে এমন করে ভালোবাসি না! আমার প্রিয় এই সূরা আমি প্রায়ই সুযোগ করে পড়ে নিই। আমার এক উস্তাদ আমাকে বলেছিলেন,

-পারলে প্রতিদিন ঘুমের আগে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে ঘুমিও। কুরআন কারীমের সাথে মহব্বত হবে। কুরআন কারীম ইয়াদ থাকবে।

□□□

পটিয়া মাদরাসার পুকুর পাড়ে বসে বসে প্রতিযোগিতায় তিলাওয়াত শুনছি। আসরের আগ মুহূর্তে। সর্বশেষ প্রতিযোগী তিলাওয়াত করছে। চমৎকার তিলাওয়াত। সূরা ইবরাহীমের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْقِدُ هُوَ

কিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত। গা শিউরে উঠার মতো। তবে আমার গা শিউরে উঠে শুধু কিয়ামতের ভয়ে নয়, এই আয়াতে তিনটা শব্দ আছে সেগুলোর যথার্থ অর্থের জন্য।

আয়াতটির প্রথম দুই শব্দ আর শেষ শব্দটির অর্থটা একটু লম্বাই বটে। পুরো অর্থটাকে ধারণ করে, এক কথায় বাংলায় তরজমা করাটা কঠিনই। এমনিতে সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থ করতে গেলে আয়াতটার তরজমা হয়,

হীনতায় মাথা উর্ধ্বমুখী করে ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছোটোছুটি করবে।
তারা তাদের (নিজেদের) প্রতি দৃষ্টি ফেলবে না। আর তাদের অন্তর হবে বিকল (উদাস)।

কিন্তু লুগাতুল কুরআন মেনে তরজমা করলে অনেক লম্বা এক তরজমা হয়ে যায়। তিলাওয়াত যখন চলছিল, আয়াতের প্রথম শব্দটার (مَطْمُوحِينَ) অর্থ বের করার জন্য একটা লুগাতুল কুরআন খুললাম। ‘মাখতুতাতুল জুমাল’, চার খণ্ডের বিশাল এই লুগাত আমার ভালো লাগে। এই লুগাতের পর দেখলাম ‘উমদাতুল হুফাজ’, এটাও চার খণ্ডের বিশাল লুগাতুল কুরআন। দুই অভিধানেই তাহকীক প্রায় কাছাকাছি। তবে দ্বিতীয়টাতে শব্দের আলোচনাটা গভীর। সবশেষে দেখলাম সার্বক্ষণিক সঙ্গী ‘আল মু‘জামুল মাওসুয়ি’। এক অসাধারণ লুগাতুল কুরআন। এই শব্দগুলোর তাহকীক আগেও অসংখ্যবার দেখা হয়েছে, তারপরও কুরআন কারীমের শব্দের তাহকীক দেখাটা যেন আমার কাছে নেশার মতো।



কুরআন কারীম এমন, বুঝে হোক বা না বুঝে, পাশে থাকলেই এক ধরনের অপার্থিব সুখানুভূতি হয়। এ এক অতল সমুদ্র। এক অন্তহীন আকাশ। এক সীমাহীন দিগন্ত।



প্রতিযোগিতায় শেষ দিন মাগরিব পর্যন্ত ছিলাম। মাগরিবের পর বের হচ্ছি। সাথে এক তালিবে ইলম ছিল। নিজ থেকে এগিয়ে এসে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কুরআন কারীম বিষয়ক আলোচনা শুরু হলো। দিনটা বড়ই মনোরমভাবে কেটেছে। পুরো কুরআনময়। সঙ্গী তালিবে ইলম প্রশ্ন করলো, তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন সম্পর্কে হুজুরের মন্তব্য কি?

কেন? তাফসীরটা কি তোমার কাছে পরিচিত?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

জি।

সাইয়েদ কুতুব রহ. এক অসাধারণ মানুষ। তাঁর তাফসীরে হাদীস বিষয়ক কিছু সমস্যা আছে। এসব অসঙ্গতি ধরিয়ে দিয়ে কয়েকটা কিতাব লেখা হয়েছে।

তাকসীরটা যুতলা 'আর সময় বিষয়গুলো জেহেনে থাকলে আর কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে অবাক লাগে, তিনি এতবড় মানুষ, ওনার ঈমানের এত চমক আর দু'টি কিস্তি ওনার দাড়ি নেই! এ বিষয়টা নিয়ে আমি ভেবে কূলকিনারা করতে পারি না। জেলখানায় ওনার যেই অটল আর অনড় ঈমানি অবস্থান ছিল তা দেখে ইখওয়ানের সমস্ত বন্দিরা প্রেরণা লাভ করত। অবশ্য এক শ্রেণীর লোকের বক্তব্য, 'দাড়ির মধ্যে কি ইসলাম আটকে আছে'? আমার এক সাথী টিপ্পনী কেটে বলে, 'দাড়ির মধ্যে ইসলাম ঝুলে না থাকলেও, ইসলামের মধ্যে দাড়ি ঝুলে আছে'।

□

সাইয়েদ কুতুবকে নিয়ে তালিবে ইলমের প্রশ্নে আমি অবাক হলাম। কারণ গত দু'তিন দিন যাবত আমি সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.-এর একটা বই পড়ছিলাম। এক অদ্ভুত সংযোগ। প্রশ্ন করলাম,

তুমি সাইয়েদ কুতুবের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে বলছি' বইটা পড়েছ? চট্টগ্রাম থেকেই তো ছাপা হয়েছে বোধহয়।

জি, পড়েছি।

আমি আরো অবাক! স্বাভাবিক হিসেবে ওর হাতে এই বই পৌছার কথা নয়। ট্যাবে ডাউনলোড করা ছিল। চট্টগ্রাম আসার পথে গাড়িতে বসেও পড়েছি। কী অসাধারণ ঈমানি জোশ আর জযবা!

প্রশ্ন করলাম, আজকে শেষ প্রতিযোগির তিলাওয়াত শুনেছ?

-জি না, শুনিনি।

মুরা ইবরাহীমের শেষদিকে তিলাওয়াত করেছিল। তেতাল্লিশ নাম্বার আয়াতে একটা শব্দ আছে, (مُهْطِعِينَ)। অর্থ জানা আছে?

ও কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,

-(مُهْطِعِينَ)। দ্রুতবেগে ছুটে চলাবস্থায়।

আমি রীতিমতো অবাক! সে উত্তর দিয়েছে বাংলায় নয়, একেবারে চোস্ত আরবি শব্দে। বললাম,

-(مُهْطِعِينَ) আর (مُرَّوِل) দুটোর অর্থের মধ্যেই দ্রুত চলার ভাব আছে। তোমার উত্তর ভুল হয়নি। কিন্তু তুমি এই শব্দ কোথায় পেলে? কোনো তাকসীর থেকে বলেছ?

-জি না, ঠিক কোথায় পড়েছি মনে করতে পারছি না।

-(الخطع) অর্থ, (ভয়ে, লাঞ্ছনায়, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে) ছুটে চলা। আচ্ছা বলো তো, কুরআন কারীমে এমন কোন সূরা আছে, যার শুরুতেও 'আল কুরআন' শব্দটা আছে আমার শেষেও 'আল কুরআন' শব্দটা আছে?

তার উত্তর দিতে দেরি দেখে আমিই বলে দিলাম, 'সূরা ক্বাফে'। আজকের প্রতিযোগিতার শেষ আয়াতে কিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আচ্ছা বলো তো কুরআন কারীমে জাহান্নাম বিষয়ক সবচেয়ে ভয়াবহ আর ব্যাপক অর্থপূর্ণ আয়াত কোনটা?

-মনে আসছে না।

-আচ্ছা, আমিই বলে দিচ্ছি। এখন যে সূরার কথা বললাম সেই সূরা ক্বাফেই আছে।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়েছে? সেটা (জাহান্নাম) বলবে, আরো আছে কি? (কাফ: ৩০)



আমাদের আলোচনা চলছিল সাইয়েদ কুতুবকে নিয়ে। আর এখন কিয়ামতের প্রসঙ্গ এসে যাওয়াতে তাদেরকে প্রশ্ন করলাম?

-সাইয়েদ কুতুবের 'মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন' (আল কুরআনে কিয়ামতের চিত্র) কিতাবটা পড়েছ?

-জি না, পড়ার সুযোগ হয়নি।

-এই কিতাবটা ট্যাবে আছে। ওটাও মাঝেমধ্যে আমি মুতাল্লা'আ করি। অসাধারণ এক কিতাব। একটা ঘটনা আছে, এই মুহূর্তে সেটা পরিষ্কারভাবে মনে নেই, ঘটনাটা মোটামুটি এমন,

একবার মিসরে একজন সাহিত্যিক দাবি করলেন, কুরআন যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে অন্তত একটি আয়াত হলেও বানিয়ে নিয়ে আসতে, এই দাবি অসার। কুরআন কারীমের চেয়েও সুন্দর (?) আরবি ওই সাহিত্যিক নাকি লিখতে সক্ষম। ওলামায়ে কেরাম তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তাকে বললেন, আপনি জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে একটা লেখা তৈরি করে দিন। লেখক অনেক দিন চিন্তাভাবনা করে, খেটেখুটে নাতিদীর্ঘ একটা লেখা পেশ করলেন। সাহিত্যিকের লেখার প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে কেরাম সূরা ক্বাফের আয়াতটা পেশ করলেন।

يَوْمَ نَقُولُ لِهَيْئَةٍ هَلْ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

আরো আছে কি? এই ছোট বাক্যটার মধ্যে যে উদ্ভ্র আর বীভৎস খাই খাই ভাব ফুটে উঠেছে, তা কি হাজার পৃষ্ঠা দিয়েও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব?

□□□□

মাদরাসার মেহমানখানার সামনে যাওয়ার পর, আরেকজন তালিবে ইলম এগিয়ে এল। নতুন করে কথা শুরু হলো,
-এসো কুরআন কারীম নিয়ে কিছু মুযাকারা করা যাক। কুরআন কারীম মানুষের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। কুরআন কারীম নিয়ে থাকলে দুর্ভাগ্যও সৌভাগ্যবানে পরিণত হয়ে যায়। এটা বোঝা যায় আল্লাহ তা'আলার নিজ যবানিতেই। তিনি নবীজিকে বলছেন,

مَا أَرْزَأَكَ الْقُرْآنَ إِشْقَى

আপনি দুর্ভাগ্য হওয়ার জন্য (কষ্ট পাওয়ার জন্য) আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। (ত্বাহ: ২)

কুরআন কারীম সৌভাগ্যের উৎস। কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকলে দুর্ভাগ্য কাঁছে ঘেঁষতে পারবে না।

এই সূরার শেষের দিকে তাকালেও একই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

আর যে আমার জিকির থেকে বিমুখ হবে, তারই জন্য সংকুচিত জীবিকা। (ত্বাহ: ২২৪)

আল্লাহর কিতাব আর আল্লাহর জিকির থেকে দূরে থাকাটাই রিযিকের সংকোচন, দুঃখকষ্টের কারণ।

□

আমরা শাহী গেইটে পৌঁছে গেলাম। বললাম,

-এবার কামরায় গিয়ে মৃতালা'আ করো।

-আরেকটু যাই! ওই যে রেল ক্রসিং পর্যন্ত।

ঠিক আছে চলো। তাহলে আসো, আরেকটা কিছু নিয়ে মুযাকারা করি।

পটিয়া মাদরাসার শাহী গেইট পার হয়ে সামনে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের কথা উঠল বয়ানুল কুরআন নিয়ে। নতুন সাথী হেদায়া (সুওমে) পড়ে।

-তুমি কি নিয়মিত বায়ানুল কুরআন মুতালা'আ করো?

-জি না, মাঝেমধ্যে মুতালা'আ করি।

-থানভী রহ.-এর কুরআনের প্রতি ভালোবাসা কেমন জানার জন্য পড়ে দেখতে পারো, আল্লামা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদি রহ.-এর 'মাআসিরে হাকীমুল উম্মত' কিতাবটা। পটিয়ার কুতুবখানায় আছে। দরিয়াবাদি রহ. খুবই সুন্দরভাবে থানভী রহ.-এর তরজমাতুল কুরআনের প্রতি গভীর অনুরাগকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার জীবনের অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা, এই কিতাব মুতালা'আ করার সৌভাগ্য অর্জন করাটা। আমার হৃজুরকে একবার কথাপ্রসঙ্গে তার প্রিয় একটি কিতাবের নাম জিজ্ঞাসা করায় এই কিতাবের নাম বলেছেন।

ততক্ষণে আমরা রেলক্রসিং চলে এসেছি। আমি বললাম এবার তোমরা ফিরে যাও। ওরা বলল, আরেকটু যাই। আচ্ছা, ঠিক আছে! ডাকবাংলা মোড় পর্যন্ত চলো।

কুরআনি অনুভূতি

মাদরাসায় একটানা কুরআন কারীমের দারস চলছে। ভোর চারটায় শুরু হয়, রাত দশটা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম, নামায, খাওয়া-দাওয়া। কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটালে এক ধরনের অপার্থিব অনুভূতি হয়। অন্যদের অভিজ্ঞতা কেমন জানি না, আমাদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ! সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি, একটানা অন্তত তিনদিন কুরআন কারীম নিয়ে কাটিয়ে দেখুন। শুধু তিলাওয়াত নয়, সাথে সাথে তরজমা-তাফসীর ও তাদাক্বুর ও থাকতে হবে। একশ ভাগ নিশ্চিত, সবার অবশ্যই উপলব্ধি হবে, এই কুরআন সাধারণ কোনো কিতাব নয়।



গেল বছর আমরা, কুরআন কারীমের দরসে বসে কার কেমন অনুভূতি হলো সেটা জানার জন্য একটা আলাদা বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম। সে বৈঠকে অনেকে অনেক অনুভূতি প্রকাশ করেছে। একজনের অনুভূতি ছিল এমন,

-আমরা এক সপ্তাহ কুরআন কারীমের সাথে ছিলাম। কুরআন কারীম এতদিন তিলাওয়াত করেছি। প্রতিদিন তিন পৃষ্ঠা করে তরজমাও দরসে শুনেছি। কিন্তু এ কয়দিনে বারবার একটা হাদীস আমার মনে উকি দিয়েছে।

'ইলম তলব করা অবস্থায় ইত্তিকাল করলে শহীদি মৃত্যু নসীব হয়'।

প্রায় প্রতিটা পৃষ্ঠাতেই জান্নাতের বর্ণনা আছে, প্রথম দিকে তেমন

কিছু মনে হত না। দুদিন যাওয়ার পর থেকেই আমার মনে হতে লাগল,
ইশ, এখন যদি মারা যেতে পারতাম! তাহলে এই জান্নাতের ভাগীদার হতে পারতাম। কারণ হাদীস অনুযায়ী আমি তো শহীদ।
আমি বিস্ময়-বিস্মল হয়ে গেলাম ছেলেটার কথা শুনে। কই, জান্নাতের আয়াতগুলো আমাকে তো এভাবে নাড়া দেয়নি! এমন করে আপুত করেনি! ছেলেটার এমন 'জীবন্ত' তামান্না শুনে সবাই কেমন আবেগতড়িত হয়ে পড়ল।

□

একটানা কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটানোর ফলে ভেতরে যে অনুভূতি জাগে, নিজের ভেতরে যে পরিবর্তনের সদিচ্ছা তৈরি হয় তার আরেকটি প্রমাণ পেয়েছিলাম একজন দুষ্ট তালিবে ইলমের যবানিতে। তালিবে ইলমটি বলল,
-প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই জাহান্নামের বর্ণনা আছে। এমন রোমহর্ষক বর্ণনা পড়ে আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। এখন আমি মারা গেলে এই জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ জান্নাতে যাওয়ার মত আমার কোনো নেক আমল নেই। সবসময় নামাযে অবহেলা করেছি। বাড়ি গিয়ে মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি। সাথীদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। জাহান্নামের ভয়ে আমি আগের তুলনায় নামায-যিকির বাড়িয়ে দিয়েছি। মন্দ অভ্যাসগুলো শোধরাতে শুরু করেছি।

□

আরেক তালিবে ইলমের অনুভূতি খুবই সুন্দর লেগেছে। তার কথা শুনে আমার আকসোস হয়েছে, আমি কেন এভাবে ভাবতে পারিনি? আমার ভেতরেও কেন এমন নিষ্পাপ আকাজ্জা জন্ম নেয় না? সে বলেছিল,

-আমি এতদিন ভালো করে পড়িনি। ফাঁকি দিয়েছি। নানা ছুতোয় বাড়ি চলে গিয়েছি। এজন্য আমার যোগ্যতাও অনেক কম হয়েছে। আমার অনেক সাথী প্রথম বছরেই কুরআন কারীমের অনেক জায়গার অর্থ করতে পারে, অথচ আমি বছরের শুরুতে যে যোগ্যতা হয়েছে, সেখানেই আটকে আছি? গত কয়েক দিন যাবত আমি দরসের ফাঁকে ফাঁকে পেছনের পড়াটাও মুখস্থ করার চেষ্টা করেছি। এখন আলহামদু লিল্লাহ আগের তুলনায় কুরআন কারীমের অর্থ অনেক বেশি বুঝি। অনেক শব্দের অর্থ এখন আমার মুখস্থ। যে কোন জায়গা থেকে পড়লেই পুরোটা না হলেও বেশির ভাগ শব্দের অর্থ বুঝি। আগে ইমাম সাহেব কিরাত পড়ার সময় এমনি অমনোযোগী হয়েই নামাযে

দাঁড়িয়ে থাকতাম। এখন অর্থের দিকে খেয়াল করে দেখি, ওমা! প্রায় পুরো কিরাতের অর্থই বুঝি। এখন নামাযে দাঁড়ালেই আমার খেয়াল চলে যায় কিরাতের অর্থের দিকে। এতে নামাযে আগের তুলনায় আমার অনেক বেশি মনোযোগ এসেছে। নামায পড়তে এখন অনেক ভালো লাগে।



আমাদের মাদরাসায় আমরা কুরআন কারীমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করি। প্রতিটি জামাতে কুরআন কারীমকেই মূল কিতাব হিসেবে ধরি। সাধারণত কুদুরি পড়া একজন তালিবে ইলমকে যদি প্রশ্ন করা হয়,

-কোন কিতাব পড়?

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেয়,

-‘কুদুরি’।

এভাবে উত্তর দেয়া অযৌক্তিক নয়। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের তালিবে ইলমরা যাতে কুরআন কারীমকেই প্রথমে বলে। কী পড়ো প্রশ্ন করলে, প্রথমেই যেন তার মুখ থেকে কুরআন কারীমের কথা বের হয়। আমরা এক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি সফল হইনি। আমরা আশাবাদী, সফল হবো। ইনশাআল্লাহ!



তরজমাতুল কুরআনকে অনেকেই বড় অবহেলা ভরে দেখে। যিনি তরজমাতুল কুরআন পড়ান তিনি মাদরাসার সবচে’ দুর্বল উস্তায বলে গণ্য হন। এমনও দেখেছি, কারো ভাগে কুরআন কারীম পড়ানোর দায়িত্ব এলে মুখ বেজার হয়ে গেছে। কোনো কোনো তালিবে ইলমও কুরআন কারীমের দরসকে ফাঁকি দেয়ার দরস মনে করে। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কিংবা হাম্মামে যাওয়ার দরকার পড়লে, এই দরসেই যায়। আমি হামিলে কুরআন, কুরআন কারীমের বাহক। কিন্তু কিছু কাজ এমন করি যা আমাকে জালিমে কুরআনে পরিণত করে দেয়। কুরআন আমার মাহমূল (বহনের বস্তু) না হয়ে আমার কাছে মাজলুম (অত্যাচারিত বস্তু) হয়ে আছে।

আয়াতচর্চা

পরিচিত কাউকে দেখলেই কুরআন কারীমের কোনো একটা শব্দের অর্থ নিয়ে আলাপ শুরু করে দেয়া বা কুরআন কারীম নিয়ে কোন গল্প বলা বা গল্প শোনার বায়না ধরাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সরাসরি বলে ফেলি হয় আপনি আমাকে

কুরআন কারীম থেকে কিছু শেখান না হয় আসুন, আমরা কুরআন কারীম নিয়ে মুজাকারা করি।

□□□

চমৎকার একটা শিক্ষা পেয়েছি এবার ইজতিমায়। ইজতিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকা বের হয়। একটা পত্রিকায় কাজের অনুমতি পেলাম। রাত দুটোয় পত্রিকা প্রেসে পৌঁছে দিয়ে গল্প করতে বসলাম। গল্পে গল্পে রাত পোহালো। ফজর পড়ে আবার বসলাম। একজন ভাই অন্যরকম এক প্রস্তাব দিলেন।

আতীক ভাই, আসুন আমরা (দিনের শুরুতে) কুরআনের একটা আয়াত নিয়ে সংক্ষিপ্ত মুজাকারা করি। আপনার যে আয়াত ইচ্ছা বেছে নিন।

আমি সূরা ফাতাহর শেষ আয়াতের শুরুর অংশ নিয়ে সামান্য কথা বললাম। সময় তিন মিনিটেরও কম লাগল। কিন্তু পেয়ে গেলাম দারুণ এক চিন্তা। আরে, তাইতো! চট করে একটা আয়াত নিয়ে মুজাকারা আমরা যে কোন অবস্থাতেই করে ফেলতে পারি? সেই শুরু, এরপর থেকে সুযোগ পেলেই, বসে যাই। এ ভরীকায় অনেকের কাছ থেকে ইলম হাসিল করার সৌভাগ্য হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই, যার সাথে আয়াত নিয়ে কথা বলতে গিয়েছি, তার কাছে কিছু না কিছু শিখেছি। অনেক ছোট মানুষের কাছ থেকেই অনেক বড় বড় ইলম অর্জন করেছি। এখনো শিখছি।

সহজ কুরআন

কুরআন কারীম বিষয়টা এমন, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভাবলে বা পড়াশোনা করলে, দিনদিন বিষয়টা খোলাসা হতে শুরু করে। স্পষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু কুরআন কারীমের বিষয়টা বিপরীত। এটা ঠিক, একটা সীমা পর্যন্ত, কুরআন কারীম খুবই সহজ। কুরআন কারীমে আছে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

অবশ্যই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (ফারহান: ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

এই সহজ হওয়ার বিষয়টা যতটুকু মনে হয়, উপদেশ গ্রহণের সীমা পর্যন্তই। এর বেশি কেউ বুঝতে চাইলে, তখনই কুরআনের 'ইজাজ' বা অলৌকিকতার সীমা শুরু হয়ে যায়। এটা কঠিন।

কুরআনপ্রেমিক

বর্তমানে বিশ্বে অনেক বড় বড় কুরআন-গবেষক, কুরআন-প্রেমিক আছেন। তারা কুরআন কারীমের খুবই সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। বেশ মুগ্ধ হয়ে শুনে ইচ্ছে হয় তাদের কথা। শুনিও বটে। কিন্তু একটা বিষয় ঘাটতি মনে হয়। তা হলো, তাদের বক্তব্য শুনে চব্বিশ ঘণ্টার জিন্দেগিকে সুন্নত তরিকায় সাজানোর উৎসাহ জাগে না। যেমনটা একজন বুয়ুর্গের মজলিসে বসলে হয়। আধুনিক কুরআন গবেষকদের বয়ানে অনেক তথ্যাভিজ্ঞতা হয়, জানার পরিধি বাড়ে, কিন্তু মানার সদিচ্ছা কেন যেন ঝলকে ওঠে না। এটা কি আমার একার দুর্বলতা? অনেক তুখোড় কুরআন গবেষককে দেখেছি, তাদের কথা শুনেছি। একটা বিষয় অবাক করার মতো, তাদের অধিকাংশের জীবনেই ইসলাম নেই। ইন্তেবায়ে সুন্নাত নেই। অথচ আমার জানা মতে, তারা চব্বিশ ঘণ্টাই কুরআন নিয়ে থাকেন!



আজ তাফসীরের দরসে বসে বসে মনে হলো,
কুরআন আসলেই হিদায়াতেরও উৎস, ভ্রান্তিরও উৎস। একথা কুরআনেই আছে। দরসে হুজুর বললেন,

-আমাকে কুরআন গবেষক হিসেবে বেশ পরিচিত এক অধ্যাপক বললেন,

-হুজুর, আপনারা তো জন্মদিবস মানেন না!

-জি না।

-কিন্তু কুরআনেই তো জন্মদিবসের কথা আছে। সেদিন শান্তি বর্ষণের কথাও আছে।

-কোথায়?

-সূরা মারয়ামের ৩৩ নম্বর আয়াতে।

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

আর শান্তি বর্ষিত হোক আমার ওপর, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি

এবং মৃত্যুবরণ করবো আর যেদিন পুনর্জীবিত হবো।

এ আয়াতে জন্মদিবসকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুজুর বললেন,

-আমি সাথে সাথে বললাম,

আচ্ছা, অধ্যাপক সাহেব! আপনি কি জানেন মৃত্যুদিবস পালন করাও কুরআনে আছে?

-কই না তো। মৃত্যুদিবস পালন করা তো বিদআত।
-আচ্ছা, আপনি জন্মদিবস বের করলেন এ আয়াত থেকে। তার পরের শব্দেই
যে মৃত্যু দিবসের কথাও আছে, সেটা খেয়াল করলেন না?
-হজুর আপনারা সব সময় বাঁকা পথে হাঁটেন।
-হুঁ, লেজে পা পড়লে বাঁকা পথ না? আপনি জন্মদিবস বের করলেন, কিছু হলো
না। আমি মৃত্যুদিবস বের করাতে বুঝি পথটা বাঁকা হয়ে গেল?
শুনুন অধ্যাপক মশাই! আপনি কুরআন ব্যাখ্যা করার আগে দেখবেন, আপনি যা
বলছেন সেটা রাসুলের সুন্নাহ, সালাফের তাফসীরে আছে কি না। তাদের কারো
সাথে আপনার বক্তব্যটা সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে কি না।

কুরআনি ঘরানা

বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছেন, যারা কুরআন কারীম নিয়েই পড়ে থাকেন।
কুরআন কারীমকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। কুরআন কারীম নিয়ে জীবন-যাপন করতে
সচেষ্ট থাকেন। কুরআন কারীমকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে, রাষ্ট্রীয় আর
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাস্তবায়ন করার জন্য মেহনত করেন।

III

কয়েক দিন আগে, বাংলাদেশে কুরআন কারীম চর্চার চমকপ্রদ একটি ঘরানার
কথা জানতে পারলাম। সেই ঘরানাটা যদিও এখন বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে,
তবুও সেটার ফয়েজ-বরকত আজো বহমান। গিয়েছিলাম মা'হাদু উলুমিল
কুরআনে। ঢাকার মুহাম্মাদপুরে (বর্তমানে আদাবরে, স্থায়ী ক্যাম্পাসে)।
মাওলানা কামরুল ইসলাম মূসা সাহেবের সাথে মোলাকাত করার জন্য।
কুরআন কারীমকে ঘিরেই হজুরের জীবন কাটে। কুরআনী মেহনতের ফিকিরেই
হজুরের দিনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। কিভাবে খালেস একটি
কুরআনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, এ-নিয়ে তার ভাবনার শেষ নেই। অহর্নিশি
কুরআন কারীমের মহব্বতে ডুবে আছেন। মা'হাদু উলুমিল কুরআন প্রতিষ্ঠা
করে, নিজের আজন্ম কুরআনি মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। গড়ে
তুলেছেন কুরআন কারীম বিষয়ক কিতাবাদির বিস্ময়কর এক সংগ্রহশালা।
বাংলাদেশ তো বটেই, পাক-ভারতেও এমন কুরআনি কুতুবখানার নজীর পাওয়া
দুস্কর। তার কাছেই ময়মনসিংহের কুরআনি ঘরানার কথা জানতে পেরেছি।
একসময় সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ইলমুল কিতাবের উচ্চতর মেহনত চলেছে,
তবুও অবাক লাগে। এখন আর আগের সেই জৌলুশ নেই। নেই সেই
কুরআনি মেহনত।

যারা কুরআন কারীমকে ভালোবাসেন, যারা কুরআন কারীম নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে চান, যারা কুরআন কারীম বিষয়ক নানা শিরোণামের কিতাব মুতালা'আ করতে চান, জীবনে অন্তত একবার হলেও মা'হাদু উলুমিল কুরআনে আসা দরকার। হযরত মাওলানার সোহবতে আসা দরকার। ইলম কিতাবের চেয়ে সীনা থেকে বেশি আসে। আর ইলমের চেয়েও বেশি দরকার হল মহব্বত। হযরতের কাছে এলে কুরআনের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।



বাংলাদেশে কুরআন কারীম চর্চার আরো কয়েকটি ঘরানা আছে। তার অন্যতম হল ফেনির জামেয়া মাদানিয়া। এখানে মেহনত চলে ইলম ও আমলের সমন্বয় সাধনের। সালাফের ইলমি আদর্শকে জিন্দা করার মেহনত চলে। জীবনকে ইলমের জন্য সাময়িকভাবে কুরবান করার প্রেরণা দেয়া হয় এখানে। আকাবিরের রেখে যাওয়া ইলমি নিশানকে উঁচিয়ে তোলার হিম্মত যোগানো হয় এখানে। অন্যরকম এক ইলমি মারকায। ইলমচর্চায় বিলুপ্তপ্রায় ধারাগুলোকে নবজীবন দানের চেষ্টারত একটি মাদরাসা। দেওবন্দের উসূলে হাশাতেগানার আদর্শে চলার মেহনতে শামিল একটি মাদরাসা। কুরআন কারীমকে অসম্ভব মমতায় চর্চাকারী একটি পূণ্যভূমি। কুরআন কারীমের 'আল লু'লুউ ওয়াল মারজান'কে উদঘাটনে হরদম মশগুল একটি স্বপ্নীল ভূবন। এই মেহনতগুলো দেখার জন্যই বারবার ছুটে আসি। ভালো লাগে এখানকার কিছু মানুষের ইখলাসপূর্ণ মেহনত। ভালো লাগে এখানকার কয়েকজন মানুষের আখলাক। কুরআন কারীমের তারকীবকে উপলক্ষ্য করে, এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন, স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন। কুরআন কারীমের একটা আয়াতকে কতভাবে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়, বলে বোঝানো অসম্ভব। প্রায় প্রতি বছরই আসার চেষ্টা করি, এখানকার এই মুবারক কুরআনি ইস্তেজামে। আমি এই যোগ্যতম মাদরাসার একজন অযোগ্যতম তালিবে ইলম। তাই মাদরাসার সাথে নাড়ীছেঁড়া সম্পর্ক। বাংলাদেশে কুরআন কারীমকে এভাবে চর্চা করার ধারা শুরু হয়েছিলো আরো আগে। জামেয়া মাদানিয়া প্রতিষ্ঠারও আগে। কক্সবাজারের পোকখালি মাদরাসায়।



জামেয়া মাদানিয়ায় বছরের শুরুতে তারকিব (ترکيبی) মুনাযারার আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর কুরআন কারীমের ছয়পৃষ্ঠা নির্ধারণ করা থাকে। আমরা চেষ্টা করি, এই মহতি মুনাযারায় নাখান্দা শ্রোতা হিশেবে অংশগ্রহণ করতে। দেশের

অভ্যন্তরে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়ার তাওফীক হয়েছে। তাবলীগের সফরে, দাওয়াতি সফরে। সব সফরেরই আলাদা রঙ আছে। সব সফর ছাপিয়ে, এই কুরআনি সফরকে, অন্যরকম এক নূরানি সফর বলে মনে হয়। এই সফর আমার জন্য অন্য রকম এক প্রণোদনা নিয়ে হাজির হয়। এই সফর আমার কাছে ভিন্ন এক দ্যোতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়। এই সফর আমার কাছে মোহনীয় এক আবেদন নিয়ে প্রতিভাত হয়।

III

অন্য বছর ফেনি আসার তোড়জোড় শুরু হয়, অনেক আগে থেকে। কিন্তু এবার মুনাযারার সংবাদ পেয়েছি দুদিন আগে। তাও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মঙ্গলবারে শুরু হবে এই মুনাযারা। ভুলে গুনেছি আগামী মঙ্গলবার। ভুল ভেঙেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, সোমবার সকালে। তখন আমি মারকাযুদ দাওয়াতে অবস্থান করছি। ঢাকার বাইরে। হযরতপুরে। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দাবা.-এর দরবারে। মারকাযের কুতুবখানায় 'সাফওয়াতুল বায়ান' তাফসীরটা একটু নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছাও ছিল। তড়িঘড়ি করে ফিরে এলাম। অনেক কায়দা-কসরত করে, রাত এগারটা চল্লিশের টিকিট পাওয়া গেল। প্রতি বছর তালিবে ইলম-উস্তাদ মিলে দশ-বারো জন হয়। এবার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়াতে নয়জন হয়েছে।

সাধারণত এই ধরনের তড়িঘড়ি দূরযাত্রায়, অনেক বিপত্তি ঘটে। অনাকঙ্খিত বাধা এসে হাজির হয়। তেমন কিছু ঘটল না। একদম যে ঘটেনি তাও না। একদম শেষ মুহূর্তে টিকেট হাতে পাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। যাকে টিকেট সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়েছে তার দেখা নেই। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে টিকেট হাতে পাওয়া গেল। একঘুমে পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের কুরআনি বন্দরে। চারটা দিন কিভাবে কেটে গেল, টেরটিও পাইনি। দিনরাত শুধু কুরআন আর কুরআন।

কাঠসার ও মা'উন

-কুরআন কারীমের সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটা?

-কেন, সূরাতুল কাউসার?

এ-সূরা ছোট হলেও, অনেক কথা লুকিয়ে আছে ছোট তুলতুলে শরীরটাতে। শুধু একটা বলি। সূরাটা নাযিল হয়েছে সূরা 'আল মা'উন'-এর মোকাবেলায়। কুরআন কারীমেও সূরা দু'টির অবস্থান পাশাপাশি।



সূরাতুল মা'উনে মুনাফিকদের চারটা বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে।

এক. মুনাফিকদের কৃপণতা।

দুই. মুনাফিকদের নামাযের প্রতি উদাসিনতা।

তিন. মুনাফিকদের লোক দেখানো নামাযের কথা।

চার. যাকাত অন্য ছোটখাট সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা ও রাখার কথা।



সূরা কাউসারের তুলতুলে আদুরে তিনটা আয়াতে আগের সূরার চারটা বিষয়েরই প্রতিষেধক দেয়া হয়েছে।

এক. আমি আপনাকে কাউসার দিয়েছি। কাউসার মানে প্রচুর, অধিক, অগাধ, প্রভূত। আমার মধ্যে কৃপণতার লেশমাত্র নেই। আপনিও এমন উদার হোন।

দুই. নিয়মিত নামায পড়তে থাকুন।

তিন. আপনার রবের জন্যই পড়বেন কিম্ব, লোকদেখানো (রিয়া)-এর জন্য নয়।

চার. কুরবানী করুন। নিজে তো খাবেনই, গোশতের নির্দিষ্ট একটা অংশ অন্যকেও দান করতে ভুলে যাবেন না যেন!

দারিদ্র বিমোচন

আমরা যারা গরীব, তারা আয়ের কোনো সুযোগ দেখলেই, চোখ বড় বড় ঝাঁপিয়ে পড়ি। খুঁজতে থাকি বড়লোক হওয়ার সহজ-সংক্ষিপ্ত কোনো উপায়। শেয়ার বাজারে বাঙালির হুমড়ি খেয়ে পড়া এটাই প্রমাণ করে।



বড়লোক হওয়ার জন্য কত দু'আ-দরুদ, পানিপড়া নিই তার ইয়ত্তা নেই। বড়লোক হতেই হবে, এটা কোনো অমোঘ বিধান নয়, তবে জীবিকার প্রাচুর্য না হলেও অন্তত আর্থিক সংকট না থাকা নিশ্চয়ই আল্লাহর নেয়ামত! দেখি তো কুরআন কারীমে কোনো সংক্ষিপ্ত পথ পাওয়া যায় কি না!

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.

সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে, এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় মনে-প্রাণে

স্বীকার করে নিয়েছে, আমি তার আরামপূর্ণ গন্তব্যে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেবো। (সূরা তুল লাইল: ৫-৭)

□

-তাহলে দান করলে আর তাকওয়া অবলম্বন করলেই হবে?

-জি হবে।

-আমার কাছে টাকা নেই বলেই তো স্বচ্ছলতা চাচ্ছি? টাকা না থাকলে দান করব কোথেকে?

-পকেটে কত আছে?

-মাত্র দশ টাকা।

-ওটাই দিয়ে দাও!

-তারপর?

-আয়াত পড়োনি? তাকওয়া অবলম্বন করো!

-কিভাবে?

-আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, নিজের কাজ আপন মনে করে যাও।

-আমার দশ টাকার কী হবে?

-সম্পদের প্রতি এত লোভ থাকলে, কুরআনি পদ্ধতিতে অভাবমুক্ত হওয়া কঠিন। তবে পকেটের সব টাকা দান করতে হবে এমন নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাধ্যমত সাদাকা করলেই হবে। ধনী হওয়া নয়, অভাবমুক্ত হওয়াই মুখ্য।

ওয়ালিদাইন

পড়িলাম 'কুরআন কা রাস্তা' কিতাবটা। লেখক বইটা উৎসর্গ করেছেন তার মাকে। শুরুতে একটা আয়াত উল্লেখ করেছেন,

وَوَضَّيْنَا لِلنَّاسِ إِلَىٰ آبَائِهِم مَّا

তুমি আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি 'শোকরওয়ার' থাকো! (লুকমান: ১৪)

লেখকের আয়াত বাছাই ঠিক আছে। আয়াতে মাতাপিতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়ালিদাইন' শব্দটা। কুরআন কারীমে দুইটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে,

ক. ওয়ালিদাইন (الوالدين)।

খ. আবাবুয়াইন (الأبوين)।

দুটোর অর্থই মা-বাবা, পিতামাতা।

তবে আমার মনে হয়, 'আবাওয়াইন' শব্দের অর্থ করা দরকার, 'পিতামাতা'। আর 'ওয়ালিদাইন' শব্দের অর্থ করা দরকার 'মাতাপিতা'।

-কারণ?

-আবুন (أَبُو) অর্থ, পিতা। সেজন্য আবাওয়াইনে পিতার প্রাবল্য থাকবে।

ওয়ালিদাইন শব্দটা নির্গত হয়েছে: 'বিলাদাত' (بِلَادَاتُ) ধাতুমূল থেকে। অর্থ জন্ম দেয়া। জন্ম দেয়ার বেলায় কার ভূমিকা প্রবল? অবশ্যই মায়ের।

□□□□

❧ দৃষ্টিপাত

এক. আবাওয়াইন। পিতামাতা। কুরআন কারীমের যেখানে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ পিতামাতা উভয়ে হলেও, আয়াতের অর্থ ও আগে পরের আলোচনার প্রসঙ্গে পিতার ভাবটা সেখানে প্রবল থাকবে।

দুই. ওয়ালিদাইন। মাতাপিতা। এ-শব্দে মাতার ভূমিকাটা থাকবে প্রবল। যেসব আয়াতে ওয়ালিদাইন শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে একটু চিন্তা করলেই বেরিয়ে আসবে, আয়াতের আলোচ্য প্রসঙ্গে মায়ের ভূমিকা বা উপস্থিতি প্রবল। তবে একথা বোঝা যাবে না, ওয়ালিদাইন মানে শুধু মাতা। আবাওয়াইন মানে শুধু পিতা। ভূমিকার প্রাধান্য থাকার দু'টি উদাহরণ দিলেই বিষয়টা খোলাসা-সড়গড় হবে আশা করি।

□

❧ প্রথম উদাহরণ

ওয়ালিদাইন

মা-বাবার প্রতি সদাচার করার দিকনির্দেশনা সম্বলিত আয়াতগুলোতে, ওয়ালিদাইন শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ মায়ের প্রতিই বেশি সদাচার দেখাতে হয়। হাদীসেও এর প্রতি জোর তাকিদ এসেছে।

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। (আহকাফ: ১৫)

وَقَفَّيْكَ إِلَّا تَعْبُدُ إِلَّا لِلَّهِ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করো। (ইসরা: ২৩)

জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি। তাই তার সম্মানও বেশি। তার প্রতি সদাচারও বেশি। তাকেই আগে রাখতে হবে।



৩ দ্বিতীয় উদাহরণ

আবাওয়াইন

কুরআন কারীমে সম্পদ, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়গুলোতে 'আবাওয়াইন' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে।

وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ وَمَعَارِكُ

মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। (নিসা: ১১)

وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ

সে তার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসালো। (ইউসুফ: ১০০)

প্রথম আয়াতে মিরাসের কথা বলা হয়েছে। সন্তান মারা গেলে মা-বাবা দু'জনেই সম্পদ পাবেন। কিন্তু সম্পদ ব্যয়-ব্যবস্থাপনা সাধারণত পিতাই করে থাকেন। আর মায়ের সম্পদটা জমাই থেকে যায়। তদুপরি ধন-সম্পদের ব্যাপারটা বাবার সাথেই বেশি মানানসই। তাই বাবাঘেঁষা 'আবাওয়াইন' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে, ইউসুফ আ. পিতামাতাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। দু'জনকেই। এ-কাজে বাবাই বেশি উপযুক্ত। মা তো ঘরে থাকবেন। এদিক বিবেচনা করেই বোধ হয় 'আবাওয়াইন' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে।



বিষয়টা জানা থাকলে, কুরআন কারীমের অনেক জায়গা নিয়ে ভাবতে সুবিধে হবে। তরজমার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি থাকবে বলেই বিশ্বাস।

আল কাহফ

মূলবিষয়: ফিতনা থেকে সুরক্ষা।

প্রথম ভাগ: আল্লাহর প্রশংসা। সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ। ১-৮।

দ্বিতীয় ভাগ: আসহাবে কাহফের ঘটনা। ৯-২৭।

তৃতীয় ভাগ: রাসূলকে সবরের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ। ২৮-৩১।

চতুর্থ ভাগ: দুই বাগিচা-মালিকের ঘটনা। ৩২-৪৪।

- পঞ্চম ভাগ: প্রকৃত স্থায়ী মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা । ৪৫-৪৬ ।
 ষষ্ঠ ভাগ: কিয়ামত দিবসের ভীতিপ্রদ দৃশ্যের চিত্রায়ন । ৪৭-৪৯ ।
 সপ্তম ভাগ: জালিমদের ধ্বংসে আল্লাহর কর্মপন্থা । ৫০-৫৯ ।
 অষ্টম ভাগ: মূসা ও খিযিরের গল্প । ৬০-৮২ ।
 নবম ভাগ: যুল কারনাইনের গল্প । ৮৩-৯৯ ।
 দশম ভাগ: সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ ওহীর সাব্যস্তকরণ । ১০০-১১০ ।

□□□□

সূরা কাহফে আছে:

- ক) চারটা গল্প ।
 খ) চারটা ফিতনা (পরীক্ষা) ।
 গ) চারটা মুক্তির ফর্মূলা ।

□□□□

প্রথম গল্প ও ফিতনা: আসহাবে কাহফ । সত্য দ্বীন গ্রহণের ফিতনা (পরীক্ষা) ।
 একদল মুমিন যুবক । কাফির রাষ্ট্রে বাস করত । নিজের ধর্ম রক্ষার্থে দেশ ছেড়ে
 আজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল । আশ্রয় নিলো পাহাড়ের গুহায় । দীর্ঘকাল
 ঘুমিয়ে কাটাল । জেগে দেখল, পুরো জনপদ মুসলমান হয়ে গেছে ।
 মুক্তির প্রথম ফর্মূলা: সৎসঙ্গ । মানুষ তো বটেই সৎসঙ্গের কারণে কুকুর পর্যন্ত
 সম্মানিত হয়েছে । ২৮ নং আয়াত ।

□

দ্বিতীয় গল্প ও ফিতনা: দুই বাগিচার মালিক । সন্তান ও সম্পদের ফিতনা ।
 আল্লাহ এক লোককে নেয়ামত দান করলেন । অকৃতজ্ঞ লোকটা আল্লাহকে ভুলে
 গেল । অহংকার করল । সন্দেহ করল । তার বন্ধু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার
 পরও সতর্ক হলো না । ফলে তার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল ।
 মুক্তির দ্বিতীয় ফর্মূলা: দুনিয়ার হাকীকত জানা । ৪৫ নং আয়াত ।

□

তৃতীয় গল্প ও ফিতনা: মূসা ও খিযির আ.-এর গল্প । ইলমের ফিতনা ।
 মূসাকে প্রশ্ন করা হলো,
 -কে বেশি জ্ঞানী?
 -আমি ।

তখন আল্লাহ বললেন, আরেকজন আছেন তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী । তার
 কাছে যাও । শেখ । কখনো আল্লাহর হিকমত দৃষ্টির আড়ালে থাকে । দুটি
 উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে, নৌযান ও বালক ।
 মুক্তির তৃতীয় ফর্মূলা: বিনয় । ৬৯ নং আয়াত ।



চতুর্থ গল্প ও ফিতনা: যুলকারনাইনের গল্প। ক্ষমতার ফিতনা।
এক মহান সম্রাটের গল্প। একাধারে ইলম ও শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বিশ্ব
চষে বেড়িয়েছেন। সুবিচার দিয়েছেন। প্রাচীর নির্মাণ করে ইয়াজুজ-মাজুজকে
প্রতিহত করেছেন।
মুক্তির চতুর্থ ফর্মুলা: ইখলাস। কর্মনিষ্ঠা। ১১০ নং আয়াত।



কিছু কথা

এক. সূরার মাঝামাঝিতে দেখা গেছে, ইবলিসই হলো ফিতনার সঞ্চালক
(তোমরা কি তাকে ও তার বংশধরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ, আমাকে ছাড়া,
অথচ তারা তোমাদের শত্রু! জালিমদের জন্য এটা কত নিকৃষ্ট বিনিময়। (৫০)
এ দুই. দাজ্জালের সাথে সূরা কাহফের ও দাজ্জালের সাথে মাসীহের কী
সম্পর্ক?

-কিয়ামতের আগে দাজ্জাল চারটা ফিতনা নিয়ে অবির্ভূত হবে।

(ক) সে মানুষকে তার ইবাদত করতে বলবে। আল্লাহকে ছেড়ে দাও।

দ্বীনের ফিতনা।

(খ) দাজ্জাল আকাশকে আদেশ করবে বৃষ্টি বর্ষণ করতে। মানুষকে সম্পদ দিয়ে
ফিতনায় ফেলবে।

মালের ফিতনা।

(গ) মানুষকে সে অনেক অজানা তথ্য জানিয়ে মুগ্ধ করতে চাইবে।

ইলমের ফিতনা।

(ঘ) বিশাল ভূখণ্ডের ওপর সে আধিপত্য বিস্তার করবে।

ক্ষমতার ফিতনা।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্পষ্ট করতে হলে, পুরো সূরা কাহফ অন্তত একবার
হলেও পড়ে নিতে হবে।

মুসলিহ/সালিহ

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

আর আপনার রব জুলুম করে, জনপদসমূহকে ধ্বংসকারী নন,
সেখানকার অধিবাসীরা সংশোধনকারী হওয়া সত্ত্বেও। (হুদ: ১১৭)



এক. মুসলিহ অর্থ সংশোধনকারী। সালিহ অর্থ সৎ বা সৎকর্মশীল।
 দুই. কোনো গ্রামে বা দেশে, সংস্কারক, সংশোধনকারী থাকলে, সে গ্রাম আল্লাহ
 তা'আলা ধ্বংস করবেন না।
 তিন. তাহলে 'সালিহ' (সৎকর্মশীল) থাকলে কিম্ব হবে না। মুসলিহ থাকতে
 হবে।
 চার. একা একা ভালো হলে, বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না। নিজে ভালো হওয়ার
 পাশাপাশি অন্যকেও ভালো করার চেষ্টায় লেগে থাকতে হবে।



একটা বাংলা তরজমায় লিখেছে,

সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।

মুসলিহ অর্থ কিভাবে সৎকর্মশীল হয়?

আরও মজার ব্যাপার হলো, তারা বাঙলার পাশাপাশি ইংরেজি তরজমাটাও দিয়ে
 দিয়েছে। ইংরেজিতে ঠিকটাই লেখা আছে।

If it's members were likely to mend.

যদি তার সদস্যরা সংশোধনে আগ্রহী হয়।

কুরআন কারীম নিয়ে কাজ করার সময় আমার আরও সতর্ক হওয়া কাম্য। যে
 বিষয়ে আমার যোগ্যতা নেই, সেটা নিয়ে কথা বলার আগে, দশবার ভেবে নেয়া
 উচিত।

লক্ষ্য ও দৌড়

১: রিযিক তলবের জন্য রাব্বের কারীম আমাদেরকে বলেছেন,

ফামশ [فَمُشُوا] তোমরা হাঁটো! (মূলক: ১৫)

২: নামাযের সময় হলে বলেছেন,

ফাস'আও [فَاسْعُوا] তোমরা দৌড়াও! (জুয়ু'আ: ৯)

৩: জান্নাতের ক্ষেত্রে বলেছেন,

সারি'উ [سَارِعُوا] তোমরা ধাবিত হও/ প্রতিযোগিতা করো! (আলে ইমরান: ১৩৩)

৪: আল্লাহর কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন,

তোমরা আল্লাহর দিকে পড়িমরি করে [فِرُّوا إِلَى اللَّهِ] পালিয়ে আসো! / আশ্রয় নাও।
 (যারিয়াত: ৫০)



লক্ষ্য হিশেবেই তৎপরতার গতি-প্রকৃতি নির্ভর করবে। লক্ষ্য যত বড়, চলার
 গতিও তত বেশি।

চার ওয়াদা

আল্লাহ তা'আলার চারটা ওয়াদা দেখি,

৩ প্রথম ওয়াদা

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

যদি শুকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেবোই! (ইবরাহীম: ৭)

৩ দ্বিতীয় ওয়াদা

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো! (বাকারা: ১৫২)

৩ তৃতীয় ওয়াদা

أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُجِيبَ لَكُمْ

আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবো! (মুমিন: ৬০)

৩ চতুর্থ ওয়াদা

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন এমন নন যদি তারা ইস্তেগফার করে!
(আনফাল: ৩৩)

কুরআনি ইনসারফ

কুরআন কারীম কোনো কিছু সম্পর্কে বলার সময় পূর্ণ ইনসারফ বজায় রাখে। এমনকি ক্ষতিকর বিষয়েও। সাধারণ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে মদ সম্পর্কে শুধু খারাপ দিকটাই আলোচনা করার কথা। কিন্তু কুরআন মদের দোষই শুধু বলেনি। বলেছে,

فِيهَا إِثْرٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

তাতে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য কিছু উপকার। (সূরা বাকারা: ২১৯)

পরেই বলে দিয়েছে,

وَالْإِثْمُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا

সেটার উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি।

আমরা কেন যেন প্রশংসা বা নিন্দা উভয় ক্ষেত্রেই অনেক সময় লাগামছাড়া হয়ে যাই। কুরআন কারীমে কেন আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে না?

তিন তিন

কুরআন কারীমে তিনটা বিষয় (আমল)-কে অপর তিনটা তিনটা বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। একটাকে বাদ দিলে আরেকটাকে আল্লাহ কবুল করবেন না।

☞ এক.

ক) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো [أَطِيعُوا اللَّهَ]।

পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে,

খ) তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো [أَطِيعُوا الرَّسُولَ]।

যে আল্লাহর আনুগত্য করল, রাসূলের আনুগত্য করল না, তার প্রথম আমলটা কবুল হবে না। ক্ষেত্রবিশেষে তো ঈমানই থাকবে না। কুরআন কারীমের প্রায় এগার জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে।

III

☞ দুই.

ক) তোমরা নামায কায়েম করো [أَقِمُوا الصَّلَاةَ]।

পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে,

খ) তোমরা যাকাত আদায় করো [آتُوا الزَّكَاةَ]।

নামায পড়ল কিন্তু যাকাত আদায় করলো না, প্রথমটা কবুল করা হবে না। কুরআন কারীমে আটটি স্থানে এভাবে বলা হয়েছে।

III

☞ তিন.

ক) আমার শুকরিয়া আদায় করো [أَنِبِّ الشُّكْرَ]।

পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে:

খ) তোমার মাতাপিতার শুকরিয়া আদায় করো [وَالْوَالِدَيْنِ]।

প্রথমটা মানা হলো; দ্বিতীয়টা মানা হলো না, প্রথমটা কবুল না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

-ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে কিতাবুল কাবায়ের

আমাদের আল্লাহভীতি

বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা
ফাতির: ২৮)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

□

তার মানে কি যারা আলিম নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করে না? আলিম,
কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহভীতির লেশমাত্রও দেখা যায়, এমন মানুষও তো বিরল
নয়! আমাদের প্রচলিত পরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতকে বুঝতে গেলে সমস্যা
হবে। আসলে আয়াতের সারার্থটা হবে এমন,

“যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারাই আলিম।”

ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

বেশি রেওয়ায়েত করলেই আলিম হয়ে যায় না। ইলম হলো ‘আল্লাহর ভয়’।
যে আলিম আল্লাহভীরু নন, তিনি আলিম পদবাচ্যের অধিকারীও নন। সুতরাং
ইলমের পাশাপাশি ‘খাশইয়াহ’ (আল্লাহভীতি)-ও থাকা চাই।

কুরআনি ক্ষমা

কুরআন কারীমে ক্ষমা বা ছাড় দেয়ার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সাতটা
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

الْعَفْوُ - الْعَفْوَ - الْغَفْلَةُ - التَّجَاوُزُ الْكَفِيرُ الْخَطْلُ

আমরা এখন শুধু দুইটা শব্দের অর্থগত পার্থক্যের কথা আলোচনা করবো।

☞ (এক) ‘আফউন’ [عَفُو] ক্ষমা করা। মূল অর্থ হলো, বিদূরিত করা। মুছে
যাওয়া। মুছে দেয়া।

☞ (দুই) ‘গাফারা’ [غَفَرَ] ক্ষমা করা। মূল অর্থ হলো, আবৃত করা। ঢেকে
দেয়া।

তাহলে ‘গাফারা’ অর্থ দাঁড়াবে, গুনাহটা আমলনামায় লেখা থাকবে।
কিন্তু আল্লাহ ক্ষমার চাদর দিয়ে সেটাকে ঢেকে দিবেন। শাস্তি দিবেন না।

‘আফউন’ অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ গুনাহকে আমলনামা থেকেই মুছে দিবেন।
শাস্তিও মাফ করে দিবেন। আমি যেন গুনাহই করিনি।

□

আফউন শব্দটা কুরআন কারীমে পাঁচবার এসেছে। একবার 'কাদীর' শব্দের সাথে। আল্লাহ তা'আলার একটা নাম আছে 'আফুউউন'। তিনটা ভাব লুকিয়ে আছে নামটার মধ্যে।

ক) গুনাহ মুছে দিবেন।

খ) সম্ভুষ্ট হবেন।

গ) দান করবেন।



তবে কথা হলো, এসব পার্থক্য মানুষের চিন্তাপ্রসূত। নিরংকুশ নয়। না হলে ব্যতিক্রমও আছে।

ক) সূরা ফাতহ-এর দ্বিতীয় আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে 'গাফার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তিনি মা'সুম।

খ) সূরা তাওবার ৪৩ নং আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে 'আফা' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তার কোনো গুনাহই নেই।

যিন্দা কুরআন

মুরীদ: শায়খ, আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-কে কত বড় একটা মু'জিযা দিয়েছেন।

শায়খ: কী সেটা?

-হাতের লাঠি। লাঠি দিয়ে তিনি গাছের পাতা পাড়তেন। পানির প্রয়োজন হলে আঘাত করে পানি বের করতেন। বনী ইসরাঈলের নানা প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করতেন। এমনকি ফির'আওনের বিরুদ্ধে চরম মুহূর্তে লোহিত সাগরকেও লাঠির আঘাতে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

-বৎস, আল্লাহ তা'আলা তো লাঠিটা শুধু মূসা আ.-কেই ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আর কারো সেটা ব্যবহার করার যোগ্যতা বা অধিকার কোনোটাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেকের জন্যই, মূসা আ.-এর লাঠির চেয়েও হাজারগুণ শক্তিশালী বস্তু দিয়েছেন।

-শায়খ, কী সেটা?

-আরে বেটা, এখনো বুঝতে পারলে না সেটা কী? সেটা হলো কুরআন কারীম। মূসা আ.-এর লাঠি মূসার ইন্তেকালের সাথে সাথেই কার্যকারিতা হারিয়েছে। কিন্তু কুরআন? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যেমন কার্যকর ছিল আজো ঠিক সেরকম কার্যকর, কর্মক্ষম এবং জীবন্ত রয়ে গেছে।

দুনিয়ার চিত্র

কতবার পড়েছি আয়াতটা! কিন্তু আজকের মতো আগে কেন মনে দাগ কাটলো না! রাসুল কারীম কতো সংক্ষেপে, কী অসাধারণ উপমায় দুনিয়ার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত। সূরা কাহফেই আছে,

وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ كُشْبًا مَذْرُوءًا وَالرِّيحُ وَغَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন।

ক) পার্থিব জীবন হলো পানির মত।

খ) পানি আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি।

গ) ভূমিজ লতাপাতা সে পানির সংস্পর্শে আসে। সতেজ হয়ে ওঠে।

ঘ) এক সময় সে লতাপাতা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে।

ঙ) তারপর তা বাতাসে উড়ে যায়।

-সূরা কাহফ, ৪৫তম আয়াতের ভাব

তিনটি প্রশ্ন

১ প্রথম প্রশ্ন: সালেহ আ.-এর উটনি হত্যা করেছিল কয়জন মিলে?

-একজন।

فَتَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ

তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, সে (সঙ্গী উটনিটি) ধরল ও বধ করল।

(ক্বামার: ২৯)

II

২ দ্বিতীয় প্রশ্ন: সালেহ আ.-এর কওমের মধ্যে কয়জন দূরভিসন্ধি ও উদ্ধানি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে অংশ নিয়েছিল?

-নয়জন।

وَكُنَّا فِي الْعَدِيَّةِ نَسْعَةً وَهَطًا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْلِحُونَ

শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াত।

সংশোধন করত না। (নামল: ৪৮)

III

৩ তৃতীয় প্রশ্ন: সামূদ জাতি (কওমে সালেহ)-এর কয়জনের ওপর আযাব এসেছিল?

-সবার ওপরে।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা যার যার বাড়িতে (মৃত অবস্থায়) উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (আরাফ: ৭৮)

□□□

তাহলে আযাব কাদের ওপর এল?

ক) উটনি হত্যাকারীর ওপর।

খ) উস্কানিদাতার ওপর।

গ) পরিকল্পনাকারীর ওপর।

ঘ) এসব নৈরাজ্য দেখে আনন্দে হাততালি দাতার ওপর।

ঙ) জুলুম-অনিয়মের প্রতি সন্তুষ্টদের ওপর।

চ) এত অবিচার দেখেও চুপ থাকা ব্যক্তিদের ওপর।

□

কেউ বাঁচতে পারেনি। সুতরাং আমাদেরও সতর্ক হওয়ার অবকাশ আছে।
দ্রষ্টব্য: বিবাড়িয়া। সিরিয়া। ইরাক। ফিলিস্তিন। শাপলা। পুরো মুসলিম জাহান।

সমৃদ্ধ আরবী ভাষা

কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

لَا جَعَلْنَاهُ فُرَاتًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কুরআন আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (যুখরুফ: ৩)

□

☞ এক পরিসংখ্যান মতে আরবি ভাষার সর্মমোট শব্দসংখ্যা:

১২,৩০২,৯১২।

☞ ইংরেজি ভাষায় শব্দসংখ্যা:

৬০০,০০০।

ফরাসি ভাষায় শব্দসংখ্যা:

১৩০,০০০।

= কী আকাশ-পাতাল তফাৎ! কুরআন কারীম এমন সমৃদ্ধ ভাষায় নাখিল না হয়ে আর কোন ভাষায় নাখিল হবে?

হায়ী কো?

ফির'আওন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

নিশ্চয় ফির'আওন ও হামান এবং তাদের সেনাবাহিনী ছিল পাপী (অপরাধী)। (ক্বাসাস: ৮)

□

আল্লাহ তা'আলা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানকেই দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষান্ত হননি। পাশাপাশি সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনী সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে বর্তমানে? ভেবে দেখার বিষয়।

শহর ও গ্রাম

কুরআন কারীমে গ্রাম বা জনপদ বোঝানোর জন্য 'আল কারইয়াত্' [القرية] শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। আর শহর বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'আল মাদীনাত্' [البلدة] শব্দটা।

□□□□

একই আয়াতে, একই স্থানকে কখনো কখনো কারইয়া ও মাদীনা বলা হয়েছে। তাহলে দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) অধিবাসীদের সবাই এক পেশা বা এক চিন্তার অনুসারী হলে, কুরআন সে স্থানকে 'কারইয়া' বলে আখ্যায়িত করেছে।

(খ) অধিবাসীদের চিন্তায় বা ধর্মে কিংবা পেশায় বিভিন্নতা থাকলে, কুরআন সে জায়গাকে 'মাদীনা' বলে উল্লেখ করেছে।

একটু উদাহরণ দিয়ে খোলাসা করলে পরিষ্কার হবে।

□

(এক) মূসা আর খিযির আ. 'কারইয়া'বাসীর কাছে খাবার চাইলেন, তারা খাবার দিতে অস্বীকার করলো।

فَتَطَّلَعْنِي إِذَا أَنَا أَهْلُ قَرْيَةٍ أَشْغَلَتْهُنَّ أَهْلُهَا

অতঃপর তারা চলতে থাকল। চলতে চলতে যখন এক জনপদবাসীর কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কাছে খাবার চাইল।

এটা গেল সূরা কাহফের ৭৭ নম্বর আয়াতের কথা। ঠিক একই এলাকার কথা বলতে গিয়ে ৮২ নম্বর আয়াতে বলা হলো, দেয়ালটি 'মাদীনা' (শহর)-এর দুই এতিম বালকের! আশ্চর্যজনকভাবে শব্দ বদলে গেল।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

বাকি থাকল প্রাচীরটি। তো এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতিমের।

□

(দুই) সূরা ইয়াসীনের তেরো নম্বর আয়াতে বলা হলো,

وَأُصْرِبَ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

আপনি তাদেরকে কারইয়াবাসীর দৃষ্টান্ত পেশ করুন। যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিলেন।

আবার বিশ নাম্বার আয়াতে গিয়ে, একই মানুষজনের কথা বলতে গিয়ে বলা হলো,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

মাদীনা (শহর)-এর দূরতম প্রান্ত থেকে এক লোক দৌড়ে এল।

□□□

দারুন অবাক করা ব্যাপার। আমরা প্রথমে যে নিয়ম বলেছিলাম তার আলোকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়,

১. সূরা কাহফে, খাবার চাওয়ার সময় এলাকার সমস্ত লোক কৃপণতা করেছিল। একজনও খাবার দিতে সম্মত হয়নি। সবার মধ্যেই কার্পণ্য পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ 'কারইয়া' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখন দুই এতিমের কথা শুরু হলো, শব্দও বদলে গেল। 'মাদীনা' হয়ে গেল। কারণ শহরের সবাই তো এতীম নয়।
২. সূরা ইয়াসীনের তেরো নম্বর আয়াতে যাদের দৃষ্টান্ত পেশ করার কথা বলা হলো, তারা সবাই কাফির ছিল। কিন্তু একজন মুমিন যখন রাসূলগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন, তখন শব্দ বদলে 'মাদীনা' হয়ে গেল। কারণ তখন শহরে শুধু কাফিরই নয়, মুমিনও আছে।
৩. কুরআন কারীমে ইয়াসরিবকেও 'মাদীনা' বলা হয়েছে। কারণ এখানে মুমিন ও মুনাফিক উভয় শ্রেণীর মানুষ বাস করত। তার মানে দাঁড়াল, কুরআন কারীম যখন এক চিন্তা বা এক পেশা বা এক গুণের মানুষের কথা বলে, তখন 'কারইয়া' বলে। এর ব্যতিক্রম হলেই 'মাদীনা'।

এজন্য দেখা যাবে, কুরআন কারীমে যত জনপদের ওপর গজব নাযিল হয়েছে, সবই ছিল কারইয়া। মাদীনা নয়। কোনো কারইয়া যখন পুরোটাই কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই গজব এসেছে। মদীনায় তো সব মানুষ এক রকম নয়। মুমিন কাফির উভয়েই আছে।

কুরআন

কুরআন [قرآن] শব্দটা কুরআন কারীমে তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক) আলিফ লাম ال-যুক্ত অবস্থায়। القرآن

খ) আলিফ লাম ال-যুক্ত অবস্থায়। قرآن

গ) ইযাফত বা অন্য শব্দের দিকে অশ্বয় হওয়া অবস্থায়।

قرآن الفجر فرقہ

II

প্রথম দুই অবস্থায় অর্থ হলো মূল কুরআন কারীম।

আর তৃতীয় অবস্থায় 'কুরআন' অর্থ হবে, পাঠ বা তিলাওয়াত।

'কুরআন' শব্দটা পুরো কিতাবে মাত্র দুইবার 'ইযাফত' বা 'মুযাফ' হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তৃতীয় পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

III

(এক) প্রথম ইযাফত:

أَقْرِضْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের আঁধার পর্যন্ত। এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান হোন। স্মরণ রাখবেন, নিশ্চয় ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ (ফিরিশতারাও শোনে)। (ইসরা: ৭৮)

(দুই) দ্বিতীয় ইযাফত:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ
কুরআনের সংরক্ষণ ও তার পাঠ আমারই দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন পাঠ করি, আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। (কিয়ামাহ: ১৭-১৮)

অবতরণের ধারাদ্রুম

কুরআন কারীমে প্রথম প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটা সূরা হলো,
 এক. সূরা তুল 'আলাকের প্রথম কয়েক আয়াত ।
 দুই. সূরা তুল কালামের প্রথম কয়েক আয়াত ।
 তিন. সূরা তুল মুযাশমিলের প্রথম কয়েক আয়াত ।
 চার. সূরা তুল মুদাসসিরের প্রথম কয়েক আয়াত ।
 পাঁচ. সূরা ফাতিহা । এই সূরাই সর্বপ্রথম পুরোটা একসাথে নাযিল হয়েছে ।



বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কুরআন কারীমের সূরাগুলো নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা থেকে চমৎকার একটা হিকমত বের করেছেন:
 প্রথমত: সূরা আলাকে 'পাঠের' কথা বলা হয়েছে ।
 দ্বিতীয়ত: সূরা কালামে লেখার কথা বলা হয়েছে ।
 তৃতীয়ত: সূরা মুযাশমিলে কিয়ামুল-লাইল বা তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে ।
 চতুর্থত: সূরা মুদাসসিরে দাওয়াত ও তাবলীগের আদেশ করা হয়েছে ।
 = তারমানে অর্থটা দাঁড়ালো,
 হে লোকসকল, পড়ো! তারপর লেখো! । তারপর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ আদায় করো! তারপর দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে বের হয়ে পড়ো!
 সুতরাং দাঁড় হতে গেলে লেখাপড়া জানা জরুরি । তাহাজ্জুদ জরুরি ।

বৃহৎ শব্দ

কুরআন কারীমের একটা শব্দ

أَنزِمُكُمْوَمَا

একটা শব্দের অর্থ করতে ইংরেজিতে ব্যয় হয়েছে সাতটা শব্দ,

"Shall we compell you to accept it"

বাঙলা করলে দাঁড়ায়, আমি তোমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে বাধ্য করব!

অবশ্য এটাও ঠিক, কুরআনি শব্দটা একসাথে লিখলেও, এখানে আছে 'পাঁচটা' শব্দ! আর হ্যাঁ, এটা কুরআনের সর্ববৃহৎ শব্দও বটে!

আবদ

সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে 'আবদ' শব্দটা তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে । তিনবার তিনজনের ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন তিন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে ।

৩ (এক) প্রথমবার ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি তার বান্দা (মুহাম্মাদ)-কে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন। (ইসরা: ১)

□

৩ (দুই) দ্বিতীয় আয়াতে 'আবদ' শব্দটা নূহ আ.-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৩)

□

৩ (তিন) পঞ্চম আয়াতে মুজাহিদদের বৈশিষ্ট্য হিশেবে 'আবদ' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا الْأُولَىٰ بِأَسْوَاقٍ خِلَالِ الدِّيَارِ

অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে পাঠালাম। অতঃপর তারা প্রতিটি আনাচে কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। (৫)

□

এই সূরায় ইহুদিদের কথা আলোচনায় এসেছে। তাদের সাথে বিরোধে জড়াতে হলে, তিন প্রকারের বান্দার বৈশিষ্ট্য অর্জন করা আবশ্যিক। তাহলেই বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করা সম্ভব। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ, নূহ আ.-এর আদর্শ এবং প্রচণ্ড দাপুটে মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। এমন কঠোর অনমনীয় মুজাহিদ কারা? সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারা কুফ্যারের সাথে সামান্যতম আপোষ করতেও রাজি নয়? ইহুদিদের সাথে আমাদের সংঘাত হলো,

ক. হক ও বাতিলের সংঘাত।

খ. আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের দোসরদের সংঘাত।

মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। তিন প্রকার বান্দার সংগ্রামের আদর্শ সামনে রাখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে! ইনশাআল্লাহ।

প্রথম ও শেষ

সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। (আলাক: ১-২)

এখানে মানুষসৃষ্টির কথা আলোচিত হয়েছে। আবার সবার শেষে নাযিল হওয়া আয়াত হলো,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

তোমরা ভয় করো এমন একদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (বাকারাহ: ২৮১)

এই আয়াতে মানুষের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা আলোচিত হয়েছে। কুরআন কারীম জীবনের কথা বলেই বক্তব্য শুরু করেছে। একটানা ২৩ বছর জীবনের কথা বলে গেছে। কুরআন কারীম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজন হয় এমন সব কথা বলে গেছে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনকে কিভাবে সুন্দর করে সাজানো যায়, তার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছে।



কুরআন জীবনের কিতাব। কুরআন বাঁচার পাথের জোগানো কিতাব। কুরআন জীবনের কথা বলে। কুরআন আশার কথা বলে। কুরআন সুন্দর জীবন কাটিয়ে অর্থবহ মৃত্যুর প্রতি উৎসাহিত করে।

আল্লাহর নাম

কুরআন কারীম শুরু হয়েছে বিস্ময়কর এক সূচনার মাধ্যমে। বিসমিল্লাহর মাধ্যমে। বিসমিল্লাহতে আল্লাহর তিনটা নাম আলোচিত হয়েছে।

এক. [الله] 'আল্লাহ' এই নামবাচক শব্দটা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আর কারো নাম হিশেবে শব্দটা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

দুই. [الرحمن] যিনি সকলের প্রতি দয়াবান। 'রহমান' আল্লাহর গুণবাচক নাম। অন্য কাউকে এই গুণবাচক নামে ডাকা যাবে না। তবে রাহমান শব্দের সাথে অন্য কোনো শব্দ যোগ করে নাম রাখা যাবে। যেমন আবদুর রাহমান। রাহমানের বান্দা।

তিন. [الرحيم] পরম দয়ালু। 'রহীম' আল্লাহর গুণবাচক নাম। এই নামে আল্লাহকেও ডাকা যাবে বান্দাকেও ডাকা যাবে।

চমৎকার একটা ধারাবাহিকতা ফুটে উঠেছে।

ক) প্রথমে 'আল্লাহ' নামবাচক শব্দটা শুধুই আল্লাহর জন্য।

খ) তারপর 'রহমান' গুণবাচক শব্দটাও শুধুই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

গ) তারপর 'রাহীম' গুণবাচক শব্দটা আল্লাহর জন্য এবং বান্দার জন্যও।

রাহমান ও রাহীম

কুরআন কারীমের শুরুতে দুইবার এসেছে [الرحمن الرحيم] শব্দদু'টো। একবার বিসমিল্লাহতে। আরেকবার সূরা ফাতেহায়।

এক. [الرحمن] যিনি সকলের প্রতি দয়াবান।

দুই. [الرحيم] পরম দয়ালু।

বিসমিল্লাহতে শব্দ দু'টো [الله]-এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর সূরা ফাতেহার তৃতীয় আয়াতে শব্দদু'টো [رب]-এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে।



প্রতিটি সূরার শুরুতে যেহেতু অপরিহার্যভাবে বিসমিল্লাহ লিখতে হয়। তাই ধরে নেয়া যায়, প্রতিটি সূরাই আল্লাহর বিশেষ রহমতের নিদর্শন। যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করলেই আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে প্রবেশ করবে।

সূরা ফাতেহায় শব্দদু'টো দুইবার ব্যবহৃত হওয়ার অর্থ এটা করা যায়, এই সূরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতস্বরূপ। কুরআন কারীমের সেরা সূরাও বটে। অন্য সূরার তুলনায় এই সূরাপাঠে আল্লাহর রহমত দ্বিগুণ বর্ধিত হবে। একথা ভেবে নেয়া ঠিক নয়, রাহমান-রাহীম শব্দদু'টো সূরা ফাতেহায় অতিরিক্ত হয়ে গেছে। কুরআন কারীমে কোনো অতিরিক্ত শব্দ তো দূরের কথা, একটা হরফও অতিরিক্ত নেই।

বাকারার ভূমিকা

সূরা বাকারার ভূমিকাটা পরিষ্কার থাকলে পুরো সূরার ওপর নজর বোলানো সহজ হয়ে যায়। ইমাম মুজাহিদ রহ, বলেছেন,
-প্রথম চার আয়াতে মুমিনদের আলোচনা করা হয়েছে।

তারপরের দুই আয়াতে কাফিরদের আলোচনা করা হয়েছে।
তারপর তের আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে।



এই বিভাজনটা মাথায় রেখে মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য, কাফিরদের বৈশিষ্ট্য, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্তমানেও মুনাফিকরাই ইসলামের বেশি ক্ষতি করছে! নামে মুসলমান, কিন্তু সবকিছু বিক্রি করে বসে আছে 'রিয়াল-ডলার'-এর কাছে! বর্তমানেও এককথায় কাফিরকে চেনা যায়। দুই আয়াতেই কাফিরদের চেনা যায়। কিন্তু মুনাফিকরা বর্ণচোরা! একই অঙ্গে নানারূপ! ভালো করে ঠাহর করতে না পারলে, চেনা বড় দায়।

শহীদের হাসি

মাক্কেমধ্যে মাথায় চেপে বসে কোনো একটা লাইন। কোনো একটা আয়াত। কোনো একটা স্মৃতি। কোনো একটা শব্দ। সেই ভোর তিনটে থেকে মাথায় ঢুকে বসে আছে দু'টি আয়াত।

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مَّسْفُورَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

কিছু চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল। সহাস্য ও প্রফুল্ল। (আবাসা: ৩৮-৩৯)



দুজন শহীদের ছবি দেখেই মূলত আয়াতের চিত্রকল্পটা মাথায় এসেছে। আচ্ছা শহীদগণ এভাবে মিষ্টি করে কিভাবে হাসতে পারেন! মৃত্যুর পরও? পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার পরও?

ইসলাম

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। (আলে ইমরান: ১৩)

প্রশ্ন জাগে, অন্য নবীরাও কি ইসলামের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন?

-জি। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের মাধ্যমে যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দু'টি অংশ।

ক) আকায়েদ

খ) আমল

আকায়েদ অংশকে বলা হয় দ্বীন আর আমলের অংশকে বলে শরীয়ত। আকায়েদের বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সমস্ত নবীর বক্তব্য ছিল এক ও অভিন্ন। আদম

আ. থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সবাই অভিন্ন আকীদা প্রচার করে গেছেন। তবে নবীগণের শরীয়তটা ভিন্ন ছিল। কোনো নবীর শরীয়তে সম্মানসূচক সিজদা বৈধ তো আরেক নবীর শরীয়তে হারাম।

টুট সমাচার

কুরআন কারীমের কিছু আয়াত আছে, যেগুলোর অর্থ করতে গিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়তে হয়। প্রচলিত তরজমাগুলোতে যা লেখা আছে, সেগুলোকে সরাসরি ভুল বলা যাবে না। তবে অর্থের মধ্যকার ভিন্নতার অবকাশও অস্বীকার করা যাবে না। কিছু শব্দ আছে, প্রচলিত অর্থের বাইরে ভিন্ন অর্থেরও অবকাশ রাখে। তেমন একটি শব্দ হলো [الجمال]। জামাল। উট। সূরা আ'রাফের ৪০ নাম্বার আয়াতে আছে,

حَتَّى يَلْتَمِسَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

যে পর্যন্ত না, সুইয়ের ছিদ্রে 'জামাল' প্রবেশ করে।

প্রচলিত তরজমায় 'জামাল' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উট'। ভুল বলার অবকাশ নেই। অভিধানসম্মত তরজমা। কিন্তু একটু খটকা লাগে, উটের সাথে সুইয়ের ছিদ্রের কী সম্পর্ক? সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না! কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন,

-এখানে অসম্ভব কিছু বোঝানো উদ্দেশ্য। উট যেহেতু আরবদের কাছে অতি পরিচিত প্রাণী। এবং গায়ে-গতরে বড়ও বটে। এতবড় একটা বস্তু সুইয়ের চিকন ছিদ্র দিয়ে কিভাবে প্রবেশ করবে? সুতরাং এটা যেমন অসম্ভব, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব।

কিন্তু 'জামাল' শব্দটার ভিন্ন একটা অর্থও আছে। জাহাজ বাঁধার মোটা 'কাছি' বা রশি। এবার উপমাটা কাছাকাছি মনে হয়। ইবনে আব্বাস রা. উক্ত আয়াতে জামাল শব্দটাকে [الجمال] জুম্মাল পড়েছেন। অর্থ, মোটা রশি। যদি অসম্ভব হওয়ার দিকটা দেখি, 'উট' অর্থ নেয়াটাই ঠিক মনে হয়। আবার উপমার দিকটা খেয়াল করি তখন 'রশি' অর্থ নেয়াটাই সুন্দর বলে মনে হয়।



এছাড়া কুরআন কারীমে সাধারণত 'উট' বোঝাতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [البعير] উট। এই শব্দের বহুবচন আবার অদ্ভুত [إبل]। একবচনের মূলধাতু এক, বহুবচনের মূলধাতু আরেক। সূরা ইউসুফে আছে, ভাইয়েরা তাদের বাবার কাছে বিনইয়ামিনকে সাথে নেয়ার যুক্তি পেশ করছে। তাকে সাথে দিলে

وَنَزَّلْنَا كَيْلَ بَعِيرٍ

আমরা এক উটের বোঝা বাড়িয়ে নিতে পারবো। (৬৫)
আবার সূরা গাশিয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

তারা কি 'ইবিল'-এর দিকে তাকায় না, কিভাবে সেটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৭)

আমরা 'ইবিল' অর্থ জানি, উট। কিন্তু আরেকটা অর্থও আছে, বৃষ্টিবাহী মেঘ। উক্ত আয়াতে 'মেঘ' ও অর্থ করা যাবে।

আমরা জেনে এলাম 'জামাল' অর্থ উট বা মোটা রশি। বহুবচনে [جملة] জিমালাতুন। সূরা মুরসালাতের ৩৩ নাম্বার আয়াতে 'জিমালাতুন' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শব্দটার প্রচলিত অর্থ 'উট' ধরতে পারি। কিন্তু 'রশি' ধরলে অর্থটা কেমন দাঁড়ায়? মিল খাবে? দেখাই যাক,

إِنَّمَا تُرْوَى بِكَرَرٍ كَأَنَّ الْفُسْرَى كَانَتْ صُفْرَى

তরজমা করার আগে [القصر] কাসর শব্দটার অর্থ জেনে নেয়া জরুরী।

ক) প্রাসাদ। এটাই বহুল প্রচলিত।

খ) খেজুর গাছ বা বড় কোনো গাছের গুঁড়ি।

গ) বিশাল আজদাহা।

নিশ্চয় সে আগুন 'কসরতুল্য' বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করবে।

মনে হবে তা হলুদ বর্ণের 'জিমালাহ'। (মুরসালাত: ৩৩-৩৪)

প্রচলিত তরজমা অনুযায়ী বলতে গেলে,

"নিশ্চয় সে আগুন 'প্রাসাদতুল্য' বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করবে।

মনে হবে তা হলুদ বর্ণের 'উট'।"

এই তরজমাই সর্বজনবিদিত। এবং বিস্ময়ও বটে। কিন্তু সদ্য করা শব্দবিশ্লেষণের আলোকে বলতে গেলে তরজমা দাঁড়াবে,

"নিশ্চয় সে আগুন 'আজদাহার মতো' বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করবে। মনে হবে তা হলুদ বর্ণের 'মোটা রশি'।"

অথবা

"নিশ্চয় সে আগুন 'খেজুর গাছের গুঁড়ির মতো' বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করবে। মনে হবে তা হলুদ বর্ণের 'মোটা রশি'।"

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যেখানে নিছক উট বোঝানো উদ্দেশ্য সেখানে আল্লাহ তা'আলা 'বায়ীর' বা 'ইবিল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেখানে উট ছাড়া জিন্ন অর্থ নেয়ার অবকাশ আছে, সেখানে 'জামাল' ও 'জিমালাহ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন।

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন কারীমের তরজমা হয় না। আমরা তরজমা বলতে 'ভাব' বুঝিয়েছি।

সহচর

আবু বকর, (لَا تُخْزِبْ) (إِنَّ اللَّهَ مَعَهُ) চিহ্নিত হয়ো না! আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।

গারে সাওরের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আয়াতের দুইটা অংশ। একজন সঙ্গী কেমন হবে?

ক) প্রথম অংশে: দুশ্চিন্তা-বিপদাপদে পাশে দাঁড়াবে। সহমর্মিতা প্রকাশ করবে।

খ) সঙ্গী তার সঙ্গীকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে। তা'আলুক মা'আল্লাহ করে দিবে।

কাফেরের রাগ

সূরা ফাতহের শেষ আয়াতে একটা কথা বেশ অর্থবহ। বর্তমানের জন্য বেশ প্রাসঙ্গিকও বটে।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

আয়াতের ভাবটা এমন,

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে শক্তিশালী করেন, তাদের মাধ্যমে বড় বড় কাজ আঞ্জাম দেন। এমনটা করেন কাফেরদের মনে ক্রোধ সৃষ্টির জন্য। তাদের অন্তর্জালা বৃদ্ধির জন্য।

-মুমিন কারা?

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ

যারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, মুমিনদের প্রতি কোমল!

□□□

এজন্য দেখা যায়, যখনই আল্লাহর মুমিন বান্দারা ধীনের স্বপক্ষে কার্যকর কোনো কাজ আঞ্জাম দেন, তখনই সমস্ত কুফকারের গায়ে আগুন ধরে যায়। প্রতিহত করতে তারা উঠেপড়ে লাগে। কাজটা তারা করে দুই ভাবে,

ক) সরাসরি মুখোমুখি হয়ে ।

খ) কাজটা যারা করেছে, তাদের চরিত্র হনন করে ।

যখনই ভালো কোনো কাজ সমাধা হয়, তখনই কুফফার শক্তি এ-দুই কৌশলে মাঠে নেমে পড়ে । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।

অপ্রকৃতিস্থ । সমকামী । রগচটাসহ আরও নানা অভিধায় অভিযুক্ত করা শুরু হলো । অথচ বাবার দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য,
'আমার ছেলে অত্যন্ত ভালো'!

III

এখানেই শেষ নয়, কুফফার এখন একা নয়, তাদের কিছু নুনোয়া খুদোয়া তৈরি হয়েছে । তাদের কাজ হলো, প্রতিটি আনন্দকর ঘটনার পর উঠেপড়ে লাগা । 'মুমিন' বান্দাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য । মানুষ যদি 'মুমিনদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে! এই ভয়ে তারা কিছু হাদীসের আজগুবি আর মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে ফলাও করে প্রচার করার চেষ্টা করে,
-এরা ভ্রষ্ট! দুয়েকটা ভালো কাজ করলেই ভালো হয়ে যায় না! আপনারা এদের চাতুরিমূলক ভালো কাজ দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন না ।

IIII

আচ্ছা, হককে কি কখনো ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়? হকের সুবাস যতই ছিপিচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক, ঠিকই সুরভি ছড়াবে!
আফসোস! কাফেরদের জন্য! কাফেরদের দূতাবাসী সহযোগীদের জন্য!

সাদ্‌নানা

কারো কারো মনে একটা প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরপাক খেতে দেখা যায়,
-এতগুলো মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায়, রাতের আঁধারে শহীদ করা হলো, কই তাদের কারো কিছু হলো না! দিনদিন তাদের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে । স্থিতি বন্ধমূল হয়ে চলেছে! তাদের উদ্‌যাক উত্তরে একটা আয়াতই মনে আসে,

فَلَا يَنْفَعُ زَكَّاتُكَ تَقَبُّهُمُ فِي الْبِلَادِ

হে নবী, দেশে দেশে (ঢাকায়, চট্টগ্রামে, সৌদিতে, লন্ডনে) অবাধ
বিচরণ আপনাকে যেন বিভ্রান্তিতে না ফেলে দেয় । (গাফের: ৪ মর্মার্থ)

IIII

আল্লাহর শাস্তি একা আসে না । জালেমের স্ত্রী-পুত্রের ওপরও আসে । আশেপাশে
যারা জুলুম দেখেও প্রতিবাদ না করে চুপচাপ ছিল তাদের ওপরও আসে । যারা

বাধ্য হয়ে হুকুম পালন করেছে, তারাও ছাড় পাবে কি না, সন্দেহ! ছাড় পাচ্ছেই বা কোথায়? অন্যকে পাখির মতো গুলি করলে, নিজের... মানুষও...! লাখ লাখ মানুষের আহাজারি-ফরিয়াদ, চোখের পানি কি বৃথা যাবে? আল্লাহ তা'আলার শানে এমনটা কল্পনা করাও তো 'কুফুরির নামাস্তুর'!

পার্বকরেখা

যতই দিন গড়াচ্ছে, ততই একটা পার্বকরেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে! হক ও বাতিল আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

لِيُيَيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا

فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْخِزْيُورُ

যাতে আল্লাহ পৃথক করে দেন 'খবীস' ও 'তাইয়িব'কে! আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত ভূপে পরিণত করেন এবং পরে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করেন। এরই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (আনফাল: ৩৭)



হকদলের সাথে মানুষ খুবই কম থাকবে! আর বাতিলের দলের লোকেরা হবে সুপকৃত! রাশিরাশি! আল্লাহই ভালো জানেন, কারা হক আর কারা বাতিল! মাজলুমের পক্ষের শক্তি নাকি জালেমের পক্ষের শক্তি?

দাজ্জালের ফিতনা

সূরাতুল কাহফ তিলাওয়াত করলে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচা যাবে।

ব্যাপারটা কি এমন, তিলাওয়াত করলাম ব্যস আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন?

-কেউ কেউ বলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং সূরাতুল কাহফে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় বলে দেয়া আছে! সেটা কী?

-এই সূরায় বর্ণিত সাত যুবকের কথা মনে আছে তো! রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে থেকে, দ্বীনকে সঠিকভাবে মানতে পারছিল না। গোপনে তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল। পরে আবার ফিরে এসেছিল...! অথচ সূরাটা গভীরভাবে

তিলাওয়াত করলে দেখা যায়, সেই দেশে সাত যুবক ছাড়াও 'মুসলিম' ছিল।

এবং নিশ্চয় অভিজ্ঞ বড় বড় '...বিশারদ'ও ছিল। তারা কেউ প্রচলিত

সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি! আপোষকামী হয়েই জালিমশাহীর অধীনে

থেকে গিয়েছিলেন। বোধোদয় ঘটেছিল শ্রেফ সাত যুবকেরই। কাঁচাবয়েসী

সাতজনকেই কেবল টনক নড়েছিল!

বড় দ্বীনবিশারদ হয়ে গেলেই যে, শতভাগ 'দ্বীনদার' হয়ে গেলেন, এমন নয়। জানা আর মানা চিরকালই এক নয়। বড়জ্ঞানী হয়ে গেলেই তিনি বড় আমলদার হয়ে যাবেন এমন নয়। সূরা কাহফই তার বড় প্রমাণ! রাক্বে কারীমই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পদস্থলন

কিছু আয়াত আছে, ভীষণভাবে চমকে দেয়। অনেক বড় বুয়ুর্গও বিচ্যুত হয়ে যেতে পারেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে 'নবীজিকে' দেখেছিলেন এমন মানুষও ছিল। সুতরাং কেউই নিরাপদ নয়। যে কোনো সময়ই শয়তান এসে থাবা বসাতে পারে! জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা ফিতনা এসে হানা দেয়। প্রলোভন এসে ফুসলাতে থাকে। হকের ওপর টিকে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমি এখন হিদায়াতের ওপর আছি, নেক আমল করতে পারছি। এ-নিয়ে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। যে কোনো মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে!

وَلَا تَخْذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَابِئِكُمْ فَتَرْكُلُوا وَتَدُورُوا فُتُورًا

তোমরা কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহের বাহানা করো না। তাহলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফস্কে যাবে এবং শান্তির স্বাদ আশ্বাদন করবে। (নাহল: ৯৪)

পিলে চমকে দেয়া আয়াত! কী বলা হলো? হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পা পিছলে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এটা বলেননি, দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার পর পা পিছলে যাবে। তার মানে যারা দাবী করে, তারা হকের ওপর আছে তাদের বিপদ কাটেনি! একটু এদিক সেদিক হলেই 'মড়াং'? সুতরাং হকে পৌছাই যথেষ্ট নয়! হকের ওপর টিকে থাকার জন্য কিছু শর্তও পূরণ করতে হবে। আবার হকের ওপর টিকে থাকার শর্তগুলো সর্বকালে একও থাকে না, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর থাকা চাই!



আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'পা স্থিত [ثَبُوت] হওয়ার পরও পিছলে যেতে পারে। এটা বলেননি পা স্থিত না থাকার পর। তেমন হলে ব্যাপারটাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বলা হয়েছে, পা স্থিত হওয়ার পরও পিছলে যেতে পারে। গা শিউরানো কথা। সর্বাস্তুরকরণে সব সময় আল্লাহর কাছে 'সুবূত' [ثَبُوت] বা

স্থিতিবস্থার জন্য দু'আ আবশ্যিক। নইলে কখন কিভাবে পা হড়কে যাবে, টেরও পাবো না। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকা, পিছলে যাচ্ছি না তো! অন্যের দিকে নয়, নিজের দিকে চোখ রাখা! নিজের চিন্তাকে এতটাই 'সুরক্ষিত' মনে করা হয় যে, অন্যকেই সব সময় ভুল মনে হয়! এটাই 'বিচ্যুতি'!

অবিচল স্থিরতা

স্থিরতা (ثَبُوت) স্থায়ী কোনো বিষয় নয়। কেউ ঈমান এনে ফেলল ব্যস, বাকি জীবন নিশ্চিত, এমন নয়। ফেরেশতাদের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরও ইবলীস স্থায়ী শয়তানে পরিণত হয়েছে।



স্থিরতা (ثَبُوت) কিভাবে আসে? বেশি বেশি ওয়াজ শোনার মাধ্যমে? লেকচার? বই? না, কুরআন কারীম নিজস্ব ঢঙে বলছে ভিন্ন কিছু। সুবূতের কিছু উপায় বের করে আনা যাক। আমরা দ্বীনের পথে চলার শুরুতে কি করি? ওয়াজ-বয়ান-লেকচার শুনতে শুরু করি। এটা কি যথেষ্ট?

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا

তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করতো, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হত এবং তা তাদের অন্তরে অবিচলতা সৃষ্টিতে সহায়ক হত। (নিসা: ৬৬)

ওয়াজ শুধু শোনা নয়, শোনার সাথে সাথে আমল করলেই স্থিরতা (ثَبُوت) সৃষ্টি হয়। বরং আমলের মাধ্যমে দৃঢ়তার মাত্রাটা প্রবল (عَزْ) হয়। ওয়াজ শুনলেই হবে না, তদানুযায়ী আমলও করতে হবে। তবেই 'সুবূত' আসবে। কাজে লাগবে। শুধু কথা শুনে ফল পাওয়া যাবে না। একজন আলিমকে প্রশ্ন করা হলো,

-অমুকের আমল নষ্ট হয়ে গেছে। নামায-কালাম ছেড়ে দিয়েছে। আগে কত ভালো ছিল, এখন কেন এমন হল?

-সে আমল করার সময় হয়তো দু'টি কাজ করেনি।

-সেই দু'টি কাজ কি কি?

-প্রথমত সে হয়তো আল্লাহর কাছে 'সুবূত' কামনা করে নিয়মিত দু'আ করেনি।

দ্বিতীয়ত হয়তো সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেনি!

-কিসের শুকরিয়া?

-সে যে আমল করতে পারছে, হিদায়াতের ওপর মুস্তাকীম (অবিচল) আছে, তার শুকরিয়া। আমি আমল করতে পারছি, আমি হিদায়াতের ওপর আছি, তার মানে এই নয়, আমি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আমি হিদায়াতের যোগ্য। বরং হিদায়াতের ওপর থাকা, আল্লাহর খাস রহমতেই সম্ভব হয়। যে কোনো মুহূর্তে আমি রহমতের বাগডোর থেকে ছিটকে পড়তে পারি।



নিজের আমল দ্বারা ধৌকাগ্রস্ত হয়ে যাবো না। ইবাদত করতে পারছি দেখে, অহমিকায় ভুগবো না। যারা পথহারা হয়ে আছে, তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাব না। মনে রাখব, আল্লাহর খাস রহমত না হলে, আমার অবস্থাও আজ তার মতো হত।

وَلَوْلَا أَنْ يَبْنِيَّكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করত। (বনী ইসরাঈল: ৭৪)

আশ্চর্য, আমাদের পেয়ারা নবীকেও সতর্ক থাকতে হয়। তাকেও আল্লাহ তা'আলা নিজ তত্ত্বাবধানে ঠিক পথে আগলে রাখেন। তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে? আমার যদি ধারণা হয়, ভালো কাজ করা, হজ-যাকাত পালন করা আমার কৃতিত্ব, তাহলে আমার সামনে বড় বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। যেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ইস্তেকামত বা অবিচলতার জন্য আল্লাহর সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী, আমার অবস্থান কোথায়?



ফিতনার সময় 'সুবূত' বা অবিচলতা অর্জনের উপায় কি? অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম পাঁচটি উপায় বের করেছেন,

☞ (এক) কুরআন কারীম।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُكَ بِهِ فُؤَادَكَ

আমি এরূপ করেছি এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে আপনার অন্তর মজবুত রাখার জন্য। (ফুরকান: ৩২)

কাফেররা সমালোচনা করে বলত, কুরআন কারীম পুরোটা একবারেই নাযিল করা হয় না কেন? এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা কথাটা বলেছেন। কুরআন কারীম ধীরে ধীরে নাযিল করার প্রধান উদ্দেশ্য হল; নবীজির মনকে স্থির রাখা। সাবিত রাখা। অবিচল রাখা। এখনো কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে, হকের ওপর অবিচল থাকা সহজ হবে।



৞ (দুই) সীরাত পাঠ ও নবীগণের ঘটনা (কাসাস) পাঠ করা। তাহলে হকের ওপর সাবিত থাকা যাবে।

وَكُلُّكُمْ رُفُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

(হে নবী) আমি আপনাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরে শক্তি যোগাই। (হুদ: ১২০)
বিগত নবীগণের জীবনী পাঠ শুধু আমাদের মতো সাধারণের জন্যই নয়, নবীজির জন্যও উপকারী ছিল। তাঁর সুবৃত্তের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।



৞ (তিন) ইলম অনুযায়ী আমল করা।

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا

তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হত এবং তা (তাদের অন্তরে) অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হত। (নিসা: ৬৬)



৞ (চার) দু'আ করা।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ

হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার আনুগত্যে অবিচল রাখুন।

এ দু'আটা অত্যন্ত কার্যকর।



৞ (পাঁচ) সাহচর্য বা সংসঙ্গে থাকা।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ধৈর্য-স্বৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় (কাহফ ২৮)।

নবীজিকেও হুকুম করা হচ্ছে, ভালো মানুষদের সাথে লেগে থাকতে। সাহাবীদের সাথে সময় কাটাতে। তাহলে ভালো হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যদি সংসঙ্গ আবশ্যিক হয়, আমার জন্য তবে ফরয।

মুখআলগা

কিছু মানুষ বা আলেমের বক্তব্য শুনে, একটা আয়াতের কথা মনে পড়ে। মুচকি হাসি আসে। তারা নিজেদের বুঝ অনুযায়ী বলে বসে,
-অমুক জাহান্নামী! তাদের কাজের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।
আয়াতটা হলো,

وَقَالُوا مَا كُنَّا لَنَرِي رَجُلًا كَذَّابًا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ

আর তারা বলবে: কী হলো, যাদেরকে আমরা 'দুষ্টলোক' মনে করতাম, তাদেরকে দেখছি না যে? (সোয়াদ: ৬৩)



আজো একজনের কথা শুনে আয়াতটা মনে পড়লো। কুরআন কারীম খুলে পুরো পৃষ্ঠা (২৩ পারার ১৫তম পৃষ্ঠা) আগাগোড়া কয়েকবার চোখ বুলালাম। ওপরের আয়াতটা আসলে একদল জাহান্নামীর উক্তি। তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে জান্নাতী মনে করতো। ভালো কাজের অনুসারী মনে করতো। কিন্তু জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। তারা অবাক হয়ে বলবে, সে কী রে! তারা কোথায়? তাদেরকে তো আমরা মন্দলোক বলেই মনে করতাম! জাহান্নামী বলেই মনে করতাম! এখন দেখছি উল্টো!

কুরআন কারীম যে আসলে কেমন রত্ন, বলে বোঝানো কোনো বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়! এই আয়াত কতশত বার পড়া হয়েছে, অথচ আমাদের ও বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে হুবহু মিলে গেছে! আগে কখনো ভেবে দেখা হয়নি।

আহযাব

এখন পড়া দরকার সূরাতুল হজ্জ। কিন্তু বারবার সূরা আহযাবের দিকেই মন চলে যাচ্ছে। কী সুন্দর করে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান সময়কে চিত্রায়িত করেছেন।



জীবনের বড় একটা স্বপ্ন ছিল প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ঘটনার স্বপক্ষে কুরআন কারীম থেকে আয়াত বের করার যোগ্যতা অর্জন করব। নিজে নিজে হোক বা সাহায্য নিয়ে হোক। কৈশোরের যেসব স্বপ্ন আজো হারিয়ে যায়নি, এটা তার অন্যতম। তবে হ্যাঁ, স্বপ্নটা মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়! আবার ফিরে আসে! আবার হারায়!

আচ্ছা যাক, এবার ইরাক-সিরিয়া নিয়ে কোন আয়াতটা সামনে এলো? এমনিতে ইরাক-সিরিয়াতে বিরুদ্ধপক্ষ এক নয়, একাধিক। তার মানে 'আহযাব'। আরবীতে হিব্ব অর্থ দল। আহযাব তার বহুবচন। কুরআন কারীমে আস্ত একটা সূরাই আছে। এজন্য ইরাক-সিরিয়া বিষয়ক আয়াত খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয়নি। কারণ ইরাক-সিরিয়াতেও 'আহযাব যুদ্ধ'-এর মতোই ঈমান ও সম্মিলিত কুফরি জোটের লড়াই!

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

আয়াতখানার ভাবটা এমন:

যখন মুমিনগণ কাফিরদের সম্মিলিত জোটকে দেখলো তখন বললো, আল্লাহ ও তার রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল সত্য বলেছেন। এতবড় জোট দেখে (ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো) তাদের ঈমান ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ আরো বেড়ে গেল। (আহযাব: ২২)

কাফিরদের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিখা খনন করেছেন। সিরিয়াবাসীও কুফফার জোটের বিমান হামলা থেকে বাঁচতে, অপ্রত্যাশিত এক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। টায়ার পোড়ানো। নিশ্চয়ই তারা টায়ার পোড়াতে পোড়াতে, এই আয়াতটার কথা ভাবছিল! আনসার ও মুহাজিরদের সম্মিলিত মেহনতে খোঁড়া খন্দক দেখে কুরাইশ এন্ড গং ভাবাচেকা। টায়ারের কালো ধোঁয়া দেখে পুতিন-ট্রাম্প-খোমেনিরা দিশেহারা



সূরা আহযাব পুরোটাই একবার সুযোগ করে পড়ে নেয়া যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চমকপ্রদ সব কথাবার্তা। আমার আল্লাহ সত্যি সর্বজ্ঞ। আমাদের কুরআন সত্যিই আল্লাহর কালাম।

নারীর শোক-দুঃখ

বিষয়টা বেশ ভাবিয়ে তুলল।

☞ (এক) সূরা কাসাসে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي

তুমি ভয় করো না, দুঃখ করো না। (৭)

মূসা আ.-এর আম্মুকে আল্লাহ তা'আলা প্রবোধ দিচ্ছেন। সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ছেলের জন্য চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। ফির'আওনের হামলার আশংকা দেখা দিলে, সাগরে ফেলে দিতে বলছেন।

☞ (দুই) মারয়াম আ. নবজাতককে নিয়ে দূরস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাইলকে পাঠালেন। তিনি এসে মারয়ামকে অভয় দিলেন,

فَتَذَاهَا مِنْ تَحْتِهَا لَا تَخْزِي

তখন ফিরিশতা তার নিচে এক স্থান থেকে তাকে ডাক দিয়ে বললো,
তুমি দুঃখ করো না। (২৪)

☞ (তিন) সূরা আহযাবে গিয়েও একই শব্দের ব্যবহার।

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَخْزِي

এ-নিয়মে খুব আশা করা যায়, তাদের চোখ জুড়াবে। তারা
বেদনাহত হবে না। (আহযাব: ৫১)

সর্বমোট ৪২বার ব্যবহৃত হয়েছে 'হযন' [حزن] শব্দটা। ইয়াকুব আ.-এর জন্যও তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। শোকাহত পিতার অবস্থা বর্ণনা করার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন তিন নারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা 'হযন' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। তিন নারীর মধ্যে দু'জনেই আবার 'মায়ের' ভূমিকায় আছেন। একজন পিতার জন্যও তিনবার 'হযন' শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

ক) আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া মোটেও পছন্দ করেন না।

খ) আল্লাহ তা'আলা চান না, নারীরা দুঃখ পাক। শোকাহত হোক। সেজন্য বারবার বলেছেন: তোমরা দুঃখ পেয়ো না। শোকাহত হয়ো না।

গ) তিনটা আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত নারীদের দুঃখ দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। মূসার মাকে আবার সন্তানকে তার কোলে ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ঈসার মাকে এহেন নির্জন-বিরানভূমিতেও খানা-পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি ইয়াকুব আ.-কেও তার সন্তান ফিরিয়ে দিয়েছেন।



একজন নারী, হোক তিনি মা বা স্ত্রী বা বোন বা কন্যা!

তাকে দুঃখ দেয়া যাবে না। তার আরামের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনটা রাব্বের কারীম করেছেন।

মার্জনা

কুরআন কারীমের কিছু আয়াতে শাস্তি বা প্রতিশোধের কথা আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি একটা কথা বলে উপসংহার টানা হয়েছে 'ক্ষমা করাটাই উত্তম'। তবে ক্ষমার বিষয়টা ব্যক্তিগত হতে হবে। আল্লাহর কোনো বিধান মজ্বনের ক্ষেত্রে বান্দা ক্ষমা করার অধিকার রাখে না।

III

আমার প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ করলে আমি এর প্রতিশোধ নিতে পারি, এটা আমার বৈধ অধিকার। তবে প্রতিশোধ বা প্রতিবিধানটা হতে হবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে। কিন্তু আমি যদি ক্ষমা করে দেই, তাহলে সেটা হয় মহব্ব। একটা আয়াত প্রায়ই মাথায় ঘুরপাক খায়, রাতে শোয়ার আগে সারাদিনের কার্যক্রম যাচাই করার সময়ও আয়াতটা চোখের সামনে অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখি।

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে। (শূরা: ৪০)

জুলুমের শিকার হয়েও যে ক্ষমা করে, তার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহই দিবেন বলে আশ্বাস রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখেছি প্রতিদানটা কেমন হয়?

- ক) আল্লাহ আমাকে আবার জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেন।
 - খ) ক্ষমাকারীকে জালিম হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রাখেন।
 - গ) ক্ষমাকারীকে আল্লাহ অনেক অজানা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।
 - ঘ) ক্ষমাকারীর মনে অপূর্ব এক সুখবোধ বহমান করে দেন।
 - ঙ) তার সহনক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন।
 - চ) সবরের মতো অসাধারণ এক গুণের বীজ তার মধ্যে চারিয়ে দেন।
 - ছ) আখেরাতের কল্পনাভীত প্রতিদান তো থাকবেই থাকবে।
- তবে প্রতিশোধ গ্রহণের পর্যায় থেকে, ক্ষমা করার পর্যায়ে উত্তরোত্তে কিছুদিন অনুশীলন করার প্রয়োজন। চট করেই ক্ষমার পদে উন্নীত হওয়া সহজ নয়।

ফির'আওন

আল্লাহ তা'আলা লোকটার ন্যাকারজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরো কুরআন জুড়ে আলোচনা করলেও, তার মূল নাম উল্লেখ করেননি একবারও। তার গুণবাচক নাম 'ফির'আওন' শব্দটাই বারবার উল্লেখ করেছেন। ফির'আওন হলো মিসরের রাজাদের 'উপাধি'।

কুরআন কারীমের প্রতিটি ঘটনাই সবযুগের মানুষের জন্য। তার মানে ব্যক্তি ফির'আওন উদ্দেশ্য নয়, তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটাই মুখ্য। ব্যক্তি ফির'আওন মরে যাবে, কিন্তু ফির'আওনি বৈশিষ্ট্য বাকি থাকবে। যুগে যুগে প্রকাশ পাবে। যেখানেই হক আসবে, সেখানেই বাতিল আসবে। সেটা কখনো ইসা আ.-কে মৃত্যুদণ্ডদানকারী রোমান বিচারপতি পন্টিয়াস পিলেটের ছবিতে, কখনো আবু জাহলের সুরতে, কখনো ওবামার সুরতে।

ধোকা

ফির'আওন বলেছিল:

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى

আমি যা সঠিক মনে করি, সেই রায়ই তোমাদেরকে দেবো। (গাফির: ২৯)

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেই দু'টি ফির'আওনের হাজার বছর পর, আরেকজন প্রায় একই কথা বললো। সিসি, সেই মিসরেই।

ماتمعون الامني انا

আমার কথাই শুধু তোমরা শুনবে, আর কারো নয়! যুগে যুগে দ্বীন বিরোধীরা এই সুরেই কথা বলে এসেছে। নবীগণ দাওয়াত দিতে গিয়ে সেই একই কথা, একই যুক্তির সম্মুখীন হয়েছেন! আজও দ্বীনের ঝাড়াবাহীরা শুনছে!

مَا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

আপনাকে তো সেসব কথাই বলা হচ্ছে, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছিল। (ফুসসিলাত: ৪৩)

কুরআনের হিদায়াত

কুরআন কেন নাযিল হয়েছে?

হুদাল-লিগাস! | هُدًى لِلنَّاسِ | মানুষের হিদায়াতের জন্য। (বাকার: ১৮৫)

শুধু হিদায়াত লাভের জন্যই কুরআন পড়তে হবে। কুরআন নিয়ে ভাবতে হবে। কুরআন নিয়ে থাকতে হবে। হিদায়াত লাভ করতে হলে, কুরআনকে বোঝা দরকার! এখন কথা হলো, বোঝার স্তরটা কী?

-সাধারণ মানুষের জন্য মোটামুটি আয়াতের বাহ্যিক অর্পণ বুঝলেই হয়ে যাবে। তবে একটা বিষয় পরিস্কার করা দরকার,

-কুরআন পড়ে কেউ হিদায়াত লাভ করে, আবার সে একই কুরআন পড়ে অনেকে গোমরাহও হয়। যারা গোমরাহ হয় তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে।

ক) তারা কুরআন কারীমকে সাধারণের চেয়ে একটু বেশি বুঝতে চায়। এটা ভালো দিক।

খ) সমস্যা হলো, আরো বেশি বুঝতে গিয়েই কিছু কাজ এমন করে ফেলে, যা তাদেরকে কুরআন অধ্যয়নের মূল বিষয় (হিদায়াত লাভ) থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

গ) কুরআন কারীমের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে, হাদীসের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। অথচ হাদীস হলো কুরআন বোঝার প্রধান মাধ্যম।

ঘ) অধ্যয়ন-মুতলা'আর প্রতি বেশি ব্রতী হতে গিয়ে, আমলের কথা আর মনে থাকে না। কুরআন নিয়ে গবেষণাপত্র 'স্টাডি' করতে করতে, জামাতের সাথে নামাযও টুটে যায়।

ঙ) কুরআন কারীমের অলৌকিক দিক, শাদ্বিক ও ব্যাকরণগত সৌন্দর্য নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। এটা নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা 'মূল বিষয়' (হিদায়াত গ্রহণ) ছেড়ে, ভাষাতাত্ত্বিক দিকটা নিয়েই মজে গেছে! তবে হ্যাঁ, যদি উভয় দিকে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, তাহলে সোনায়ে সোহাগা!

চ) একা একা, কোনো বাহ্যবিচার ছাড়া অধ্যয়নও বড় একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এরা অতি আগ্রহের কারণে, যে কারো লেখা পেলেই নিয়ে বসে যায়। সুন্নতী জীবনযাপন করে না, এমন সাহেব-সুবাদের কুরআন বিষয়ক বই যেমন তারা গোত্রাসে গিলে, পাশাপাশি কাফেরদের গবেষণাগুলো তাদের পড়ার টেবিলে যত্নের সাথে শোভা পায়। ফলে হয় কি, দশটা ভালো কথার সাথে, একটা 'প্রাণসংহারক বিষ'ও তার মাথায় প্রবিষ্ট হয়ে যায়। তারপর শুরু হয়, প্রতিক্রিয়া।

ছ) একজন আমলবিহীন লেখক, আর যাই হোক হিদায়াত লাভের জন্য কুরআন নিয়ে গবেষণা করেনি। একজন কাফেরের অবস্থাও তখৈবচ। তারা নিছক জ্ঞানচর্চার জন্যই কুরআন নিয়ে কলম ধরেছে। পাঠকের ওপরও লেখকের একটা প্রভাব পড়ে। সেও আস্তে আস্তে আমলবিহীন 'কুরআন গবেষক' পরিণত হয়।



কুরআন কারীম অধ্যয়নের পদ্ধতি দুইটা

☞ অর্থ না বুঝে, শুধু তিলাওয়াত করে যাওয়া। এতে প্রতি হরফে দশ নেকি।

☞ অর্থ বুঝে বুঝে পড়া। শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের চেষ্টা করা। এবং সেটা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বাস্তবায়নের মেহনত করা।



কুরআন কারীমের সাথে সময় কাটানোর একমাত্র লক্ষ্য, হিদায়াত লাভ!

তো যাদের জীবনে হিদায়াতের চিহ্নমাত্র নেই, তাদের লেখা ও গবেষণা পড়ে, কতটুকু হিদায়াত লাভ হবে, ভেবে দেখার বিষয়।

ওহে, সহচরগণ!

কুরআন কারীমের কিছু কিছু আয়াত আছে, পড়তে গেলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে।

اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

একত্রিত করো জালিম (গোনাহগার)দেরকে, এবং তাদের দোসরদেরকে এবং তারা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে। (সাফফাত: ২২)

শুধু যালেম বা অপরাধীই নয়, তার সাথে আরও অনেকেই সেদিন ধরা পড়বে। জালেমের সঙ্গী। জালেমের প্রতি ভালোবাসা রাখা ব্যক্তি। জালেমের প্রতি সমর্থন জানানো ব্যক্তি। জালেমের জুলুমের সাথে একমত হওয়া ব্যক্তি। জালেমের স্ত্রীও বাদ যাবে না।

ওহে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার স্ত্রী। ঘুষখোর অফিসারের স্ত্রী। মুসলিম হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী। আলেমহুতা বিডিআরের স্ত্রী। হলুদ সাংবাদিকের স্ত্রী। সুদী ব্যাংকে চাকুরের স্ত্রী। মদ-জুয়া চলে এমন হোটেল কর্মকর্তার স্ত্রী। গায়কের স্ত্রী। নর্তকের স্ত্রী। মুসলমানদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো জালেম শাসকের অধীনস্থ সেনা ও চাকুরিজীবীর স্ত্রী।

একটু আয়াতটা সম্পর্কে ভেবে দেখবেন কি? একটু ঠান্ডা মাথায় নিজের অবস্থানটা যাচাই করে দেখবেন কি? আপনি কিন্তু এই আয়াতের আওতায় এসে গেছেন!

আসুন, পরের আয়াতগুলো পড়ি!

مِنْ دُونِ اللَّهِ قَاهِدٌ وَمُهْلِكٌ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقَفُّوا عَنْهُمْ مَتَّوْلُونَ مَا لَكُمْ لَا

تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِّمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

আল্লাহ ছাড়া। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত করো জাহান্নামের
পথে। এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের কি
হলো, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছো না যে? বরং তারা
আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। তারা একে অপরের দিকে মুখ
করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৩-২৭)

ইসমুত তাফদীল

যারা কুরআন কারীমের তরজমা পড়া বা পড়ানোর সাথে জড়িত, তাদেরকে
একটা সমস্যায় প্রায়ই পড়তে হয়। ইসমুত তাফদীল [الترغیل]-এর তরজমা।
তাফদীল অর্থ প্রাধান্য দেয়া। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একটা 'গুণ' বিদ্যমান আছে।
তবে একজনের মধ্যে গুণটা তুলনামূলক বেশি। যার মধ্যে গুণটা স্বাভাবিক তার
জন্য ব্যবহৃত হয়, ইসমুল ফায়েল [الفاعل] কর্তাবাচক বিশেষ্য। গুণটা বেশি
বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় 'ইসমুত তাফদীল'। যেমন,
আলিম [علم] জ্ঞানী।

আ'লামু [اعلم] অধিক জ্ঞানী।

কুরআন কারীমে অসংখ্যবার 'ইসমে তাফদীল' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুশকিল
হলো সব জায়গায় অর্থটা ইসমুত তাফদীলের হবে না। কখনো কখনো 'ইসমুল
ফায়েল' ও 'সিফাতে মুশাব্বাহা' আবার কখনো 'ইসমে মুবালাগা'-এর অর্থেও
ব্যবহৃত হয়।



☞ ইসমুল ফায়েল মানে কর্তাবাচক বিশেষ্য। অর্থটা সাধারণ। আলিম [علم]
অর্থ জ্ঞানী।

☞ সিফাতে মুশাব্বাহা: কর্তাবাচক বিশেষ্য। অর্থটাতে সামান্য আধিক্য মিশ্রিত
স্থায়িত্ব আছে। আলীমুন [علمون] মানে সব সময়ের জন্য জ্ঞানী।

☞ ইসমুল মুবা-লাগা: কর্তাবাচক বিশেষ্য। অর্থের মধ্যে আধিক্য আছে। আল্লা-
মুন [علمون] অর্থ অধিক জ্ঞানী। তবে ইসমুত তাফদীল ও ইসমে মুবালাগাহ-এর
মধ্যে পার্থক্য হলো, ইসমুত তাফদীল অন্যের তুলনায় বেশি আর ইসমে
মুবালাগায় কারো তুলনায় নয়, স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

তাকবীরের কথাই বলি না কেন? 'আল্লাহ্ আকবার' অর্থ? 'আকবার' শব্দটা
ইসমুত তাফদীল। সে হিশেবে অর্থ হওয়ার কথা ছিল 'সবচেয়ে বড়' বা 'অধিক

বড়'। অথচ অর্থ করা হয়, 'আল্লাহ বড়'। সবচেয়ে বড় বললে সমস্যা দেখা দেয়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, তার মানে কি ছোট কেউ আছে?

III

আমরা কিভাবে বুঝবো, 'ইসমুত তাফদীল' কখন ইসমুল ফায়েলের অর্থ দিবে? তিনটা শর্ত আছে।

ক) ইসমুত তাফদীলটা 'আলিফ লামযুজ' না হতে হবে।

খ) নাকিরাহ শব্দের দিকে ইয়াফত না হতে হবে।

গ) 'মিন' হরফযোগে ব্যবহৃত না হতে হবে।

III

১. ইসমুত তাফদীল হয়েও ইসমুল ফায়েলের অর্থ দিচ্ছে,

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ

তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অবগত। (ইসরা: ৫৪)

এখানে আ'লামু [أَعْلَمُ] অর্থ 'আলিমুন'! কারণ আল্লাহর জ্ঞানে কেউ শরীক নেই। অর্থটা অধিক জ্ঞানী বললে, কমজ্ঞানী করো থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এটা এক ধরনের শিরক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়!

২. শব্দটা ইসমুত তাফদীল হয়েও, সিফাতে মুশাব্বাহার অর্থ দিচ্ছে,

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

এটা তার জন্য (সবসময়ই) 'সহজ'। (রুম: ২৭)

এখানে আহওয়ানু অর্থ অধিক সহজ নয়, শুধু সহজ। অধিক সহজ বললে, আল্লাহর জন্য কম সহজ কোনো কাজ থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অথচ আল্লাহর কাছে বেশি সহজ, কম সহজ বলে কিছু নেই।

৩. শব্দটা ইসমুত তাফদীল হয়েও ইসমে মুবালাগার অর্থ দিচ্ছে,

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

আল্লাহ ভালো করেই জানেন, কোথায় তিনি তার রিসালত রাখবেন।

(আনআম: ১২৪)

আবার ব্যাপারটা এমনও নয়, উপরোল্লিখিত তিনটা শর্ত হলেই ইসমুত তাফদীলটা তার নিজস্ব অর্থদানে বিরত থাকবে। এজন্য ইসমুত তাফদীল দেখলেই অর্থ করার আগে, প্রামাণ্য কোনো তাফসীর দেখে নেয়াই নিরাপদ। প্রচলিত অনেক বাঙলা তরজমাতেই ইসমুত তাফদীলের তরজমা 'এদিক-সেদিক' হয়ে আছে।

মুসাব্বিহাত

আগে কখনো বিষয়টা খেয়াল করিনি। মাথায়ও আসেনি। কুরআন কারীমের সূরাগুলোর 'তারতীব' সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠিক করা। এই তারতীবের রহস্য নিয়ে বহু কিতাব লেখা হয়েছে। কেউই চূড়ান্ত কথা বলে যেতে পারেননি। এ-ধারা চলতেই থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত। কুরআন কারীমের সূরাগুলোকে বিভিন্ন শিরোনামে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ভাগ হলো,

১ ক. হাওয়ামীমে সাব'আ [أَوَامِرٌ مِّنْ رَبِّهِ]। শুরুতে [أَمْرًا] হা-মীমযুক্ত সাত সূরা। শুধু এই সাত সূরার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং বালাগাত নিয়ে চমৎকার সব কিতাব আছে। আমার সংগ্রহেও এমন একটা কিতাব আছে।

২ খ. মুসাব্বিহাত [مُتَّبِعَاتٌ]। সুবহানা বা তাসবীহবাচক শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া সূরা। এগুলো নিয়ে কুরআন গবেষকগণ অনেক মেধা ব্যয় করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, হাওয়ামীমের মতো মুসাব্বিহাতও সাতটা।



বেশি কিছু নয়, শুধু মুসাব্বিহাত সূরাগুলোর তারতীব নিয়ে একটা তথ্য দেয়ার জন্য এই লেখা। শব্দমূল বা মাসদার থেকে শব্দ নির্গত হওয়ার ধারাক্রম হলো, মাসদার থেকে মাযি। তারপর মুযারে। তারপর আমর। কুরআন কারীমের মুসাব্বিহাত সূরাগুলোতেই বিস্ময়করভাবে এই তারতীব রক্ষিত হয়েছে।

১. মাসদার [مَسْدَرٌ]। বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে 'মাসদার' বা শব্দমূল দিয়ে। সুবহা-না [سُبْحَانَ]।

২. ফে'লে মাযি [فَعْلٌ مَّاضِي]। শব্দমূল মা মাসদার থেকেই ফে'ল [فَعْلٌ] বা ক্রিয়া তৈরি হয়। প্রথমে তৈরি হয় ফে'লে মাযি বা অতীতকালবাচক ক্রিয়া। বনী ইসরাঈলের পর তাসবীহ ব্যবহৃত হয়েছে সূরা হাদীদে। এই সূরা শুরু হয়েছে [سَبَّحْ] 'সাব্বাহা' দিয়ে। ফে'লে মাযি। পরের দুই তাসবীহযুক্ত সূরাও সাব্বাহা দিয়ে শুরু হয়েছে। হাশর ও সফ।

৩. মুযারে [مُضَارِعٌ]। জুমু'আ ও তাগাবুন শুরু হয়েছে [يُذَكِّرْ] ইউসাব্বিহ বা ফে'লে মুযারে দিয়ে।

৪. ফে'লে আমর [فَعْلٌ أَمْرٌ]। মুসাব্বিহাতের সর্বশেষ সূরা হলো 'আ'লা'। এটা শুরু হয়েছে [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] 'সাববিহ'। ফে'লে আমর।

কুরআন কারীমের এই তারতীবকে বলা হয় [تَوْفِيقِي] তাওকীফি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত। মানুষের পক্ষ থেকে সূরাগুলোর তারতীব দেয়া হলে, এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা অসম্ভব হত!

ওয়াহদাতুল কুরআন!

বিষয়টা নিয়ে কেউ খুবই বাড়াবাড়ি করেন, আর কেউ একেবারে ছাড়াছাড়ি। ওয়াহদাতুল কুরআন বিষয়টা সহজ ভাষায় বলতে গেলে, পুরো কুরআন কারীম একই সূত্রে গাঁথা, এমন চিন্তা। অর্থাৎ কুরআন কারীমের প্রতিটি সূরার একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটি সূরার প্রতিটি আয়াতই একটা আরেকটার সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। আপাতদৃষ্টিতে যতই খাপছাড়া আর সামঞ্জস্যহীন মনে হোক, কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি সূরার মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সম্পর্কটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

- ক) সূরার শুরুর আয়াত ও শেষ আয়াতের মাঝে সম্পর্ক।
- খ) সূরার এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের সম্পর্ক।
- গ) আগের সূরার সাথে পরের সূরার সম্পর্ক।
- ঘ) আগের সূরার শেষ আয়াতের সাথে পরের সূরার প্রথম আয়াতের সম্পর্ক।



একটা উদাহরণ দেয়া যাক,

সূরা তূর ও সূরা নাজম উভয়টাই মক্কী। উভয় সূরাই শুরু হয়েছে 'কসম' বা শপথ দিয়ে। দুই সূরার মাঝে সম্পর্কের অসংখ্য যোগসূত্র আছে। একটা বলি, -সূরা তূর শেষ হয়েছে, [وَبَارِئُ الْجُودِ] অর্থাৎ তারকারাজির অন্ত যাওয়ার আলোচনা দিয়ে। পাশাপাশি সূরা নাজমের শুরুতেও তারকার অন্ত যাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। [وَالْجُودِ إِذْ هَمَى] তারকার শপথ, যখন তা অন্তমিত হয়।

তবে মনে রাখা দরকার, প্রতিটি সূরার শেষ ও শুরুর যোগসূত্র সূরা তূর ও নাজমের মতো এত সহজ নয়। রীতিমতো গভীর চিন্তা-তাদাক্বুর করে বের করতে হয়।



একটা কথা না বললেই নয়,

-কুরআন কারীম নাযিল হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্যে। ওয়াহদাতুল কুরআনের এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বোঝা সবার জন্য অতটা জরুরী নয়। এটা বড় আলেমদের এলাকা। ওয়াহদাতে কুরআন বিষয়টা যদি এতই জরুরী হতো, সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টাকে আলাদা করে চর্চা করে যেতেন। কিন্তু একদল লোক মনে করেন, ওয়াহদাতে কুরআন বুঝতেই হবে। এটা না হলে কুরআনই বোঝা যাবে না। আমরা বলি, ওয়াহদাতে কুরআন চমৎকার একটা বিষয়।

পাশাপাশি বিষয়টা কঠিন ও জটিল। সবার জন্য এই বিষয় হজম করা সহজ নয়। জরুরীও নয়। যারাই বিষয়টা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের বেশিরভাগই ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। আলেম ছাড়া অন্যদের বিষয়টা নিয়ে মাথা না ঘামানো নিরাপদ।

ইবতিলা

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলেন। এটাকে বলা হয় 'ইবতিলা' [إبتلاء]। মানে পরীক্ষা করা। মূলশব্দ হলো, বালা [بلا]। কুরআন কারীমে 'বালা' শব্দটা দুই অর্থে এসেছে,

ক) বিপদাপদ। মুসীবত।

খ) নেয়ামত। অনুগ্রহ।

তার মানে, আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইবতিলা'টা দু'ভাবেই আসতে পারে। বিপদের মাধ্যমে কখনোবা নেয়ামতের মাধ্যমে। একজন আমাকে গালি দিল বা উস্কানিমূলক বাজে কথা বলল! এটা 'বিপদের' মাধ্যমে ইবতিলা। আমি যদি 'গালিটা' শুনে সবর করতে পারি, তাহলে পুরস্কার।

এখানেই শেষ নয়, আমি যে 'সবর' করতে পারলাম, এটা নেয়ামতের পাশাপাশি, ইবতিলাও হতে পারে। কারণ একটা নেক আমল বা ইবাদত করলে, মনে অহংকার ও আত্মতৃপ্তির একটা ভাব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বা আশংকা সৃষ্টি হয়। সবরও একটা ইবাদত। অনেক সময় ইবাদতের সাথে সাথে অহংকার বা রিয়াও চলে আসে। আমি অন্যের তুলনায় বেশি ইবাদত করতে পারছি, আমি তার চেয়ে ভালো। আরও নানা চিন্তা এসে হানা দেয়।

II

আরেকটা উদাহরণ দেয়া যাক। কিছু লেখা থাকে, কারো কারো পছন্দ হয় না। তখন তারা কী করে? পড়ার পর উস্কানিমূলক মন্তব্য করে। গালি দেয়। আমার করণীয় তখন কী?

-সবর করা। সূরা ফুরকানে গিয়ে আয়াতটা পড়া। আর বলা 'সালাম'!

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

তাদেরকে যখন অজ্ঞরা সম্বোধন করে, তারা বলে 'সালাম'। (৬৩)
দুটলোকের কথার উত্তরে 'সালাম' বলতে পারা একটা ইবাদত। আমি আয়াত মেনে 'সালাম' বললাম। মানে বাজে মন্তব্যকারীকে 'জাহেল' মনে করেই এটা করলাম। পাশাপাশি তাকে অজ্ঞ মনে করে নিজেকে 'জ্ঞানী' ভাবাও নতুন একটা 'ইবতিলা'। সব সময় সতর্ক থাকাই কাম্য।

জাহিলিয়াত

কুরআন কারীম এক আজব কিতাব। কতোভাবে যে কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা যায়! যাক এখন জাহিলিয়াত [الجاهلية] শব্দটা নিয়ে একটু ভাবা যাক। শব্দটা কুরআন কারীমে এসেছে মোট চারবার।

ক) [عُرِيَ الْجَاهِلِيَّةُ] বা জাহেলি যুগের ধ্যানধারণা। কলব বা হৃদয় নষ্ট হলে এমনটা করে থাকে সমাজের মানুষ।

نُزِّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَّاعَسًا بَاطِلًا طَاهَةً مِنْكُمْ وَطَاهَةً قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের মধ্যে কতক লোককে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একটি দল এমন ছিল, যাদের চিন্তা ছিল কেবল নিজেদের জান নিয়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করছিল, সম্পূর্ণ জাহেলি ধারণা। (আলে ইমরান: ১৫৪)

খ) [حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ] জাহেলি যুগের বিধি-বিধান। শাসনব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّخِذُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে? (মায়িদা: ৫০)

গ) [تَبَوَّعَ الْجَاهِلِيَّةِ] জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন। নারীদের নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

নিজ গৃহে অবস্থান করো (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত। (আহযাব: ৩৩)

ঘ) [حَيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ] জাহেলি যুগের অহমিকা। সমাজ নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

কাফেরগণ যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে স্থান দিল, যা ছিল জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর নিজ প্রশান্তি বর্ষণ করলেন। (ফাতহ: ২৬)

□□□□

আয়াতগুলোর দিকে নয়র দিলে, আরও পরিষ্কার হবে বিষয়গুলো। উক্ত চারটা বৈশিষ্ট্য যদি কোনো জাতি বিশেষ করে মুসলিম জাতির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে তাদের মধ্যে

ক) চারিত্রিক গুণাবলী অনুপস্থিত।

খ) আল্লাহর রহমত অনুপস্থিত।

গ) উত্তম স্ত্রীর অপ্রতুলতা।

ঘ) সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

বর্তমানে চারটা বৈশিষ্ট্যই প্রবলভাবে বিদ্যমান। এগুলো একটা জাতিকে 'লাঞ্ছনা', বিভক্তি ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়

ছাতির পিতা

কে কী ভাবলো, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কী আছে? আমার মাথা ঘামানোর বিষয় হলো, আমার রব আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন সেটা? আমার সম্পর্কে কে কী মন্তব্য করলো, বক্তব্য দিলো, সেটা নিয়ে আমার ভাবিত হওয়ার কিছু নেই। আমার ভাবিত হওয়ার বিষয় হলো: আমার 'আল্লাহ' আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন সেটা:

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

ইবরাহীম আ.-মূর্তি ভেঙেছেন। লোকজন খুঁজে বেড়াচ্ছে! কে ভাঙলো মূর্তিগুলো? মাঠ-পর্যায়ের তদন্তে লোকজন বললো:

এক 'যুবককে' দেবদেবীদের সমালোচনা করতে গুনেছি! (আম্বিয়া: ৬০)
সাধারণ মানুষ একজন নবীকে 'যুবক' হিসেবে দেখছে। নগণ্য। অর্বাচীন। অনুল্লেখযোগ্য! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের আলোচনা কিভাবে করলেন?

لَنِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলো একটা জাতি (নাহল: ১২০)

সাধারণ মানুষের কাছে 'অর্বাচীন' যুবকই আল্লাহর কাছে 'একটি জাতি'। একাই একশ। অত্যন্ত প্রিয় 'খলীল'-অন্তরঙ্গ বন্ধু। আল্লাহ তা'আলার মূল্যায়নই মুখ্য। বান্দাদের কে কী বললো-ভাবলো, থোড়াই কেয়ার!

আয়াতের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরও মাপা মাপা। অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন কিছুই অস্তিত্বই কুরআন কারীমে নেই। কুরআন কারীমের আয়াতগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়:

ক: মক্কী (হিজরতের আগে নাযিল হওয়া আয়াত)।

খ: মাদানী (হিজরতের পর নাযিল হওয়া আয়াত)।

কুরআন কারীমে অসংখ্য প্রশ্ন বা প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনা আছে। এই প্রশ্নগুলোকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক: মক্কী আয়াতের প্রশ্ন।

খ: মাদানী আয়াতের প্রশ্ন।

উভয় প্রকার প্রশ্নের আবার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে:

১. মক্কী আয়াতের প্রশ্নগুলো হয় সাধারণত (تكويني) 'তাকবীনি' বা জগত ও সৃষ্টিসংক্রান্ত।

২. মাদানী আয়াতের প্রশ্নগুলো হয় সাধারণত (تمكيني) 'তামকীনি' বা ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত।

তাকবীনি প্রশ্নগুলো আবার পাঁচভাবে হয়েছে:

১. আকদী (عقدي): সংখ্যা, তারিখ বা সময় বিষয়ক। যেমন

يَسْأَلُكَ عَنِ السَّاعَةِ

তারা আপনার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, সেটা কখন সংঘটিত হবে? (নাযিয়াত: ৪২)

২. ইবতালী (ابطالي): বাতিলসূচক। মানে প্রশ্নকৃত বিষয়টা বাতিল। অনৈতিক

وَإِذَا السُّوءُودَةُ سُئِلَتْ

জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাশিশু সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হবে (তাকভীর ৮)

৩. ইস্তিদলালী (استدلالي): দলীল-প্রমাণ চাওয়াসংক্রান্ত।

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন: কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? (আনকাবুত: ২৯)

৪. ই'তেবারী (اعتباري) শিক্ষা ও উপদেশগ্রহণসংক্রান্ত।

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

আপনি তাদের কাছে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জানতে চান। (আরাফ: ১৬৩)

৫. মুহাসাবাহ (محاسبة): হিসাব-নিকাশসংক্রান্ত। দুনিয়াবী আমল সম্পর্কে আখেরাতে জবাবদিহিতা সম্পর্কে।

لَمْ يَسْأَلْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

অতঃপর তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে নিয়ামত সম্পর্কে। (তাকাসুর: ৮)
মাদানী আয়াতগুলোর ধরণ সাধারণত দু'প্রকার:

১. তশরীঈ (تشریعی) বিধি-বিধান, আইন-কানুন বিষয়ক প্রশ্ন।

يَسْأَلُكَ عَنِ الْآيَةِ

তারা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (বাকার: ১৮৯)
২. তারবাভী (تربوي) তারবীয়ত বিষয়ক। আমল-আখলাক বিষয়ক।

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسْأَلُونَ

তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (মায়িদা: ১০১)

কাফেরদের বৈশিষ্ট্য

কুরআন কারীমে কাফিরদের অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যেও থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

সে মিসকীনকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় না। (মাউন: ৩ হাক্কাহ: ৩৪)

হব্ব একই কথা আল্লাহ তা'আলা দুইবার বলেছেন। অবাক করা ব্যাপার! শুধু নিজে খাবার দিলেই হবে না, অন্য সামর্থবানদেরকে খাবার বিতরণে উৎসাহিতও করতে হবে। না করাটাকে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ আকবার! বাঁচার উপায় কী?

বিষয়টা এতদিন মাথাতেই আসেনি! অজ্ঞতাকে এজন্যই কুফুরির নামান্তর বলা হয়েছে। কেয়ামতের দিন না জানাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করা যাবে না:

-আল্লাহ আমি জানতাম না!

-তুই জানলি না কেন? শিখে নিলি না কেন?

আশার কথা হলো, খাবারদানে উৎসাহ না দেয়াটা কাফিরের বৈশিষ্ট্য এটা সত্য। তবে কাফিরের বৈশিষ্ট্য থাকলেই একজন মুমিন কাফির হয়ে যাবে, এমন নয়।

তাই বলে নিশ্চিত-নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও যাবে না। চেষ্টা করতে হবে, গুণটা নিজের মধ্যে সচল রাখতে! যাতে আমার মধ্যে কুফুরের দূরতম বৈশিষ্ট্যও না থাকে!

ইহদি মিডিয়া

আজ আমাদের দরস ছিলো আলে ইমরানের ৭১ থেকে ৯১ আয়াত পর্যন্ত। দ্বিতীয় আয়াতে একটা বিষয় অবাক করলো। ইহদিরা সেকালেও মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলো:

وَقَالَتْ طَلِيقَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَی الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاءَ الْيَوْمَ
وَكَفَرُوا وَالْآخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আহলে কিতাবের একটি দল (একে অন্যকে) বলে:

-মুসলিমদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, দিনের শুরুর দিকে তার প্রতি ঈমান আনবে আর দিনের শেষদিকে তা অস্বীকার করবে! হয়ত এভাবে (করলে) মুসলিমগণ (তাদের দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে!
(আলে ইমরান ৭২)

(এক) প্রাপাগান্ডা (Propaganda): প্রচারণা। ইহদিরা একদল লোক ঠিক করেছিল, তারা দিনের শুরুতে ঈমান আনবে, দিনের শেষভাগে ঈমান ত্যাগ করে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

-এতে লাভ?

-সাধারণ মুসলমানরা এতে বিভ্রান্ত হবে! তারা ভাববে, ইহদিরা জ্ঞানী! পড়াশোনা জানা মানুষ! তারাই যখন এই ধর্ম ত্যাগ করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই এই ধর্ম ঠিক নয়। এভাবে তারা ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালাতে শুরু করেছিল।

(দুই) সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার (Psychological warfare): মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করা। বিপক্ষ দলকে মানসিকভাবে দুর্বল করার এ-যুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম। ইহদিরা ভেবেছিল, তারা ইসলাম ত্যাগ করলে, মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যাবে।

(তিন) কোল্ড ওয়ার (Cold War): শীতল যুদ্ধ। ইহদিরা সেই শুরু থেকেই কুরআনের বিরুদ্ধে লেগে ছিল। তারা নিত্যনতুন ফন্দি আঁটতো। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে চাপে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, সবই করতো। তারা একটা 'চাল' দিতো, আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে সেটা বানচাল করে দিতেন। এভাবেই ইহদিরা মদীনা থেকে বহিষ্কার হওয়া পর্যন্ত পায়তারা চালিয়ে গেছে! এখনো থেমে নেই।

(চার) সিক্রেট ওয়ার (Secret War): গোপন যুদ্ধ। তারা গোপনে মদীনার অভ্যন্তরে ও বাইরে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। এমনকি ঈমান আনা ও

ত্যাগ করা নিয়েও ছিনিমিনি খেলতো। গোপনে নিরীহ মুসলমানদের প্রভাবিত করতে চাইত।

(পাঁচ) এসপিয়োনাজ (Espionage): গুপ্তচরবৃত্তি। নবীজির দরবারে তারা স্পাই পাঠাতো। নানাবিধ বিব্রতকর প্রশ্ন করে নবীজিকে নাজেহাল করার প্রয়াস চালাতো।

(ছয়) ডিভাইড এন্ড রুল (Divide and rule): ভাগ করো শাসন করো। তারা আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে যা যা করা দরকার, তার কিছুই করতে কসুর করতো না। আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যেও তারা হানাহানি লাগাতো। মুনাফিক নামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রতিষ্ঠানই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল।

(সাত) রিউমার (Rumour): গুজব। কিছুদিন পরপরই তারা গুজব ছড়াতো। সাধারণ নিরীহ মুসলিম নারীদের সম্পর্কে অশ্লীল কবিতা লিখে মদীনার বাজারে ছেড়ে দিতো!

(আট) মিডিয়া (Midia): প্রচারমাধ্যম। তারা শুধু মদীনাতেই নয়, মক্কা ছাড়িয়ে আরব উপদ্বীপের বাইরেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিল। মক্কার কাফিরদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজ তারা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথেই করতে পেরেছিল! হুয়াই বিন আখতাব! উম্মুল মুমিনীন সাফিয়াহ রা.-এর পিতা। লোকটা ধুরন্ধর ইহুদি নেতা। বদরের পর, মক্কায় গিয়ে কেঁদেকেটে একসা হয়ে, মক্কার নেতৃবৃন্দকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। ওহদ যুদ্ধের অন্যতম অনুঘটক হিশেবে কাজ করেছে তার সেই অপতৎপরতা!

(নয়) কনস্পিরেসি (Conspiracy): ষড়যন্ত্র করা ইহুদিদের মজাগত অভ্যেস। মুসা আ.-এরও আগে, সেই ইউসুফ আ.-এর সময় থেকেই তাদের এই প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখা গিয়েছে! শেষমেষ পন্টিয়াস পিলেটকে দিয়ে ঈসা আ.-এর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড জারী করিয়েছিল। আমাদের নবীজির বিরুদ্ধে যে তারা কতো কতো ষড়যন্ত্র করেছে, তার ইয়ত্তা নেই!

(দশ) এসাসিনেশন (Assassination): তারা নবীজির বিরুদ্ধে একাধিক বার গুপ্তহত্যার 'এটেম্পট' নিয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ইহুদিকন্যার দেয়া বিষের প্রভাব নবীজি মৃত্যুশয্যাতে টের পেয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। যাতনা ভোগ করেছেন। আর আগে অসংখ্য নবীকে হত্যার কথা নাইবা বললাম! তাদের খবরিসির কথা বলে শেষ করা যাবে না! আজকের দরসে পঠিত '২০টা আয়াতই ইহুদিদের নানা শয়তানি নিয়ে অলোচনায় ভর্তি!

সতর্কতা

আমাকে সব সময় একজন দেখছেন। আমি একা নই। আমি নিঃসঙ্গ নই। আমি যেখানেই থাকি, এক মহান সত্তার কাছে আমার কোনও কিছুই গোপন নেই।

وَمَا سُفْطٌ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

একটি গাছের পাতা বরে পড়লেও সেটা তিনি জানেন। (আনআম: ২৯)

কী আশাব্যঞ্জক কথা! কী ভীতিজাগানিয়া সতর্কবানী!

আমি লিখছি, সেটা তিনি জানেন।

আমি পড়ছি সেটা তিনি জানেন।

আমি গোপনে 'কিছু' করছি, সেটা তিনি জানেন।

আমি মনোকষ্টে আছি, সেটা তিনি জানেন।

আমি অর্থকষ্টে আছি, সেটা তিনি জানেন।

আমি রোগে ভুগছি, সেটা তিনি জানেন।

আমি পাপচিন্তা করছি, সেটা তিনি জানেন।

আমার সন্তান নেই সেটা তিনি জানেন।

আমার বাড়ি-ঘর নেই সেটা তিনি জানেন।

আমার রব সব জানেন। সুতরাং আমার এত চিন্তা কিসের?

সিয়াম কিতাল

কিছু বিধান আছে কুরআন কারীমে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমরা একটাকে গুরুত্ব দেই আরেকটাকে অবহেলা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كَيْفَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ

তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। (বাকারা: ১৮৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كَيْفَ عَلَيْكُمْ الْقِيَالُ

তোমাদের ওপর কিতাল ফরয করা হয়েছে। (বাকারা ২১৬)

আমরা প্রতি বছর রমযানে রোজা রাখার জন্য তোড়াজোড় করি! কতো কতো প্রস্তুতি গ্রহণ করি! এমনকি অনেকে নফল রোজাও বেশ গুরুত্বের সাথে রাখি! কিতাল করা তো দূরের কথা, আমরা আজ কিতালকে চিন্তাতেও স্থান দিই না। অথচ সীরাত বলে, নবীজি সা. ও সাহাবায়ে কেরাম সিয়ামের চেয়ে কিতালেই বেশি সময় দিয়েছেন।

أَفْتَوُْمُنُونَ بِبَغْضِ الْكِتَابِ وَتُكْفُرُونَ بِبَغْضِ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান রাখো আর কিছু অংশের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করো? (বাকার: ৮৫)

যুক্তি দেয়া হয়:

না না, অবিশ্বাস করতে যাবো কেন, বিশ্বাস তো করি, তবে আমল করি না! করতে পারি না! সুযোগ বা হিম্মত হয় না!

অথবা বলা হয়, সিয়াম শরীয়তের রোকন। স্থায়ী বিধান। কিতাল হল সাময়িক বিধান। আরও নানা যুক্তি। যুক্তি দিতে দিতে কিতাল যখন ফরয হয়ে যায়, তখনো সেই আগের গড়িমসি অবস্থাই বিরাজমান থাকে।

তখন আর এখন! পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টে গেছে! ওলট-পালট হয়ে গেছে! আয়াতটা একটু পড়ি:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْلَمُوا

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْشًا إِلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

সে সকল লোকেরও কোনো গুনাহ নেই, যাদের অবস্থা এই যে, আপনি তাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করবেন, যখন এই আশায় তারা আপনার কাছে এলো, আর আপনি বললেন:

আমার কাছে তোমাদেরকে দেয়ার মতো কোনো বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মতো কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেলো যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। (তাওবা: ৯২)

আমরা সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী বানাতে চাই? তারা নবীজি সা.-এর কাছে ঘোড়ার বায়না ধরতেন! জিহাদে যাবেন বলে। নিজে কেনার সামর্থ্য না থাকার কারনে! কালের নির্মম পরিহাস!

সেকালে অশ্বারূঢ় ছিলো পর্যাপ্ত, ছিলো না শুধু অশ্ব!

একালে অশ্ব আছে পর্যাপ্ত, নেই শুধু অশ্বারূঢ়!

সংখ্যার জয়

বেশি হলেই ভালো, এমন চিন্তা সবসময় সঠিক নয়। সংখ্যা বেশি দেখলেই আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আশপাশ থেকেও বলা হয়:

-সবাই করছে! কাজটা খারাপ হলে এতগুলো মানুষ সেটা করতো?

কুরআন কারীমের দিকে একটু তাকিয়ে দেখি। তিলাওয়াত করতে গেলে একটা বাক্য চোখে পড়ে:

(أَكْثَرُ النَّاسِ) অধিকাংশ মানুষ।

খতিয়ে দেখার বিষয় হলো, যেখানেই এই শব্দবন্ধটা এসেছে, তারপরেই সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দ (বাক্য) ব্যবহৃত হয়েছে:

তারা জানে না। (لَا يَعْلَمُونَ)

তারা গুরুরিয়া আদায় করে না। (لَا يَشْكُرُونَ)

তারা ঈমান আনে না। (لَا يُؤْمِنُونَ)

বেশি বোঝানোর জন্য সর্বণামযুক্ত ব্যাক্যও ব্যবহার করা হয়েছে
(أَكْثَرُهُم) তাদের অধিকাংশ।

এরপর সাধারণত কী বলা হয়েছে?

ফাসিক। পাপাচারী। (فَاسِقُونَ)

তারা জানে না। অজ্ঞ। (يَكْفُلُونَ)

সত্যবিমুখ। উপেক্ষাকারী। (مُفْرِضُونَ)

তারা বোঝে না। (لَا يَعْقِلُونَ)

তারা শোনে না। (لَا يَسْمَعُونَ)

ওপরের আলোচনা থেকে এই উপসংহারে আসা ঠিক হবে না:

-বেশি হলেই খারাপ! সংখ্যা বেশি, হকের ওপরও আছেন, এমনটাও হয়।
কুরআন কারীমেই এর প্রমাণ আছে। এতো গেলো সংখ্যাধিক্যের কথা।
কিন্তু অল্প আর স্বল্প নিয়েও আলোচনা আছে। ভালোদের সংখ্যা কোনো কোনো
সময় অল্প হয়ে থাকে।

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার লোক অল্প। (সাবা: ১৩)

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

বন্দিত অল্পসংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছে। (হুদ:৪০)

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের
মধ্য হতে। (ওয়াকিয়া: ১৩-১৪)

تَرْتَوْنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

আব্রাহাম তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন
বিষয়ে। তখন কী হলো?

-পরে তোমাদের মধ্য হতে অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকী সকলে সেই
প্রতিশ্রুতি থেকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (বাকারা: ৮৩)

فَلَمَّا كَبِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

বনী ইসরাঈল বললো, আমাদের জন্য একজন রাজা ঠিক করে দিন। আমরা তার নেতৃত্বে লড়াই করবো। তখন কী হলো?

-অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হলো, তাদের মধ্যকার কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে পেছনে ফিরে গেলো। (বাকার: ২৪৬)

فَتَرَوْا مِثْلَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

ইহুদিরা বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধে রওয়ানা দিলো। পথে একটা নদী পড়লো। সবাইকে নিষেধ করা হলো নদী থেকে পানি পান না করতে। কী হলো:

তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলে নদী থেকে পানি পান করলো। (বাকার: ২৪৯)

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে। (বাকার: ২৪৯)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

অধিকাংশ শরীকদারই অপর শরীকের প্রতি জুলুম করে। ব্যতিক্রম কি নেই? আছে:

ব্যতিক্রম কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।
কিছু তারা বড় কম। (সোয়াদ: ২৪)

لَا تُخِشِكُمْ دَرَيْكُهُ إِلَّا قَلِيلًا

শয়তানকে সিজদা করতে বলা হলো। সে অহংকার করে আদেশ অমান্য করলো। উল্টো মানুষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে, আল্লাহর কাছে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইল! কেন?

আমি অবশ্যই তার বংশধরদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলের চোয়ালে লাগাম পরিয়ে দেব। (বনী ইসরাঈল: ৬২)

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন: -তুমি হকের পথ অবলম্বন করো। এ-পথে পথিকের সংখ্যা কম দেখে, চিন্তিত হয়ো না। তুমি বাতিলের পথ পরিহার করে চলো। এ-পথে পথিকের সংখ্যাধিক্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না।

শেষকথা: হক হলেই কম হবে, বাতিল হলে সংখ্যায় বেশি হবে, এটা নিরংকুশ কোনো বিষয় নয়। হক হয়েও সংখ্যায় বেশি হতে পারে, আবার বাতিল হয়েও

বেশি হতে পারে। হক হয়েও সংখ্যায় বেশি হয়েছে, এমন প্রমাণ কুরআনেও অঅছে।

ইস্তিগফারের যোগ্যতা

অপরাধ আমরা করিই! অপরাধ না করে থাকতে পারে, এমন মানুষ আছেন তবে সংখ্যায় কম। গুনাহ করা ইবলিসের বৈশিষ্ট্য। গুনাহ না করা ফিরিশতার সিফাত। আমরা একসাথে উভয় সিফাত বা বৈশিষ্ট্যই ধারণ করি। এক সময় এক বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে প্রাধান্য পায়। কখনো ফিরিশতার বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়, কখনো ইবলিসের! অপরাধ বা গুনাহ করার পর আমাদের দুই অবস্থা হয়: ক: আদমের অবস্থা!

খ: ইবলিসের অবস্থা।

ইবলিস অপরাধ করার পর কী করেছিল? অহংকার করেছিল। নিজের দোষ স্বীকার না করে, উল্টো আল্লাহর দিকে অভিযোগের তীর ছুঁড়েছিল:

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

ইয়া রব! আপনিই যেহেতু আমাকে গোমরাহ করেছেন...। (হিজর ৪০)
পক্ষান্তরে আদম আ. কী করেছিলেন? তিনি আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত নতজানু হয়েছিলেন। দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিনীত ভঙ্গিতে! কাঁচুমাচু হয়ে বলেছেন:

رَبِّ اظْلَمْنَا نُفُوسًا

ইয়া রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। (আরাফ: ২৩)
বড় অসহায় ভঙ্গিতে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এমন কাতর 'ইস্তেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) বড় বেশি পছন্দ করেন! আসলে ইস্তেগফার করতে পারা আল্লাহ তা'আলার বড় এক নেয়ামত! আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে এক অমূল্য উপহার! বলাবাহুল্য এটাই বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন! এই ইস্তেগফারের মাধ্যমেই বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করবে।

তাওবা

তাওবা সবার জন্য। পাপীর জন্য তাওবা যেমন জরুরী, তাপীর জন্যও জরুরী। মুমিনদের জন্য আরো বেশি জরুরী! তাওবা করার কথা ভাবলে মনে হয়, এটা বুঝি গুনাহগারের জন্য!

উহু! তাওবা সবার জন্য! কুরআন এমনটাই বলে:

تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهَا الْمَوْءُؤَاتُ

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই তাওবা করো। (নূর: ৩১)
তাওবার ফলাফলও বলে দেয়া হয়েছে:

لَكُمْ تَفْلِحُونَ

তাহলে তোমরা সফলকাম হবে!

আমিও একজন মুমিন! আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাওবা করতে বলেছেন। তাওবার জন্য হুজুরের কাছে যেতে হবে না। ওজু লাগবে না। কাজের ফাঁকে ছোট্ট করে একবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলাও 'তাওবা'! খুবই সহজ কাজ! দিনে এমন তাওবা হাজারবারও করা যায়! তবে সত্যিকার তাওবার করতে হলে, অতীতের গুনাহের জন্য অনুশোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আর গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকা জরুরী।

মুবাহালা

কিছু সংবাদেব জন্য বড়ো অধীর হয়ে অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিছু বিষয়ে জানার আগ্রহ তীব্র হয়ে থাকে। মুবাহালাহ (مُبَاهَلَة) তেমন একটা বিষয়। কুরআন কারীমে (بَهْل) শব্দমূলটা মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী বা কুরআন কারীমের শব্দগুলোর অর্থ আমরা কয়েকভাবে শিখতে পারি।

ক: প্রচলিত অর্থ। যা তরজমা করার সময় করা হয়ে থাকে।

খ: একেবারে মৌলিক অর্থ। যে অর্থে প্রাচীন আরব বেদুইনরা শব্দটা ব্যবহার করতো।

মৌলিক অর্থ জানার জন্য উত্তম হলো: ইবনে ফারেসের মাকাসিসুলুগাহ (مَقَاسِيسُ) কিতাবটা দেখা। এ-কিতাবে শব্দের মূল অর্থটা দেয়া থাকে। (بَهْل) এ-শব্দের মৌলিক অর্থ তিনটা: খালি করা। দু'আ। পানির স্বল্পতা।

কুরআন কারীমে শুধু দ্বিতীয় অর্থটাই পাওয়া যায়: দু'আ।

অবশ্য ড. হাসানাইন মাখলুফ তার 'সাফওয়াতুল বায়ানে' বলেছেন: (بَهْل) অর্থ 'না'নত' বা অভিশাপ।

মুবাহালা মানে: একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে ধ্বংসের বদদোয়া করা। ধরা যাক দু'দলই মনে করছে 'আমরাই হক'। মীমাংসা করার আর কোনো উপায় নেই! তখন মুবাহালা করা হয়ে থাকে। নবীজি সা.-ও একবার মুবাহালার আস্থান করেছিলেন। নাজরানের খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে। খ্রিষ্টানরা ভয়ে উপস্থিত হয়নি। এ-ছাড়াও ইসলামী ইতিহাসেও বেশ কিছু মুবাহালার ঘটনা পাওয়া যায়। মুবাহালার আয়াতটা পড়া যাক:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

আপনার কাছে (হযরত ঈসা আ.-এর ঘটনা সম্পর্কে এসে আমরা সকলে মিলে (আল্লাহর সামনে) কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত পাঠাই। (আলে ইমরান: ৬১)

মৌলিক অর্থ 'দু'আ বা লা'নত হলেও, ব্যবহারিক পর্যায়ে এসে শব্দটার অর্থ হয়ে গেছে: কাকুতি মিনতি করা। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা।

জীবন ও পানি

জীবনটা পানির মত (الحياة كماء)। একে অপরের সমার্থক। রাবেব কারীম পার্থিব জীবনকে পানির সাথে তুলনা করেছেন। কেন?

১: কারন পানি এক জায়গায় স্থির থাকে না। জীবনও এক অবস্থায় জমে থাকে না। পরিবর্তন (تقلب) হতেই থাকে।

২: পানি গড়িয়ে যায়, স্থির থাকে না। দুনিয়াবী জিন্দেগীও এক সময় ফুরিয়ে যায়, বাকী থাকে না।

৩: পানিতে নামলে কেউ না ভিজে থাকতে পারে না। দুনিয়ার জীবনেও কেউ পরীক্ষা-ফিতনায় না জড়িয়ে থাকতে পারে না।

৪: পানির পরিমাণ যদি পরিমিত থাকে, তাহলে সেটা হয় উপকারী, উৎপাদনশীল। পানির পরিমাণ সীমা ছাড়ালেই, সেটা হয়ে পড়ে ক্ষতিকর। ধ্বংসাত্মক। দুনিয়াবী জিন্দেগীও তাই। প্রয়োজন পরিমাণ হলে, উপকারী, অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়লেই শেষ! আখেরাত বরবাদ!

আয়াতখানা পড়া যাক:

وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের এই উপমা পেশ করুন: তা পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। (কাহফ: ৪৫)

কুরআনি প্রেরণা

কুরআন কারীম সব সময় আশার কথা বলে। মানুষকে উৎসাহ জোগায়। প্রেরণা দান করে। শুধু তাই নয়, নিরাশ হতে কড়াভাবে নিষেধ করে:

১: (لَا تَقْنَطُوا) তোমরা নিরাশ হয়ো না (যুমার:৫৩)

২: (لَا يَحْزَنُوا) তোমরা হীনবল হয়ো না (আলে ইমরান ১৩৯)

৩: (لَا تَحْزَنُوا) তোমরা চিন্তিত হয়ো না (আলে ইমরান: ১৩৯)

৪: (لَا يَأْسُوا) তোমরা নিরাশ হয়ো না (ইউসুফ: ৮৭)

কুরআন কারীমে মাঝেমধ্যে যে ভয় দেখানো হয়েছে, তা করা হয়েছে বান্দাকে আল্লাহর ক্ষমার প্রতি আশাবাদী করে তুলে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্যে।

মিসর

এক মিসরিকে প্রশ্ন করা হলো:

-আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হলে কী করবেন?

-আমি প্রথমেই কায়রো বিমান বন্দরে চলে যাবো!

-সেখানে কী করতে যাবে?

-বিমান বন্দরে একটা আয়াত লেখা আছে

اُخْلُوا مِصْرَإِ شَاءَ اللّٰهُ آمِينَ

(ইউসুফ বললেন)! আপনারা সকলে মিশরে প্রবেশ করো!

ইনশাআল্লাহ, আপনারা (এদেশে) নিরাপদে (স্বস্তিতে) থাকবেন।

(ইউসুফ: ৯৯)

কিন্তু সিসির দুঃশাসনে মিসর এখন অনিরাপদ আর অস্বস্তিকর দেশে পরিণত হয়েছে! উক্ত আয়াত বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নয়!

-তাহলে?

-আরেকটা আয়াত লিখে দেবো!

-কোন আয়াত লিখবেন?

-এজন্য উপযুক্ত আয়াতও কুরআন কারীমে আছে:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

মূসা ভীতাবস্থায় পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে (মিশর) নগর ছেড়ে হয়ে পড়ল। বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালেম সম্প্রদায় (তখন ফিরআওন বর্তমানে সিসি ও তার বাহিনী)-এর কবল থেকে রক্ষা করো। (কাসাস: ২১)

মধ্যপন্থী উম্মত

ইসলাম ধর্মে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। জোর-যবরদস্তি নেই। তবে আমাদের বুকের ঘাটতির কারনে, ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ বিধানকেও অনেক সময় বাড়াবাড়ি মনে হয়। কুরআন কারীমে আমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত (أُمَّةٍ وَسَطًا) বলা হয়েছে।

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسِيلًا

(হে মুসলিমগণ)! এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। (বাকার: ১৪৩)

সূরা বাকারায় আছে ২৮৬টি আয়াত। ঠিক মাঝামাঝি আয়াতে আছে ‘মধ্যপন্থী’ উম্মতের কথা। (وَسِيلًا) অর্থ মধ্যভাগ। কুরআন কারীমের প্রতিটি লাইনে এমন বিস্ময় লুকিয়ে আছে। কোনো মানুষের রচনা হলে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকে লক্ষ্য রাখা দুরূহ ব্যাপার হতো!

সাকীল কুরআন।

সাকীল (ثَقِيلٌ)। সাকীল অর্থ ভারী। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে (قَوْلًا ثَقِيلًا) ‘গুরুভার বাণী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন:

يُنْزِلُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছি এক গুরুভার বাণী। (মুযাশ্বিল: ৫)

সাকীল বা ভারী মানে কি ‘ওজনে’ ভারী? একমণ দুইমণ এমন? জ্বি না, ব্যাপারটা তা নয়। যুফাসসিরীনে কেরাম এখানে দুটি দিক তুলে ধরেন:

এক. অর্থ ও গুরুত্ব ও দায়িত্বের দিক থেকে ভারী। কুরআন কারীম প্রচার করা ও কুরআনী বিধানকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব অনেক ভারী আর ওজনদার। যেমন তেমন করে এ-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যারা এ-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে, তাদের জীবন আর দশজনের মতো হালকা হবে না। হওয়া চলবে না। পাশাপাশি কুরআন কারীমের বাণীগুলো হবে গভীর অর্থবোধক। হালকা কোনো আলোচনা এখানে নেই।

দুই. কুরআন কারীমের শক্তি ও দৃঢ়তা অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত। শত্রুরা কুরআন কারীমকে মিটিয়ে দিতে হাজারো প্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের যাবতীয় চক্রান্তকে নস্যাৎ করে, কুরআন কারীম আরো সুদৃঢ়ভাবে আসন পাকা করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যারাই কুরআনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, অতি দ্রুত তারা হাওয়ায় উবে গেছে। বিলীন হয়ে গেছে কালের গর্ভে!

গারুর-গুরুর।

কুরআন কারীমে কোনো সমার্থ শব্দ নেই। কাছাকাছি অর্থের শব্দ আছে, হুবহু একই অর্থ ধারণকারী শব্দ নেই। কুরআন কারীমের প্রতিটি শব্দের নিজস্ব অর্থ

রয়েছে। প্রতিটি অক্ষরের আলাদা অর্থ রয়েছে। এমনকি প্রতি হরকত (যদর
যের পেশ)-এরও নিজস্ব উদ্দেশ্য রয়েছে।
দুটি শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টা সামান্য হলেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
গুরু (الْعُرُو)। ধোঁকা। এটা মাসদার।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُو

পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। (হাদীদ: ২০)
গারুর (الْعُرُو)। ধোঁকাবাজ। শয়তান।

فَلَا تُغْنِيكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنِيكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُو

সূতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে
না পারে এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান)-ও যেন আল্লাহর
ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে। (লুকমান: ৩৩)
গারুর মানে ধোঁকাবাজ হলো শয়তান। শয়তানের কাজই হলো মানুষকে
'গুরুরে' ফেলা। গুরুরই হলো শয়তানের অস্ত্র:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا عُرُو

(প্রকৃতপক্ষে) শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয়, তা ধোঁকা ছাড়া
কিছুই নয়। (নিসা: ১২০)
একটা হরকত বদলের সাথে সাথে অর্থও বদলে গেলো। অথচ বাকী সবকিছুই
এক!

মাকাম-মুকাম।

দেখতে এক হলেও কিন্তু এক নয়। সামান্য একটা হরকতের পরিবর্তনের কারণে
অর্থ বদলে যায়। মাকাম (مَقَام) দাঁড়ানোর স্থান। ইসমুয় যরফ, স্থানবাচক
শব্দ।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। (বাকারা:
১২৫)

মাকামে ইবরাহীম একটা পাথরের নাম। পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আ.
কাবা নির্মাণ করেছিলেন। 'মাকাম' শব্দটা কুরআন কারীমে ১৪ বার ব্যবহৃত
হয়েছে।

মুকাম (مَقَام) মাসদারে মীমি। মীমযুক্ত মাসদার। অর্থ: ইকামত বা অবস্থান
করা। পুরো কুরআন কারীমে শব্দটা ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

حَسْبُكَ الْمُسْتَقْرَّاءُ وَمَقَامُهَا

অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিশেবে তা (জান্নাত) অতি উত্তম। (ফুরকান: ৭৬)

তবে মুকাম যেমন মাসদার হতে পারে, তদ্রূপ যরফও হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
মাকাম শব্দটা নিয়েও একই কথা।

আট মাজরুর!

সূরা ফাতিহার শুরুতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রথম তিন আয়াতে কোনো ফেয়েল (ক্রিয়া) নেই। আয়াতে বর্ণিত সব শব্দই ইসম (বিশেষ্য)। প্রথম ইসম (الْحَمْدُ) মারফু' হয়েছে। মানে শেষ হরফ 'দাল'-এর ওপর 'পেশ' হয়েছে। এরপর একাধারে আটটা ইসমই 'মাজরুর' হয়েছে:

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

এখানে 'লিল্লাহ থেকে শুরু করে দ্বীন পর্যন্ত সর্বমোট ৮টা ইসম। সবগুলোই মাজরুর! এটা কুরআন কারীমের এক আশ্চর্যজনক বর্ণনাসৌকর্য! আরবী না জানলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করা অসম্ভব!

ইব্রি কারীব!

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ভালোবাসেন। বান্দার কাছাকাছি থাকেন। বান্দাকে দেখে দেখে রাখেন। চোখে চোখে রাখেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(হে নবী)! আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায়, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন), আমি এত নিকটে যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি। (বাকারা: ১৮৬)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্নিহিত থাকেন। তিনি এটা করেন আমাদের প্রতি দয়াবশত। আমাদের সন্নিহিত তার থাকার কী দরকার? তার কোনো দরকার নেই। আমাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করেই এমনটা তিনি করেন। এটা তার অনুগ্রহ! করুণারই বহিঃপ্রকাশ।

আয়াতে এ-কথাই প্রকাশ পায়: আমরা সার্বক্ষণিকভাবে তার শ্রবণসীমায় আছি। তার দৃষ্টিসীমায় আছি। তার জ্ঞানের সীমায় আছি। তার প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় তত্তাবধানে আছি। তার রক্ষণাবেক্ষণে আছি। আমাদের ছেড়ে তিনি কোথাও যান না। আমাদেরকে একাকী ছেড়ে দেন না। আমাদেরকে তিনি শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেন না।

আমি আল্লাহর সাথে আছি, আল্লাহ আমার সাথে আছেন। এই বোধটুকুর অনুভব সবার এক মাপের হয় না। যার যার নিজস্ব তাকওয়া অনুসারে হয়। যিনি যত বেশি মুস্তাকী, তিনি ততবেশি আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করেন। এই অনুভূতি বান্দার মনে নিশ্চিন্তি ও প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। এই অনুভূতি দেয়। বিপদে, হুমকি-ধমকিতে মানসিক নিরাপত্তা দেয়। আত্মবিশ্বাসের যোগান যোগায়। আল্লাহ সাথে আছেন, এই অনুভূতি অর্জন করতে হয় চর্চা করে করে। চেষ্টা করে করে। আল্লাহর কাছে তাওফীকের জন্য দু'আ করে করে।

আশাপূর্ণ আয়াত

আবু বাকর রা. সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন:

-আমি পুরো কুরআন কারীম (বারবার) তিলাওয়াত করেছি। অত্যন্ত আশা জাগানিয়া একটা আয়াত পেয়েছি:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِرَةٍ

আপনি বলে দিন, প্রত্যেকে নিজ-নিজ পন্থায় কাজ করছে। (ইসরা: ৮৪)

শা-কিলাতুন (الكل) অর্থ: রীতিনীতি। স্বভাব। পন্থা।

বান্দার স্বভাব হলো (العصيان) অবাধ্যতা করা।

আল্লাহ তা'আলার (অন্যতম) সিফাত হলো (الغفران) ক্ষমা করা।

স্বভাবদোষে যত অবাধ্যতাই করি, রাব্বের কারীম নিজস্ব সিফাতগুণে ক্ষমা করে দিবেন। এমনটা ভেবে মন বড় আশাবাদী হয়ে ওঠে!

সুম্মা-সান্মা

হরকত পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে।

সুম্মা (سُمَّى) অর্থ, অতঃপর। তারপর।

সুম্মা একটি হরফে আতফ। সুম্মার পরে উল্লেখ হওয়া বিষয়টি কিছুটা বিলম্বে ঘটে। উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হতে পারে:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا فَلَا يَكْفُرُ تَبِعُكُمْ تُؤْمِنُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا فَلَا يَكْفُرُ تَبِعُكُمْ تُؤْمِنُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا فَلَا يَكْفُرُ تَبِعُكُمْ تُؤْمِنُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا فَلَا يَكْفُرُ تَبِعُكُمْ تُؤْمِنُونَ

তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিশ্চিণ অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। (বাকারা: ২৮)

খেয়াল করলে দেখা যাবে, জীবনের প্রতিটি ধাপের মাঝে কালগত দূরত্ব আছে।
সুন্না হরফটা সেই বিলম্ব বা দূরত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সাম্মা (سَمَاءٌ) অর্থ: সেখানে। ওখানে।

এটা ইসমুল ইশারা। ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য।

مَطَاعٌ تَرَامِينُ

যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে আমানতদার। (তাকবীর: ২১)
দেখতে একই। কিন্তু পেশের কারণে হরফ আর যবরের কারণে 'ইসম' হয়ে
গেছে। কুরআন কারীম এমন শব্দ অনেক।

কলব

কলব (الْقَلْبُ) অর্থ হৃদয়। কুরআন কারীমে বিশ প্রকারের কলবের কথা বলা
হয়েছে। আটটা কলব সালীম সুস্থ। বাকী বারটা কলব অসুস্থ। বিকৃত।

(১): (الْقَلْبُ الْحَنِيفُ): অনুগত বিনম্র কলব। প্রশান্ত সুস্থির। পরিতুষ্ট। আল্লাহর
তা'আলা প্রতি সমর্পিত। আল্লাহর কিতাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। শয়তানের
প্ররোচনায় কান দেয় না। ফলাফল?

فَتَخِيتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ

এবং তাদের অন্তর হকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। (আলহাজ: ৫৪)

(২): (الْقَلْبُ الْكَافِرُ): সুস্থ অন্তর। নিখুঁত হৃদয়। একনিষ্ঠ হৃদয়। কুফর নিফাক ও
নীচু মানসিকতাবিবর্জিত হৃদয়।

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে সে মুক্তি
পাবে। (শু'আরা: ৮৯)

(৩): (الْقَلْبُ الْغَائِبُ): আল্লাহ অভিমুখী হৃদয়। সব সময় আল্লাহর কথা স্মরণ
করে। তাওবা করে। আল্লাহর আনুগত্যের ওপর জীবন যাপন করে।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁকে না দেখেই এবং আল্লাহর দিকে
রুজুকারী অন্তঃকরণ নিয়ে আসে। (ক্বফ: ৩৩)

(৪): (الْقَلْبُ الْوَجِلُ): ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়। ভয় কাজ করে, আল্লাহ যদি তার আমল
কবুল না করেন! যদি আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে না পারে?

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

এবং যারা যে-কোনো কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। (মুমিনুন: ৬০)

(৫): (القلب المتقّي) মুত্তাকী হৃদয়। আল্লাহর ভয়ে ভীত হৃদয়। আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে শ্রদ্ধা করে। সম্মান করে।

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

এসব বিষয় স্মরণে রেখ। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত হয়। (হজ: ৩২)

(৬): (القلب العاقل) হিদায়াতপ্রাপ্ত হৃদয়। আল্লাহ যা ফয়সালা করেন, তাতে সম্মত থাকে। নিজের সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিত থাকে। বিপদে অস্থির হয় না।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন। (তাগাবুন: ১১)

(৭): (القلب الظمئ) নিশ্চিত হৃদয়। আশ্বস্ত হৃদয়। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে পরম স্বস্তি বোধ করে। আশ্বস্ত হয়। আল্লাহর যিকিরে শান্তি পায়।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই প্রশান্তি লাভ হয়। (রাদ: ২৮)

(৮): (القلب الحي) জীবন্ত হৃদয়। সজাগ সচল হৃদয়। আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বোঝে। উপলব্ধি করে। অনুধাবন করে। কুরআনে বর্ণিত বিগত কওমগুলোর ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়।

لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত কর। (ক্বফ: ৩৭)

(৯): (القلب الرئس) অসুস্থ হৃদয়। মনে নানা চিন্তা সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে। পাপাচার প্রবৃত্তির পূজা আসন গেঁড়ে আছে। নিফাক ঢুকে আছে। হারামের প্রতি লিপ্সা আছে।

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّهُنَّ أَتَّخِذْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও, যদি তোমরা
তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না,
পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর
তোমরা বলো নয়সঙ্গত কথা। (আহযাব: ৩২)

(১০): (القلب الأعمى) অন্ধ হৃদয়। চোখের সামনে হক থাকলেও দেখতে পায়
না। শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না।

فَأَنَّهُمْ لَا تُغْمِ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَغْمِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে
বিরাজ করে। (হজ: ৪৬)

(১১): (القلب اللاهي) উদাসীন হৃদয়। কুরআন কারীমের ব্যাপারে উদাসীন।
দুনিয়া নিয়ে মশগুল। বাতিল নিয়ে লিপ্ত। প্রবৃত্তি পূজায় ব্যস্ত। সত্যকে
উপলব্ধি করার ব্যাপারে অনীহ।

لَا مِيَّةَ قُلُوبُهُمْ

তাদের অন্তর ফজুল কাজে মগ্ন থাকে। (আম্বিয়া: ৩)

(১২): (القلب الآثم) পাপাসক্ত হৃদয়। হকের পক্ষে সাক্ষ্যকে গোপন করে।

وَلَا تُكْسِمُوا الشَّهَادَةَ ۖ وَمَن يَكْسِفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلُوبُهُ

আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে তা গোপন করবে সে
পাপী মনের ধারক (বাকার: ২৮৩)

(১৩): (القلب المتكبر) অহংকারী হৃদয়। আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস করতে তার
অহংকারে বাধে। আনুগত্য করতে মনে অহমিকা জাগে। প্রবল প্রতাপে
জুলুম করে। সীমালঙ্ঘন স্বেচ্ছাচার করে বেড়ায়।

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْتَبِرٍ جَبَّارٍ

এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর
মেলে দেন (গাফির: ৩৫)

(১৪): (القلب الغيظ) রূঢ় হৃদয়। দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই।

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَيِّظًا لَّانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ

আপনি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত। (আলে ইমরান: ১৫৯)

(১৫): (القلب العتور) মোহরাঙ্কিত হৃদয়। হিদায়াতের কপা শোনেও না।
গুনলেও বোঝে না।

وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

এবং তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। (জাসিয়া: ২৩)

(১৬): (القلب الفاسي) কঠোর হৃদয়। ঈমানের জন্য কোমল হয় না। কোনো
হুমকি-ধমকি তাতে প্রভাব ফেলে না। আল্লাহর যিকিরকে উপেক্ষা করে।

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

ও তাদের অন্তর কঠিন করে দেই। (মায়িদা: ১৩)

(১৭): (القلب العاقل) গাফেল হৃদয়। আল্লাহর যিকিরে বাধা দেয়। আল্লাহর
আনুগত্যের ওপর নাফসের আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়।

وَلَا تَطْغَى مِنْ أَغْثَأِ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا

এমন ব্যক্তির কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ
থেকে গাফেল করে রেখেছি। (কাহফ: ২৮)

(১৮): (القلب الأغلف) অবরুদ্ধ হৃদয়। আবদ্ধ হৃদয়। আবৃত হৃদয়। রাসুলের
কথা প্রবেশ করে না।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

আর এসব লোক বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। (বাকারা: ৮৮)

(১৯): (القلب الرائي) বক্র হৃদয়। বিচ্যুত হৃদয়। হক থেকে সরে থাকে।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা মুতশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে
পড়ে থাকে। (আলে ইমরান: ৭)

(২০): (القلب الغريب) ঘোরতর সন্দেহে নিপতিত হৃদয়। দিশেহারা হয়ে
হাবুডুবু খাচ্ছে।

تُضَايِتْ أَيْنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَلَّتْ قُلُوبُهُمْ فَمَهْمُ فِي رَبِّهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ

আপনার কাছে অনুমতি চায় তো তারা, যারা আল্লাহ ও মেষ দিবসে
ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত এবং তারা
নিজেদের সন্দেহের ভেতর দৌল্যমাণ। (তাওবা: ৪৫)

এখন দেখার বিষয় হলো, আমার হৃদয় কোন ভাগে পড়েছে। আমার হৃদয় কি ভালো? অনুগত? বিনয়ী?

দায়ী

আল্লাহ তা'আলা নবীজি সা.-কে চমৎকার এক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(হে নবী!) আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ করুন আর অজ্ঞদের দিকে ক্রক্ষেপ করবেন না।
(আ'রাফ: ১৯৯)

দাওয়াত দিতে গেলে, নানা কটুক্তি শুনতে হয়। অজ্ঞ জাহেল হিংসুক মুনাফিকদের টিপ্পনির লক্ষবস্তুতে পরিণত হতে হয়। একজন দায়ীকে এসব জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলাই কর্তব্য। এটাই আল্লাহর দেয়া শিক্ষা। নবীওয়ালা আদর্শ।

দায়ী যখন দাওয়াত দিবেন, তার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। এই প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে সাধারণত দু'ধরনের:

- ১: ইস্তেফহাম (اِسْتِفْهَامٌ)। জানার জন্য প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তা সত্যি সত্যি জানতে চায়। এক্ষেত্রে দায়ীর কর্তব্য হলো, সুন্দর করে উত্তর দেয়া। সাধ্যানুযায়ী।
- ২: ইস্তেহকার (اِسْتِحْكَارٌ)। অবজ্ঞাসুলভ প্রশ্ন। দায়ীকে খোঁচা দেয়া জন্য, অপমান করার জন্য, উত্তেজিত করার জন্য প্রশ্নগুলো করা হয়। দায়ীকে এসব প্রশ্ন এড়িয়ে চলা উচিত। কুরআন কারীমে বোধ হয় এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জুলুমের শাস্তি

জুলুম করে কেউ কখনো পার পায় না। আগে হোক পরে হোক, শাস্তি পেতেই হয়। তবে জালিমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কর্মনীতিটা সাধারণত চারটা ধাপে সমাপ্ত হয়। ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে।

১. (الإمهال والإمهال) অবকাশ বা টিলপ্রদান। জুলুম করলে সাথে সাথে ধরে বসেন না। শাস্তি দিয়ে দেন না। জালেমকে অবকাশ দেন। তাওবার সুযোগ দেন। জুলুম থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন,

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল বড় শক্ত। (কালাম:৪৫)

২. (الرَّاسِخُونَ) ধীরে ধীরে পাকড়াও। ধীরে ধীরে পাকড়াও করার অর্থ এই নয়, জ্বালমকে আল্লাহ আস্তে আস্তে সংকটে ফেলে ফেলে ধরবেন। তাকে ফাঁদে ফেলে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ তা'আলা তার সামনে দুনিয়াকে খুলে দিবেন। তাকে পদে-মদে পুরুষ্ট করে তুলবেন। তার সামনে নানা সুখ-শান্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে দিবেন। সে যা চায়, তাই দিবেন। তার চাওয়ার বাইরেও অনেক কিছু দিবেন। কারণ (ج) শব্দমূলের মধ্যেই ক্রমোন্নয়নের ভাব নিহিত আছে।

سَنُذَرِّجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমাগত (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবেন না। (কলম: ৪৪)

৩. (الرَّيْبِ) সজ্জিতকরণ। শয়তান সুযোগটার সদ্ব্যবহার করবে। সে জ্বালমকে আরো ফুসলাবে। উত্তেজিত বিভোর করে তুলবে। মন্দকে সুন্দর করে দেখাবে। জ্বালিমের কলব পুরোপুরিই মরে যাবে:

وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ

শয়তান তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, তাদের কার্যকলাপ খুব ভালো। (নামল: ২৪)

৪. (الْأُخْدُ) পাকড়াও। চূড়ান্ত পর্যায়ে আর সুযোগ থাকে না। জ্বালম তখন তার মদমস্তে বিভোর।

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, আপনার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর ধরা অতি মর্মস্পর্কিত, অতি কঠিন। (হুদ: ১০২)

তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ পড়লে অনেক অনেক উপকার! কিন্তু তাহাজ্জুদ না পড়লে কী ক্ষতি? প্রথম ক্ষতি: (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) এবাদুর রহমান। রহমানের বান্দারা। তাহাজ্জুদগুজার মুমিনগণকে আল্লাহ 'এবাদুর রহমান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহাজ্জুদ না পড়লে, এই দলভুক্ত হওয়া যাবে না:

الَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনো) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনো) দন্ডায়মান অবস্থায়। (ফুরকান: ৬৪)

দ্বিতীয় ক্ষতি: (الْمُتَّقِينَ) মুত্তাকীন উপাধি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

لِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَنْشَارِ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ

মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর থাকবে.....!
তারা রাতে খুবই কম ঘুমাত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত। (যারিয়াত: ১৫-১৮)

তৃতীয় ক্ষতি: (الْقَائِمُ وَأُولُو الْأَلْبَابِ) কানিত (অনুগত বিন্দু ইবাদতগুজার) ও জ্ঞানের অধিকারী এই দুই অসাধারণ লকব থেকে বঞ্চিত হওয়া।

أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
তবে কি (একরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোর ইবাদত করে, কখনো সিজদাবস্থায়, কখনো দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বলুন, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে। (যুমার: ৯)

চতুর্থ ক্ষতি: বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান হারানো।

لِيَسْوَءَ وَءٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
(তবে) কিতাবীদের সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যেই এমন লোকও আছে যারা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত, যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সিজদাবনত হয়। (আলে ইমরান: ১১৩)

পঞ্চম ক্ষতি: নেক আমল দ্বারা মন্দ আমল দূর করার সুযোগ হাতছাড়া হওয়া।

এই সুযোগ লাভের অন্যতম শর্ত হলো, রাতের কিছু অংশে কিয়াম করা:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

এবং (হে নবী!) দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কয়েম করুন। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ। (হুদ: ১১৪)

ষষ্ঠ ক্ষতি: মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান না পাওয়া।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ نَافِلَةً لَّكَ عَمَّا أَتَتْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا

রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বেন, যা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছাবেন। (বনী ইসরাঈল: ৭৯)

সপ্তম স্ক্রটি: আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকৃত বিশেষ রেযা বা সম্ভটি অর্জন করতে না পারা।

وَمِنَ آثَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

(হে নবী!) আর আপনি রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সম্ভটি হয়ে যান। (তুহা: ১৩০)

অষ্টম স্ক্রটি: কিয়ামকারীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ আছে, সেটা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَزَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ

আর ভরসা রাখুন মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহর)-এর প্রতি, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (ইবাদতের জন্য) দাঁড়ান। এবং দেখেন সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার যাতায়াতকেও। (শু'আরা: ২১৭-২১৯)

অন্তত দুই রাকাতও কি সম্ভব নয়? ইচ্ছা করলে অবশ্যই সম্ভব।

দানের পার্বক্য

একজন কৃপণের দান আর দানশীলের দান এক রকম হতে পারে না। একজন বড় মনের মানুষের দান আর ছোট মনের মানুষের দান এক রকম হতে পারে না। মূসা দলবল নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন:

فَأَضْرَبَ لَهْمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ رَسًا

তারপর তাদের জন্য সাগরের ভেতর শুকনো পথ তৈরি কর। (তুহা: ৭৭)

প্রমত্ত নীলনদ হাজার হাজার কিউসেক পানি নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। খালি হাতে এমন নদী পার হওয়ার কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রবাহকে স্থির করে দিলেন। নদী হয়ে গেলো দু'ভাগ। এবার পার হওয়া সহজ হয়ে গেলো।

নদীর তলদেশে কাদা-পলি থাকার কথা। সেটাই স্বাভাবিক। তবে তো পানি বন্ধ হলো। কিন্তু আল্লাহ কাদাও থাকতে দিলেন না। একেবারে খটখটে শুকনো। হাঁটতে কোনো বেগই পেতে হবে না।

বড়রা যা দেন পরিপূর্ণ চাহিদা মিটিয়েই দিয়ে থাকেন। একটু দিয়ে বাকিটুকুর জন্য আরেকজনের কাছে হাত পাতার সুযোগ রেখে দেন না। একটাক দিলে সারাদিন ঘারে ঘারে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেন না।

-আমি যত বেশিই দেই, সে ভিক্ষা করবেই!

-সেটা তার ব্যাপার! আমি নিজের অবস্থানে 'কারীম' (মহান) হতে পেরেছি তো?

আল্লাহর সুনান।

আমরা বুঝি আর না বুঝি, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বকে পরিচালনা করেন কিছু সূনান (নিয়ম)-এর আওতায়। কুরআন কারীম খেয়াল করে তিলাওয়াত করলে, সূনানগুলো চোখে পড়ে। সূনানগুলো স্থির, অকম্প! অনমনীয়! অপরিবর্তনীয়! রাসুল হাকীম নিজেই বলে দিয়েছেন:

اِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَخْلِهِ فَمَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا
سُئْتُ الْأَوْلِيْنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

আপনি কিছুতেই আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেন না! এবং আপনি আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনো টলতেও দেখবেন না। (ফাতির: ৪৩)

তেমনি একটি সূনান হলো:

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُقْتَلَوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُ وَمَنْ يَخْلُ فَلَيْسَ بِمُخْلٍ
عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَسْلَوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
أَمْثَلَكُمْ

তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের স্থানে অন্য কোনো সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না। (মুহাম্মাদ: ৩৮)

এর সমর্থনে আরেকটু পড়তে পারি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَتَفَرَّوْا وَيَعَذِّبُكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَقْرَؤُا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদেরকে বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাও? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখ), আখেরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যত্নগাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (তাওবা: ৩৮-৩৯)

আরও ব্যাপক পরিসরেও আল্লাহ তা'আলা ধমকির সুরে বলেছেন:

إِن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَتُيَاهَا النَّاسُ وَنَاتٍ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী হতে) নিয়ে যেতে পারেন এবং অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এ বিষয়ে পূর্ণ সক্ষম। (নিসা: ১৩৩)

মালিমশাহী

বিশ্বের যেসব দেশের শাসক এখন ফেরআওনের মতো প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে, তাদের জন্য একটা কুরআনী ব্যবস্থাপত্র। আমরা এখানে শুধু কুরআনের আলোকে ভাবটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِعِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَلِظُونَ
অতঃপর ফির'আওন শহরে শহরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিল। (এই বলে যে) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল) ছোট্ট একটা দলের অল্পকিছু লোক। নিশ্চয়ই তারা আমাদের প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে
(ও'আরা ৫৩-৫৫)

ফির'আওন নিজের ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে বলেছিল: -আরে বিরোধীদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। তারা দেশের ক্ষুদ্র একটা দল। জনগণ তাদের সাথে নেই। আমরা উন্নয়ন করছি, দেশ ও দশ আমাদের সাথেই আছে। বিরোধী দলের ছালাও পোড়াও মনোভাব আমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করেছে। তাদেরকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নেই। ইসলামপন্থীদের দুর্বীর আন্দোলন আমাদের তখতে শাহীতে ধাক্কা দিয়েছে। সুতরাং রাতের আঁধারে তাদের নির্মূল করে দাও।

সন্তান লাড

সন্তান না থাকলে, সন্তানের জন্য দু'আগুলো পড়া। সন্তান থাকলে তাদের ভালোইয়ের জন্য দু'আগুলো পড়া।

১: প্রথম দু'আ:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে কোনো পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী। (আলে ইমরান ৩৮)

২: দ্বিতীয় দু'আ,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে) হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। (ইবরাহীম ৪০)

৩: তৃতীয় দু'আ,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান করুন নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। (ফুরকান ৭৪)

৪: চতুর্থ দু'আ,

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে যে নি'আমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা করুন। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আহকাফ ১৫)

৫: পঞ্চম দু'আ,

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

হে আমার রব্ব! আমাকে একা রেখে দিও না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। (আযিয়া ৮৯)

৬ : এটা কোনো দু'আ নয়। আয়াতটা পড়ে, রাব্বের কারীমের কাছে আবদার জুড়তে পরি, ইয়া রাব্বা, আমাকেও এদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন,

جَنَّاتٍ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

(অর্থঃ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (আর বলতে থাকবে) তোমরা (দুনিয়াতে) যে সবার অবলম্বন করেছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতই না উৎকৃষ্ট পরিণাম। (রাদ ২৩-২৪)

দস্তক সন্তান

সন্তান হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা-তদ্বির করা হয়েছে। যে যা বলেছে, শুনেছে। শেষে এতিমখানা থেকে একটা ছেলে দস্তক নিয়ে নিঃসন্তান দম্পতি। কিছুদিন পর আল্লাহ তাদেরকে একটা সন্তান দান করলেন। নিজের সন্তান পেয়ে 'দস্তক' সন্তানকে' ভুলে গেল। ফিরিয়ে দিয়ে এল আগের এতিমখানায়! ভুলে গেছে কুরআনকে!

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

সূতরাং যে এতিম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না। (দুহা ৯)
ওধু কি মৌখিক দুর্ব্যবহারই আয়াতের উদ্দেশ্য? উহু! ইয়াতীমের সামনে নিজের সন্তানকে আদর করার সময়ও খেয়াল রাখা চাই, ছেলেটার মনে তার বাবা বা মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে না তো!

গুনাহ মাফ

শত চেষ্টার পরও গুনাহ হয়েই যায়। রাব্বের কারীমও ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। এতে আমার মত সাধারণ মুমিনের হয়েছে পোয়াবারো। গুনাহ করে ফেললেও ক্ষমা পাওয়ার আশা থাকে। গুনাহ হয়ে গেলে কাটা দেয়ার সুযোগও রাব্বের গাফুর রেখেছেন।

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। (হুদ ১১৪)

পাপ (الْمُنْكَرَاتِ) মিটিয়ে ফেলতে চাই?

দুই রাকাত ইশরাক, দুই রাকাত তাহিয়াতল মসজিদ, একপৃষ্ঠা তিলাওয়াত, দশটা টাকা সাদাকা হতে পারে এন্টিপাপ (الْمُنْكَرَاتِ) পুণ্য।

পিচ্ছিল পথ

কিছু গুনাহ থাকে বিপদজনক। কিছু গুনাহ বর্ষার দিনের মত। পিচ্ছিল পথে হাঁটতে গিয়ে আচানক পিচ্ছিল খেয়ে পড়ে যাই। কিছু গুনাহও হঠাৎ করে হয়ে যায়। সতর্ক থাকার পরও মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান সওয়ার হয়ে বসে। বাঁচার উপায় কি? আশা আছে? জ্বি আছে,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

উভয় বাহিনী পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্থলনে লিপ্ত করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু। (আলে ইমরান ১৫৫)

রাক্বের কারীম সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বলা হয়েছে। কিছু সাহাবী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গিয়েছিলেন।

রাক্বের কারীম তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আমিও যদি আচানক পাপ করে ফেলি, তিনি ক্ষমা করেই দেবেন। আমার কাজ হল, ভবিষ্যতে এমন আচানক পিচ্ছিল খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ করা। রাক্বের কারীমের কাছে পানাহ চাওয়া।

বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটা গান শুনে ফেলেছি, একটা ছবি দেখে ফেলেছি? একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ফেলেছি? একটা গীত করে ফেলেছি? বাবা-মায়ের সাথে কটুকথা বলে ফেলেছি? স্ত্রীর সাথে রাগের মাথায় দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি? স্বামীর সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করে ফেলেছি?

আমার পেয়ারা রব ক্ষমার পসরা সাজিয়ে রেখেছেন। আমার কাজ হল, আবার উঠে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পিচ্ছিল খেয়ে মাটিয়ে লেপ্টা মেরে পড়ে থাকব কেন?

উদ্ধার

আমরা নানা বিপদে পড়ি। রাব্বের কারীমই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার পাওয়ার কারন খুঁজতে গিয়ে আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমাদের কারো কারো বক্তব্য কুরআনী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সাধারণত দু'ধরনের বক্তব্য এসে থাকে,

- ক. ঘরটা ভূমিকম্পরোধী ছিল, তাই ভূকম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ১০-এর ওপরে থাকলেও কিছু হয় নি। ভাগ্যিস ঘরের প্রকৌশলী দক্ষ ছিল।
- খ. আজ ফজরের সালাত পড়াতে বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। কাল সাদাকা করাতেই বিপদটা কাছে ঘেঁষতে পারেনি। বাবা-মায়ের দোয়া ছিল বলেই বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

কিছু কুরআন কারীম বক্তব্যটা কিভাবে প্রকাশ করতে বলে?

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সালিহকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম। (হুদ ৬৬)

তাহলে আরেকটা প্রকার হবে,

- গ. আমি আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেছি।
- এটাই বলব। আল্লাহর রহমতই আমাকে বাঁচিয়েছে।

যুবকদল!

কাহফের যুবকেরা ঈমান বাঁচাতে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। দেশে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা চেষ্টা করেও টিকতে পারেনি। তাদের সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়েছিল,

إِنَّهُمْ فَتْنَةٌ أَمْتُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে উৎকর্ষ দান করেছিলাম। (কাহফ ১৩)

পুরো ঘটনা পড়ে কয়েকটা বিষয় সামনে এল,

- ১ঃ দীর্ঘদিন পর দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- ২ঃ অত্যাচারী রাজা মারা গিয়েছিল। দেশে সুবিচার ফিরে এসেছিল।
- ৩ঃ যুবকদল তখন না থাকলেও, তাদের একটা প্রভাব দেশে ছিল। সবাই তাদের কথা বলাবলি করত।

- ৪ঃ দেশে যখন দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় (التمكن الانتصار) এল, তখন যুবকদল উপস্থিত ছিল না।
- ৫ঃ তার মানে, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। দীর্ঘদিন পরে হলেও, এর প্রভাব প্রকাশিত হবে।
- ৬ঃ সংগ্রাম করে টিকতে না পারলে, আপোষ না করে সাময়িক পিছু হটা যেতে পারে।
- ৭ঃ পরবর্তীদের আমলের সওয়াব আগে মেহনত করে যাওয়া সাথীরাও পেতে থাকবে।
- ৮ঃ আমি মেহনত শুরু করেছি, আমিই চূড়ান্ত সাফল্য দেখে যেতে পারব, এমনটা নাও হতে পারে।
- ৯ঃ ময়দান ছেড়ে পিছু হটা মানে পরাজয় নয়। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়।
- ১০ঃ মেহনত সামান্য পরিমাণে হলেও, মেহনতের প্রভাব আল্লাহ তা'আলা টিকিয়ে রাখেন। শত বছর পরে হলেও, তার প্রভাব প্রকাশ করেন।

সাকীনাহ

মনে খুউব অশান্তি যাচ্ছে? ঘরে বাইরে নানা সংকট এসে ঝোঁকে ধরেছে? চতুর্দিক থেকে বিপদেরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে?

তাহলে সাকীনাহ (سَكِينَة) প্রয়োজন। সাকীনাহ অর্থ প্রশান্তি। সুস্থিরতা। প্রশমন। কুরআন কারীমে শব্দটা সর্বমোট ছয়বার এসেছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রহ. একটা আমল করতেন। যখনই দুশ্চিন্তা এসে ভর করত, মনটা অশান্ত হয়ে উঠত, দু'জনেই 'সাকীনাযুক্ত' আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে শুরু করতেন। ইয়াকীনের সাথে। গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে। মনোযোগের সাথে। বুঝে বুঝে। আয়াতের বরকতে, তাদের মনের যাবতীয় যাতনা, কষ্ট দূর হয়ে যেত। কলবে একটা আরাম আরাম ভাব বিরাজ করতে শুরু করত। এবার তাহলে আয়াতগুলো একবার পড়ি?

(১): প্রথম আয়াত।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّكُمْ مُّؤْمِنِينَ

তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালুতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তির উপকরণ এবং মুসা ও

হাফুয যা-কিছু রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ রয়েছে। ফিরিশতাগণ সেটি বয়ে আনবে। তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে, তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে। (বাকারা ২৪৮)

(২) দ্বিতীয় আয়াত।

لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল। (তাওবা ২৬)

(৩) তৃতীয় আয়াত।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তোমরা যদি তার (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তারা কাফেরগণ তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হেয় করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবা ৪০)

(৪) চতুর্থ আয়াত।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَشِهَ جُنُودَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাদের ঈমানে অধিকতর ঈমান যুক্ত হয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (ফাতহ ৪)

(৫) পঞ্চম আয়াত ।

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের
নিচে তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু
ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের ওপরে
অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করলেন
আসন্ন বিজয়। (ফাতহ ১৮)

(৬) ষষ্ঠ আয়াত ।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

কাফেরগণ যখন তাদের অহমিকাকে স্থান দিল, যা ছিল জাহেলী
যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের ওপর নিজ
প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে
রাখলেন আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল।

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞান। (ফাতহ ২৬)

পড়তে ইচ্ছা না হলে, জোর করে পড়তে হবে। অমুখের মত। মন সুস্থির হওয়া
পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে। পড়েই যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ মন ঠিক হবেই হবে।

সদাচ্ছত্র

আমি অসুস্থ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছি। মমতাময়ী মাতা, প্রাণাধিকা
স্ত্রী, কলিজার টুকরা সন্তান আমার জন্য পেরেশান। তার ব্যাকুল হয়ে দিনরাত
সেবায়ত্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ? এক সময় তাদেরকে বিশ্রামে যেতে হয়।
খেতে যেতে হয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে হয়। ঘুমুতে যেতে হয়।
কিন্তু আমার রাব্ব কারীম?

لَا تَأْخُذْهُ يَغَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

তাঁর কখনো তন্দ্রা পায় না এবং নিদ্রাও নয় (বাকারাহ ২৫৪)

আমার চরম কষ্টের সময়, অত্যন্ত প্রিয়রাও একসময় ঘুমিয়ে পড়বে।
কিন্তু আমার প্রিয় রব তখনো জেগে থাকবেন। আমাকে দেখবেন। সঙ্গ দেবেন।
সুস্থ করবেন।

শোকর

সুদিন এলে দুর্দিনের বন্ধুদের ভুলে যাওয়া কারো কারো স্বভাব। কষ্টে পড়ে
ঠেকায় আল্লাহকে ডাকে, তুষ্ট থাকলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষেরও অভাব
নেই। সুখের দিনে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়,

نُفْعَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক নি'আমত। যারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন
করে আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি। (কামার ৩৫)

আলোচনা চলছিল নূহ আ.-এর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে। নূহ ও তার ঈমানদার কণ্ঠস্বরের
একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি শোকর আদায় করা। শোকর
আদায় করার কারণেই তারা প্লাবন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

فَتَجِدُنَا فِي سَحَابٍ مَّرْكُومٍ

তাদেরকে আমি সাহরীর সময় রক্ষা করেছিলাম। (কামার ৩৪)

সুদিনে শোকরগুজার থাকলে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে, দুর্দিনে
আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে উদ্ধার করবেন।

আসমায়ে হসনা

আমি কি রাব্বের কারীমের নামগুলো জানি? কুরআন কারীমে বর্ণিত (الْأَسْمَاءُ)
চমৎকার নামগুলো? প্রিয় রবকে চিনতে হলে, নামগুলো ভালো করে
জানা দরকার তো! এটা ঈমানের দাবি। রাব্বের কারীমকে তার সুন্দর সুন্দর নাম
ধরে ডাকা জরুরী। সব সময় এক নামেই কেন ডাকি? তার আরও কত নাম
আছে!

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেই সব নামেই ডাকবে।

(আ'রাফ ১৮০)

এই আয়াতে সুন্দর নামগুলো ধরে ডাকার হুকুম কর হয়েছে। আমি কি হুকুমটা
সচেতনভাবে কখনো পালন করেছি?

হে রক্ষাকর্তা (الْمَلِكُ)! আমাকে রক্ষা করুন।

হে শান্তিদাতা (السَّلَامُ)! আমাকে শান্তিদান করুন।

হে পবিত্রতার অধিকারী (الْقُدُّوسُ)! আমাকে সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র
করে দিন।

সততা

সালেহ (الصَّالِح) মানে সৎ। সালাহ (الصَّالِح) মান সততা। সততা বলতে আমি কী বুঝি?

-মিথ্যা বলে না। ঘুষ খায় না। সুদ খায় না। ধোঁকা দেয় না। বাবা-মায়ের অনুগত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুরআন কারীমে সালাহ বা নেককারের ব্যতিক্রমী এক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান করুন, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সাফফাত ১০০)

ইবরাহীম আ. দু'আ করলেন। রাব্বের কারীম তার খলীলের দু'আ জবাব কিভাবে দিলেন?

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

ইবরাহীম আ. চেয়েছেন 'সালাহ' সন্তান। তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা একজন সহনশীল (حَلِيمٍ) সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। তার মানে সহনশীলতা হল সততার সর্বোচ্চ পর্যায়। আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাকে কিছু দান করেন, তিনি সবচেয়ে সেরাটাই দিয়ে থাকেন। খলীলকেও সেরা সন্তান দান করেছেন। তিনি সততার সর্বোচ্চ ধাপ 'সহনশীলতা'র অধিকারী পুত্র দান করেছেন।

আমি নিজেকে সৎ দাবি করি, আমি কি হালীম? সহনশীল? কারো কটুকথায় চট করে চটে যাই? কেউ খোঁচা মেরে কথা বললে, তেতে উঠি? গালি দিলে মনে মনে ফুঁসতে থাকি?

-তাহলে কিন্তু আমি যতই নামাজ-কালাম পড়ি, সুদঘুষমুক্ত জীবন যাপন করি, আমি এখনো শতভাগ সালাহ নই। সৎ নই। আরও সৎ হওয়ার অবকাশ আছে।

রবের কৃতজ্ঞতা

আজকের যে আমি, জন্মের সময় কি সে আমি ছিলাম? দুনিয়া চিনতাম? পরিবেশ চিনতাম? টাকা-পয়সা চিনতাম? ভালোমন্দ বুঝতাম?

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। (নাহল ৭৮)

তিনি আমাকে সৃষ্টি করেই রেখে দেননি। নানা নেয়ামতে ভূমিত করেছেন,
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন।
এত নেয়ামত পেয়ে আমার করণীয় কী?

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

আমি কি শোকর আদায় করছি? চোখের জন্য? কানের জন্য? কলনের জন্য?
বুদ্ধি-বিবেকের জন্য? বাড়ি-গাড়ির জন্য? জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য?

কন্যাসন্তান

কন্যা সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। কন্যা সন্তান বাবা-মায়ের জন্য
'দায়' নয়। কন্যা পরিবারের 'গলগ্রহ'ও নয়। কিন্তু জাহেলি যুগে এমনটাই মনে
করা হতো। বর্তমানে সভ্য সমাজেও কোথাও কোথাও এই জাহিলিয়াত
বিদ্যমান আছে। কুরআন কারীম বলছে,

وَإِنَّا بَشَرٌ أَخَذْنَاهُم بِالْأُنْثَىٰ ۖ ظَلٌّ وَجْهَةٌ مُّسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেয়া হয়,

তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়, এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট

হয়। (নাহল ৫৮)

কন্যাসন্তান জন্ম নেয়াকে সুসংবাদ বলা হয়েছে। আমি কেন সুসংবাদকে
শোকসংবাদ মনে করব? লজ্জার কারণ মনে করব? এটা তো চরম জাহিলিয়াত!

আয়াত

কুরআন কারীম আয়াতে ভরপুর। আয়াত মানে 'নিদর্শন'। পৃথিবী যেমন আল্লাহ
তা'আলাকে চেনার মাধ্যম, কুরআনের 'আয়াতসমূহ'ও তাকে চেনার মাধ্যম।
পৃথিবীর পথে পথে হাজারো নিদর্শন। কুরআনের প্রতি ছত্রে ছত্রে আছে রবকে
চেনার নিদর্শন। কখনো দেখা মেলে মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে
গেছে। কখনো দেখা মেলে মুহাম্মাদ সা.-এর অঙ্গুলিহেলনে চাঁদ বিখণ্ডিত!
কখনো দেখা মেলে জিনেরা সুলাইমানের বশীভূত হয়ে আছে! কখনো দেখা
মেলে শক্ত লোহা দাউদের হাতে মোমের মতো গলে যাচ্ছে! এসব আপাত
অসম্ভব কাজ কে করেছেন?

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

তুমি কি জান না, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন? তুমি কি জান না, আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই? (বাকারা ১০৬-৭)

যিনি এত কিছু করেছেন, এখনো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি কি আমার সামান্য কষ্ট, রোগ, অসুবিধা দূর করতে পারেন না? তবে কেন এত হতাশা? কেন এত দীর্ঘ তপ্তশ্বাস?

বন্ধু আমার

উত্তম সঙ্গী-সাথী থাকা ভালো। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করলে অনেক অনেক সময় নানা সংকট দেখা দেয়। পদে ও বয়েসে বড় হতে হতে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা দিন দিন কমে আসতে শুরু করে। অথচ এই সময়টাতেই বন্ধুর বেশি প্রয়োজন। মানুষ যত বড়ই হোক, অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভূমিকা অনস্বীকার্য,

ثَانِيَانِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

দুই জনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (তাওবা ৪০)

পেছনে মক্কার কুরাইশ। সামনে পাহাড়বেষ্টিত মরুপথ। উপায়সূত্র না দেখে গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। নবীজি সা. ও আবু বাকর রা.। আবু বাকর উদ্বিগ্ন ছিলেন। নবীজির নিরাপত্তা নিয়ে। নবীজি তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

বড় হয়ে গেলেও, কোমল হৃদয়ের, উষ্ণ ভালোবাসার অধিকারী সঙ্গী থাকা আবশ্যিক। যে হবে গভীর চিন্তার অধিকারী। উন্নত চরিত্রের ধারক। সুখে-দুঃখে সমব্যথী। সতীর্থ।

ভালোবাসি

কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে, তাকে সে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দেয়া সুন্নাহ। নবীজি সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে এই সুন্নাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতো গেলো নবীজির সুন্নাহ। নবীজির আদর্শকে যদি সুন্নাহ বলি, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা রীতিনীতিকে বলতে পারি 'সুন্নাহ' বা 'ফিতরাহ'। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চমৎকার এক শিক্ষা দিয়েছেন,

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ইয়া'কুব বললেন, আমি সত্যর আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করব। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (ইউসুফ ৯৮)

ইয়াকুব আ. সন্তানদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। কারো জন্য দু'আ করলে, কারো কল্যাণ কামনা করলে, আগে থেকে তাকে জানিয়ে দেয়া, কুরআনী সুন্নাহ। এই সুন্নাহ পালনের অসংখ্য উপকারিতা আছে। যার জন্য দু'আ করার আশ্বাস দেবো, তার মনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সে অপরাধ করলে, তাওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। ভালো কাজে উৎসাহ পাবে। দু'আকারীর প্রতি সুধারণা বৃদ্ধি পাবে। শ্রদ্ধা মহব্বত সৃষ্টি হবে।

বিভিন্ন পথ

আমার মধ্যে বহু বক্রতা থাকতে পারে। বহু ভ্রান্তি থাকতে পারে। অসংখ্য বিচ্যুতি থাকতে পারে। অনেক অসঙ্গতি থাকতে পারে। এসব থেকে বাঁচার সহজ উপায় কি?

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল। (ইসরা ৯)

কুরআন কারীম তিলাওয়াত করলে, কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করলে, আমি সরল (أَقْوَمُ) পথ পেয়ে যাবো। আমার আখলাক বিভূক্ত হয়ে যাবে। আমার ভাষার পরিমার্জন হয়ে যাবে। আমার জীবন সুখময় হয়ে যাবে। আমার হৃদয় হকের ওপর অবিচল হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

সুন্দর ও সৌন্দর্য

আল্লাহ তা'আলা সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কুরআন কারীমেও তিনি তার সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভার

বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে। (আ'রাফ ৩১)

মসজিদে কেন যাই? সালাতের জন্য। সালাতের প্রস্তুতিতে পোশাকের সজ্জা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরিহার্য্যও বলা চলে। পরিধেয় পোশাকই বলে দেবে, আমি সালাতকে কতটা গুরুত্বের সাথে নিয়েছি। মসজিদে আমরা যাই, আল্লাহর সাথে বিশেষ সাক্ষাত করতে। রবের সামনে, রবের ঘরে যাওয়ার সময় পোশাকের শোভাকে গুরুত্ব না দিলে, আর কখন দেব?

আপন কষ্ট

কষ্টের কথা সবাইকে বলে বেড়ানো ঠিক নয়। সবাই কষ্টের মর্ম বুঝবে না। ভুল মানুষকে কষ্টের কথা বলতে গেলে উল্টো কষ্ট আরো বাড়ে,

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوسُفَ

এবং (একথা বলে) সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগল, আহা ইউসুফ! (ইউসুফ ৮৪)

সন্তানরা এসে ইউসুফের হৃদয়বিদারক সংবাদ দিল। ইয়াকুব আ. শোকে মুষড়ে পড়লেন। তবুও ছেলেদের সামনে শোকবাক্য প্রকাশ করলেন না। একপাশে সরে গেলেন, ছেলেদের থেকে দূরে। তারপর হাহাকার ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ও ইউসুফ রে!

আশেপাশের সব মানুষই আমার সমব্যথী হবেন, এমন নয়। লোক বুঝে, চরিত্র চিনে মনের অর্গল খুলতে হবে। নইলে আমি মনের দুঃখ প্রকাশ করব, আর সে মুখ টিপে হাসবে অথবা মনে মনে হাসবে।

সবরে আইয়ুব

কুরআন কারীমে নবীগণের আলোচনা করা হয়েছে। এক নবীর আলোচনায় একেক রঙ। আইয়ুব আ.-এর আলোচনার মুখ্য বিষয় সবর (الصبر)। আল্লাহ তা'আলার তার সবরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نُّعَمِّرُ الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ

বস্তুত আমি তাকে পেয়েছি একজন সবরকারী। (সোয়াদ ৪৪)

আইয়ুব আ. ছিলেন সবরের অনন্য প্রতীক। তার সবরের প্রশংসা করে একটু পরেই বলা হয়েছে,

نُعَمِّرُ الْعَبْدَ

সে ছিল অতি উত্তম বান্দা!

তিনি কি শুধু সবরই করতেন? তার সবরের কারণেই প্রশংসা করা হয়েছে? জি না, আরো একটা বিষয়,

إِنَّهُ أَوَّابٌ

প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী।

আইয়ুব আ.-এর ঘটনার আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। মানুষের দু'টি বৈশিষ্ট্য।

ক. আবেদ। ইবাদতকারী।

খ. আলেম। ইলম অর্জনকারী। জ্ঞানী।

উভয়ের জন্যই এ-ঘটনায় শিক্ষার উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আলাদা আলাদা করে উভয়কে শিক্ষা গ্রহণ করার তাকিদ দিয়েছেন।

১: আবিদকে উপদেশ,

وَذَكِّرْ لِلْعَابِدِينَ

এবং (আইয়ুবের ঘটনা থেকে) ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা। (আম্বিয়া ৮৪)

২: আলিমকে উপদেশ,

وَذَكِّرْ لِلْأُولَى الْأَنْبَابِ

এবং (তার ঘটনায় রয়েছে) বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (সোয়াদ ৪৩)

ঈমানী সম্মান

ঈমানদার ও বেঈমান এক নয়। আলেম ও জাহেলও এক নয়। সামাজ ও ধর্ম উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা সত্যসিদ্ধ।

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে,

আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (মুজাদালা ১১)

আল্লাহ তা'আলা যে সম্মানের আশ্বাস দেন, তার চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? শুধু সম্মান নয়, অন্যদের তুলনায় বেশি সম্মান দান করবেন। কখন দেবেন?

১: ঈমান আনলে।

২: ইলম অর্জন করলে।

যারা লেখাপড়া করে, তাদের সামনে আয়াতটা থাকলে, বাড়তি প্রেরণা আসবে। জ্ঞান অর্জন করলে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই আমাকে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান দান করবেন। আয়াতে এমন আশ্বাসই মেলে।

উদ্ধার

নানা বিপদাপদ আসে। রাক্বের কারীম আমাকে উদ্ধারও করেন। কিছু দু'আ আছে, পাঠ করলে, উদ্ধারকার্যটা তরাস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা জাগে। ইউনুস আ.-

এর বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। মাছের পেট থেকে কেউ কোনোদিন বেঁচে এসেছে? কিন্তু বেঁচে গেছেন একটা দু'আর উসীলায়,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَخَّانُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি সকল ক্রটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয় আমি অপরাধী। (আঘিয়া ৮৭)

বিপদ দূরীকরণে এই দু'আর প্রচণ্ড শক্তি। চলে আসা বিপদ, সম্ভাব্য বিপদ, এসে চলে যাওয়া বিপদে এই দু'আ মানুষের বাঁচার উসীলা হয়ে ওঠে। একটু আল্লাহ তা'আলাই এর স্বীকৃতি দিয়েছেন,

فَأَنسَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

তখন আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। (৮৮)

কেন মুক্তি দিয়েছিলেন?

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

এভাবেই আমি ঈমানদারদের মুক্তি দিয়ে থাকি।

কিভাবে?

এই দু'আ পড়েছেন ইউনুস, রাবের কারীম দু'আর কারণে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার সমস্যা কি ইউনুস আ.-এর চেয়েও বেশি কঠিন?

সন্তান প্রতিপালন

সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু কথায় হয় না, করেও দেখাতে। আমি সন্তানকে গুনাহ থেকে বাঁচার উপদেশ দিয়ে গেলাম আর নিজে অনবরত সে গুনাহ করে গেলাম, তাহলে সন্তান সংশোধিত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে সন্তান গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও, ভয়ের কারণে থাকবে। বাবার আড়ালেও সেও গুনাহটা করবে না, এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। বাবা-মায়ের দায়িত্ব উপদেশের পাশাপাশি নিজের চলাফেরাও ঠিকঠাক রাখা। পাশাপাশি আরও দু'টি কাজ,

وَأُضِلِّحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ

আমার সন্তানকে আমার জন্য যোগ্য করে দিন। আমি তাওবা করছি।

(আহকাফ ১৫)

তাহলে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া গেল দুইটি।

১: দু'আ করা।

২: তাওবা করা।

আয়াতে কারীমায় দু'আর পাশাপাশি তাওবা করা হয়েছে। পিতামাতাও সন্তানের সংশোধন প্রয়াসের সাথে সাথে দু'আ করবেন, তাওবা করবেন।

যুগবদ্ধ

একা থাকলে নানা ভয় এসে মনে বাসা বাঁধে। নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কয়েকজন মিলে থাকলে, বিপদের আশংকা বহুলাংশে কমে যায়। এটা জাগতিক ব্যাপারেই শুধু নয়, ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সালাতে জামাতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বোধ হয় এসব দিক বিবেচনা করেই,

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (বাকারা ৪৩)

তাদের সাথে সময় কাটাও।

তাদের সাথে বাড়ি বানাও।

তাদের দলেই থাকো।

তাহলে সুন্দর পরিণতি লাভ করবে।

বিচ্ছৃতি থেকে বাঁচতে পারবে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

সুযোগের সদ্যবহার

আবু লাহাব (أَبُو لَهَب)। নবীজি সা.-এর আপন চাচা। তার স্ত্রী লাকড়িবাহী (حَتْلَبَةُ الْخَطْبِ)। দু'জনেরই সুযোগ ছিল, আরবের ও ইসলামের সেরাদের তলিকায় নাম লেখানোর। জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার। আবু লাহাব নবীজির জন্মের পর আনন্দে দাসী মুক্ত করেছিল। ভাতিজার দুঃস্থপানের সুবিধার্থে নিজের দাসী সুয়াইবাকে নিয়োগ করেছিল। আবু তালেবের অবর্তমানে নবীজির অভিভাবক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

কিন্তু বদনসীব। এতবড় সৌভাগ্যকে হেলাভরে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিল। সম্মান কিংবা বদনসীব। এতবড় সৌভাগ্যকে হেলাভরে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিল। সম্মান

মর্যাদা আর জান্নাতকে এভাবে হাতছাড়া করার নজির বেশি নেই। নবীজির সাথে থাকার অবিস্মরণীয় গৌরব তার কপালে জুটল না। জান্নাতের অনন্ত সুখকে সে অহমিকার কারণে খোয়াল। আবু লাহাবের মতো মানুষ আজো আছে। তারা হেদায়াতের সৌভাগ্য কাছে পেলেও কাজে লাগাতে পারে না। কাজে লাগাতে চায় না। বাবা মুসলিম, সে মুসলিম হতে পারে না। বাবা আলেম সে আলেম হতে পারে না। বাবা দ্বীনদার সে দ্বীনদার হতে পারে না। নিজের বোকামির কারণে। নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে। নিজের হঠকারী মানসিকতার কারণে। এমন লোকদের জন্যই কুরআন কারীম ঘোষণা দিয়ে রেখেছে,

يَبْتَغِي دَاوُدُ لَهَبًا وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَظِلُّ نَارًا أَذَاتَ لَهَبٍ

আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়ে গেছে।
তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই
সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। (লাহাব ১-৩)

আমার কী অবস্থা? আমি রবের পক্ষ থেকে পাওয়া সৌভাগ্যগুলোকে কাজে
লাগাচ্ছি তো?

হকপ্রাপ্তি

বাতিলের ভীড়ে হক খুঁজে পাওয়া কঠিন। একবার হকের দেখা পেয়ে গেলে,
গ্রহণ করতে আর দেরী করা উচিত নয়। আপোষ করা নিরাপদ নয়। ফিরআওন
জাদুকর ডেকে এনেছে। মূসা আ.-কে হারিয়ে দিয়ে নিজের নিরংকুশ কর্তৃত্ব
প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তার জমা করা জাদুকরগণই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল,

قَالُوا لَنْ نُّؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

জাদুকরগণ বলল, আমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এসেছে
তার ওপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। (তুহা
৭২)

জাদুকরগণ মূসার মু'জিযা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল,
মূসার কীর্তি সাধারণ জাদুর মত নয়। এটা অপার্থিব কিছু। তারা হক চিনতে
পারল। মূসা আ. একজন নবী, সেটা উপলব্ধি করতে পারল। আল্লাহ তা'আলাই
একমাত্র রব, ফিরআওন একজন নগন্য সৃষ্টি মাত্র। জাদুকরদের ভাবান্তরে
ফিরআওন খেপে গেল, হুমকির পথে গিয়ে ঘোষণা দিল,

فَلَا قِطْعَنٌ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِيَتُكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ
أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ

সুতরাং আমিও সংকল্প স্থির করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক
থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে
চড়াব। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে আমাদের দু'জনের
মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও বেশি স্থায়ী। (তুহা ৭১)

সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার নিজের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? হুমকি-ধমকিতে
নরম হয়ে যাবো?

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। (৭২)

কোনো পরোয়া নেই। আমাদের আসল জীবন আখেরাতে। সেখানে তোমার কোনো অধিকার থাকবে না হে জালিম,

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে। (৭২)

সত্য স্পষ্ট হয়ে গেলে,

আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবো না।

নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না।

দুনিয়ার লোভে পড়ে যাবো না।

আশেপাশের কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বো না।

সর্বাবস্থায় হকের অনুসারী থাকতে সচেষ্ট থাকব। ইনশাআল্লাহ।

রবের ভালোবাসা

আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসি। আমিও চাই প্রিয় রব আমাকেও ভালোবাসুন। কিভাবে তার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি? তার ভালোবাসা পাওয়ার অনেক উপায় আছে। সহজ একটি উপায় হল,

لَئِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের (অনুগ্রহকারীদের) ভালোবাসেন।

(বাকারা ১৯৫)

কুরআন কারীমে (المُحْسِنِينَ) শব্দটা প্রায় পঁয়ত্রিশবার এসেছে। মুহসিনগণের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্ভ্রুটি প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। আমি মানুষের প্রতি যতটা মুহসিন হব, অনুগ্রহকারী হব, আল্লাহ তা'আলাও আমার প্রতি ততটা মুহসিন হবেন। আমার প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার হলে, আমি সবর করি কি না, আমার প্রতি মানুষের সদ্যবহার হলে শোকর করি কি না, এসব আল্লাহ তা'আলা দেখবেন। আমি সৃষ্টির প্রতি মুহসিন তো স্রষ্টাও আমার প্রতি মুহসিন।

জান্নাত ও জাহান্নাম

নেক আমল করে যেতে পারলে জান্নাত। বদআমল করে গেলে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাত দেয়ার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যেতে দেবী, জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবী হবে না।

وَسَيُكْفَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا ۚ عَنَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحَثُّ أَبْوَابُهَا

যারা কুফর অবলম্বন করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে

নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে। যখন তারা তার নিকট পৌছবে, তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। (যুসার ৭১)

এবার জান্নাতের আয়াতটা দেখা যাক,

وَسَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِمَّا كَانُوا وَيُزِيلُ عَنْهُمْ عَنْقُرُوتَ الْعَذَابِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলেছে, তাদেরকে সঙ্গে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা তার নিকট পৌছবে এবং তাদের জন্য তার দরজাসমূহ পূর্ব হতেই উন্মুক্ত থাকবে (তখন বড় আনন্দঘন দৃশ্য হবে)। যুসার ৭৩

দুই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিতে পার্থক্য আছে। জাহান্নামের দরজার সময় বলা হয়েছে (فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا)। আর জান্নাতের দরজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (فُتِحَتْ)। একটা ওয়াও (و) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটা অবস্থাজ্ঞাপক ওয়াও (وَ)। অর্থাৎ তারা যখন সেখানে পৌছবে, দরজা খোলাই পাবে। আগে থেকেই দরজা খোলা থাকবে। জান্নাতের দরজা সব সময় খোলাই থাকে। জাহান্নামের দরজা সাধারণত বন্ধই থাকে। জাহান্নামীরা পৌছার পর দরজা খুলে দেয়া হবে। জান্নাতী দরজার মতো আগে থেকে খোলা থাকবে না।

ইস্তিকামাত

ইস্তেকামত (الاستقامة) মানে অবিচলতা। হকের ওপর অটল থাকা। সাধারণ মানুষের পক্ষে, পরিপূর্ণ ইস্তেকামত সম্ভব নয়।

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, এতএব তাঁরই প্রতি অবিচল থাকো।

(হামীম সাজদাহ ৬)

মানুষের কোনো কাজই পরিপূর্ণ নয়। মানুষ কোনো কাজকে পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে না। ইবাদতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। (তাগাবুন ১৬)

আমার কাজ, সাধ্যের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত চেষ্টা করা। তাকওয়া ও ইস্তেকামত উভয় ক্ষেত্রে নিজের প্রয়াসকে পূর্ণতার মাত্রায় পৌছানো অসম্ভব। তাই নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে, বাকিটুকুর জন্য ক্ষমা চাইব। এই নিয়ম আল্লাহ তা'আলাই বলে দিয়েছেন কুরআন কারীমে। তো ঘাটতির জন্য আমার আর ভয় কিসের!

জানী ও বোকা

বোকা মানুষ।

জানী মানুষ।

বোকা মানুষ মনে করে, সে যা চায়, সে চেষ্টা-পরিশ্রম করলেই তা পেয়ে যাবে।
কর্পোরেট জগতে মোটিভেশনাল স্পীচগুলোতে এমনটাই বারবার আওড়ানো হয়,

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى

মানুষ যা চায় (আকঙ্ক্ষা করে), তাই কি পায়?

আধুনিক কালের বক্তারা এমন একটা 'মন্ত্র' তরুণদের মনে বিড়বিড় করে ফুঁকে দেয়। এন্টারপ্রেনার (Entrepreneur) বা (নবউদ্যোক্তা)-রা কর্পোরেট বক্তাদের কথায় বঁদ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই 'মিসিং' হয়ে যায়।

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

অতএব পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে। (নাজম ২৪-২৫)

এন্টারপ্রেনাররা মনে আসল পুঁজি ছাড়াই যুদ্ধে নেমে পড়ে। আসল পুঁজি তো (توفيق الله) আল্লাহর তাওফীক।

রুহ

রুহ মানে আত্মা। প্রাণ। কুরআন কারীমে দু'রকম রুহের কথা আছে। আমরা প্রাণ অর্থে বলেছি। তাছাড়া, প্রাণ ছাড়া অন্য অর্থেও 'রুহ' কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা আমাদের আলোচ্য নয়।

প্রথম প্রকার:

তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, রুহ (এর হাকীকত) সম্পর্কে (রুহ কী?)

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

আপনি বলে দিন, রুহ হল আমার আদেশ ঘটিত (ব্যাপার, এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না)। ইসরা ৮৫

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

এ-রুহের সাহায্যে মানুষ বেঁচে থাকে। পার্থিব জীবন যাপন করে। হাসে। কাঁদে। খায়দায়। ঘুরে বেড়ায়। স্রষ্টার আনুগত্য করে। অবাধ্যতা করে।

দ্বিতীয় প্রকার:

এই রূহ প্রথম রূহের চেয়েও শক্তিশালী। এই রূহ ছাড়া প্রথম রূহ মরে যায়। শুধু প্রথম রূহ কেন, বিশ্বের সবকিছুই দ্বিতীয় রূহ ছাড়া অচল।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে কুরআন (রূহ) নাযিল করেছি। (শূরা ৫২)
কুরআন কারীমকে আল্লাহ তা'আলা 'রূহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই রূহ কতটা শক্তিশালী?

مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا فِي الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

(১). হে নবী, আপনি কুরআন নাযিলের আগে জানতেন না, কিতাব কি! জ্ঞান কী, ওহী কি!

(২). হে নবী, আপনি কুরআন নাযিলের আগে জানতেন না, ঈমান কি!

(৩). আমি (আল্লাহ) এই কুরআনকে নূর (আলো-জ্যোতি) বানিয়েছি।

(৪). এই কুরআন দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা করি, হেদায়াত দান করি।

আমি পথের দিশা পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার দিশা।

আমি আলো পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার আলো।

আমি মনে সুখ পাচ্ছি না? কুরআনই হবে আমার সুখ।

আমি ঈমানের স্বাদ পাচ্ছি না? কুরআনই দেবে আমায় কুরআনের স্বাদ।

আমি নিজের মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা অনুভব করছি? কুরআনই দেবে আমায় পর্যাপ্ত জ্ঞান।

আমি নিজের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পাচ্ছি না? কুরআনই দেবে আমায় প্রাণ।

মানবস্বভাব

আমাদের স্বভাবে কিছু ব্যাপার আছে জন্মগত। এর পরিবর্তন অসম্ভব। তবে সচেতন প্রচেষ্টায় স্বভাবগুলোকে অনুকূলে ব্যবহার করা যায়। মানবেতিহাসে প্রকাশ পাওয়া প্রথম দু'টি স্বভাব হল,

ক. ভুলে যাওয়া (النسيان)।

খ. দুর্বল ইচ্ছাশক্তি (ضعف العزيمة)।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَتْنَىٰ وَلَنُجِدَنَّ لَهُ عَزْمًا

আতি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা। (ত্বাহা ১১৫)

এ-দুই স্বভাবের ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে চাই, আল্লাহর খাস রহমত ও তাওফীক।

এখনকার ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে লেখে। তাদের কৃষ্টি-কালচারের কথা লেখে। তাদের স্বভাব-প্রকৃতির কথা লেখে। কিন্তু কুরআন বাদ দিয়ে তাদের ইতিহাসচর্চা কি সম্পূর্ণ হবে? কুরআন যে তথ্য দিবে, আরও কোনো উৎস এমন নিরেট তথ্য দিতে পারবে না। এই আয়াতে মানবেতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে।

গুহাগ্রহণ

একা একা দ্বীনি ইলম হাসিল করা ঠিক নয়। ওস্তাদ ধরা জরুরী। নিজে নিজে আল্লাহকে চেনা কঠিন। আল্লাহ তা'আলাও এমনটা পছন্দ করেন না। তাকে চিনতে হলে কী করতে হবে? এর উত্তর প্রিয় রবই দিয়ে দিয়েছেন,

الرَّخْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا

তিনি রহমান। তার (মহিমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর কোনো জ্ঞাতজনকে। (ফুরকান ৫৯)

আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে, যিনি আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অবগত আছেন। আমি যা জানি না, তিনি তা জানেন। তবে জ্ঞাতজন (خَيْرٍ) সব সময় এক রকম হবে না। এক মানের হবে না। প্রশ্নকর্তার ধরন বদলের সাথে সাথে 'খাবীরের' ধরনও বদলাবে।

- ক. প্রশ্নকর্তা যদি নবীজি সা. হন, তাহলে খাবীর হবেন খোদ রাব্বের কারীম।
- খ. প্রশ্নকর্তা যদি সাহাবী হন, তাহলে খাবীরের ভূমিকায় থাকবেন নবীজি সা.।
- গ. প্রশ্নকর্তা যদি তাবেয়ী হন, তাহলে খাবীর হবেন সাহাবায়ে কেরাম।
- ঘ. প্রশ্নকর্তা আমি হলে, তাহলে খাবীর হবেন আমার আশেপাশের অভিজ্ঞ কোনো আলিম।

একটু চিন্তা করলেই বের হয়ে আসে, আমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন আমি এই আয়াতের আওতায় এসে গেলাম। আয়াত নাযিল হওয়ার সময় এই আয়াত আমলকারীদের তালিকায় আমিও ছিলাম। সুবহানাল্লাহ। আর যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তিনিও আল্লাহর মনোনীত 'খাবীর'। লগুহে মাহফুযে তার নাম খাবীরগণের তালিকায় লিখিত আছে। আল্লাহ আকবার।

চিকিৎসা

সূরা ফাতিহা সমস্ত আসমানী ইলমের খনি। আত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসাও বটে। তিনটি বড় বড় আত্মিক রোগের চিকিৎসা করা হয়েছে,

(১): রিয়া (الرياء) বা লোকদেখানো মনোভাব মারাত্মক এক রোগ। এই রোগ মানুষকে আল্লাহর সাথে শিরিক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) আমি আপনারই ইবাদত করি। আমি স্বীকার করে নেই, আমার ইবাদত, আমার সালাত শুধুই আপনার জন্য। অন্য কাউকে দেখানোর জন্য নয়। প্রতি নামাযে বারবার এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে রিয়ার চিকিৎসা করা হতে থাকে।

(২) উজব (العجب) আত্মসত্ত্বিতা। হামবড়া ভাব। অহংকার। আমিই সেরা। আমার চেয়ে ভালো, আমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কারো ধার ধারি না। সবাই আমার কাছে আসবে। আমার দুয়ারে ধর্না দিবে। আমি কারো কাছে নত হতে যাবো কেন?

(وَالَيْكَ نُسَعِّدُ) আর আমি আপনারই কাছে সাহায্য চাই। রবের কাছে নতজানু হয়ে চাওয়ার মাধ্যমে নিজের ভেতরে থাকা অহংবোধ চুরচুর হতে থাকে। নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সকাতির প্রার্থনা, মনকে বিনয়ী করে তোলে। দর হয়ে যায় যাবতীয় 'উজব'।

(৩) জাহল (الجهل) বা অজ্ঞতা মারাত্মক এক সমস্যা। আগের দুটো আত্মিক রোগ হলে, এটা আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) রোগ। অজ্ঞতা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। শিরকে লিপ্ত করে। গুনাহের পথে টেনে নিয়ে যায়। (الْمُرَّةَ الْفَرَّاطِ) আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। হেদায়াত বা সরল পথ পাওয়া মানেই অজ্ঞতা দূর হওয়া। গোমরাহি বা ভ্রষ্টতা তো অজ্ঞতারই আরেক নাম। আমরা হিদায়াত চাওয়ার মাধ্যমে প্রকারান্তরে অজ্ঞতাকেই দূর করার প্রার্থনা করছি।

উপেক্ষা

কাজে নামলে, ময়দানে থাকলে, কতজন কত কথা বলবে। এসব শোনার সুযোগ কোথায়! কাজের লোকেরা এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না। ফিরেও তাকায় না। তবুও মাঝেমাঝে এমন আক্রমণ আসে, সাধারণ স্তরের মেহনতকারীদের জন্য সেটা হজম করা কঠিনই হয়ে যায়।

দেখা গেল, অনেক চিন্তাভাবনা পরামর্শ করে একজন লেখক একটা লেখা তৈরি করল, একজন বক্তা একটা বক্তব্য তৈরি করল, বক্তব্য বা লেখার বিষয়বস্তু কারো কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানল, ব্যস অমনি গুরু হয়ে যাবে প্রতিরোধের তুফান।

কিছু মানুষের স্বভাবই হল, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো, যেচে এসে উটকো উপদেশ বিতরণ করা, শুধু শুধু খোঁচাখুঁচি করে ভেতরে পুষে রাখা আক্রোশ চরিতার্থ করা। এদের থেকে বাঁচার সহজ কোনো উপায় নেই। কুরআন কারীম এদের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে বাঁচতে একটা অব্যর্থ দাওয়াই দিয়েছে। এককথায় প্রকাশ করতে গেলে কুরআনী শব্দে বলতে হয়:

ই'রাদ (اعراض)। উপেক্ষা করা। এড়িয়ে যাওয়া।

(এক) পাগলের পাগলামির জবাব দিতে যাওয়াও পাগলামি। মূর্খের সাথে তর্ক করতে যাওয়াও মূর্খতা। বেপরোয়া দুষ্টলোকের সামনে পড়ে গেলে, নরম কথা বলে সসম্মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ্য করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে। (ফুরকান ৬৩)

(দুই) অজ্ঞ লোকদের আক্রমণ শুধু এখন নয় নবীগণের যুগেও ছিল। নবীগণ অজ্ঞদের এসব আক্রমণে মোটেও বিচলিত হননি,

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে। (বাকার ১৪২)

মদীনায় আসার পর প্রায় সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয়েছিল। পরে আবার কা'বার দিকে ফিরেই নামাজ পড়া হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আগেই বলে রেখেছেন, এই কিবলা পরিবর্তনের কারণে 'নির্বোধেরা' হইচই শুরু করে দিবে। এসবের প্রতি কান দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

(৩) জাহিলদেরকে উপেক্ষা করতে, সরাসরি হুকুম করা হয়েছে নবীজি সা.-কে,

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য করুন। (আ'রাফ ১৯৯)

কুরআন কারীমে আটবারেরও বেশি অজ্ঞ-কাফের-মুশরিক-জাহেলদেরকে উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-কেও একই উপদেশ দেয়া হয়েছে। ইউসুফ আ.-কেও উপদেশটা দেয়া হয়েছে।

যখনই কেউ আঘাত করে, কুরআন কারীমের আয়াতগুলোর প্রতি নজর বুলালে কষ্ট কমে যায়। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই নির্বোধের কথায় প্রভাবিত হয় না। নির্বোধের কথাকে গুরুত্বও দেয় না। নবীগণের আদর্শে অটল থেকে আপন মনে কাজ করে যায়।

জ্ঞাতবিচার

সূরা ফাতিহার শেষে রাক্বের কারীম দু'টি জ্ঞাতি সম্পর্কে দু'টি সিন্ধাস্ত দিয়েছেন,
১: ইহুদিদের সম্পর্কে বলেছেন (الْمُضُؤَب) গযবগ্রস্ত ।

২: খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন (الْمُؤُؤَب) ভ্রষ্ট ।

যারা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করে, খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ওঠাবসা করে, তাদের একটু চিন্তা করা উচিত, আমিও 'গযবগ্রস্ত' বা ভ্রষ্টদের তালিকায় উঠে যাচ্ছি না তো? তাদের গযব ও ভ্রষ্টতার হোঁয়া আমার গায়েও এসে লাগছে না তো? যারা ইহুদি-নাসারার দেশে বাস করে, তাদেরও বিষয়টা ভেবে দেখা উচিত । ঈমান ও আমলের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত । অন্তত ভেতরে ভেতরে হলেও কুফুরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত বলে মনে হয় ।

ঈমানের নেয়ামত

ঈমান অনেক বড় এক নেয়ামত । অতি সম্মানী এক সম্পদ । আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে নানাভাবে সম্মান দান করেন । আখেরাতে বদআমলীর কারণে অনেক ঈমানদারও জাহান্নামে যাবে । আযাব ভোগ করবে । তবে কাফেরের আযাব আর মুমিনের আযাবে বোধহয় পার্থক্য থাকবে ।

কুরআন কারীমে (عَذَابٌ مُؤُؤَبٌ) বা লাঞ্ছনাকর আযাব শব্দবন্ধটা এসেছে মোট ১৪ বার । প্রতিবারই সেটা ব্যবহৃত হয়েছে কাফেরদের সম্পর্কে । তার মানে, মুমিনগণ সাময়িক আযাব ভোগ করলেও, সেটা কষ্টকর হবে তবে লাঞ্ছনাকর হবে না ।

অতীতের পাপ

অতীতে অনেক গুনাহ আছে? অনেক ভুলত্রুটি আছে? অসংখ্য অপরাধ আছে? দীর্ঘ অন্ধকারময় অতীত আছে? আল্লাহর নাফরমানিতে ডোবা দিল আছে?

وَأَلْقِ السَّكْرَةَ سَاجِدِينَ

আর এ ঘটনা যাদুকরগণকে (তাদের অচিন্তিতে) সিজদায় ফেলে দিল । (আ'রাফ: ১২০)

একটা মাত্র সিজদা দিয়ে দুর্গন্ধময় অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জাদুকরগণ । একটু আগেও ফেরআওনের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিল । আরো বেশি পাপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিন্তু বুঝ আসার পর, মুহূর্তেই সব বদলে গেলো!

তাহলে? ফিরে আসার সুযোগ যে কোনো সময়ই আছে! মাত্র একটা সিদ্ধান্ত!
বাস! অন্ধকার অতীত নিমেষেই আলোকময় বর্তমানে পরিণত হবে!

সবার মধ্যে ভালোবাসার শক্তি সমান থাকে না। সবার ভালোবাসার ধরনও এক
হয় না। ভালোবাসার প্রকাশও এক থাকে না। আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে
হুমকি দিয়ে বলেছেন::

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি স্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ
এমন লোক সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও
তাকে ভালোবাসবে। (মায়িদা: ৫৪)

আল্লাহ তা'আলা প্রেমিক চান। আশেক চান। তাকে ভালোবাসা দিতে পারবে
এমন মানুষ চান। ভালোবাসাহীন খরখরে হৃদয়ের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন
না। আল্লাহর কাছে সব বান্দাই সমান! কিন্তু ভালোবাসার শক্তি কার মধ্যে
বেশি?

-নারীর মধ্যে নাকি পুরুষের মধ্যে?

সাধারণত মনে করা হয়, নারীর মধ্যেই ভালোবাসার শক্তি বেশি। নম্র কোমল।
কমনীয়। মায়াবতী। দয়াবতী! নারীর মধ্যে আছে গভীর মায়া। সুক্ষ্ম আবেগ-
অনুভূতি! তার ভেতরে বাস করে উজাড় করা ভালোবাসা। এটা একটা বড়
সুযোগ! খোদাপ্রদত্ত এই সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, একজন নারী হয়ে উঠতে
পারে আল্লাহর বেশি কাছের! বেশি প্রিয়! বেশি মাহবুবা! একজন নারী
ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় পুরুষকে হারিয়ে দিতে পারে! হতে পারে আল্লাহর
কাছে আদরনীয়!

সচেতন নারী

একজন নারী কতোটা সচেতন হতে পারেন? কথাবার্তায়? আচার-আচরণে?
কতোটা নিপুণা হয়ে উঠতে পারেন? একটুখানি কুরআনী ঝলক দেখা যাক:

لِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَةَ الْيَوْمِ إِنِّي

আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি।

সুতরাং আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না। (মারয়াম
২৬)

সবাই মারয়ামকে ছেকে ধরেছে! স্বামী ছাড়া কিভাবে সন্তান হলো? এই জটিল
প্রশ্নের উত্তর কি মোখিকভাবে দিয়ে কাউকে পরিতুষ্ট করা যাবে? তাও দুষ্ট

ইহুদিদেরকে? মারয়াম ঝামেলা থেকে বাঁচতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন।
সাফ বলে দিলেন:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি!

সে যমানায় রাখা রাখলে কথা বলা যেতো না। মারয়াম এই সুযোগটাই
নিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো তিনি বলেছেন:

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنِيًّا

সুতরাং আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না। (মারয়াম ২৬)

শব্দটা নিয়েছেন (إِنِّي)। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত বলা হয় (أَحَدًا)
আমি কারো সাথে কথা বলবো না। এই সূক্ষ্ম রদবদল কেন?

মারয়াম মানুষের সাথে কথা বলা বন্ধ রাখবেন। আল্লাহর সাথে তো ঠিকই
যোগাযোগ রাখবেন। যিকির করবেন। মুনাজাত করবেন। এই কঠিন
পরিস্থিতিতে আশ্রয় চাইবেন। ‘আহাদান’ বললে একেবারে কারো সাথেই কথা
বলবেন না, এটা বোঝা যেত। সেটা হতো মিথ্যা!

মানুষটা আসলেই অসাধারন! একজন নারী! অবলা! অসহায়! পুরো সমাজ তার
বিরুদ্ধে! কিন্তু কী অমিত তেজেই না লড়াই করেছেন! জয়ীও হয়েছেন! প্রচলিত
ভ্রান্তিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে! আর কী গভীর মর্মভেদী
বিচারশক্তি! কথা বলেন মেপে মেপে! চরম বিপদেও খেই হারাননি!
-সালাম হে মহীয়সী!

কুরআনি কর্মযোগ

কুরআন কারীম আমাদের জন্য। জীবনের জন্য। দুনিয়ার জন্য। আখিরাতের
জন্য। পুরো মানবজাতির জন্য। শুধু মুসলিমের জন্য? উহু! যে এখনো ইসলাম
গ্রহণ করেনি তার জন্যও কুরআন! কুরআন আশার কথা বলে। স্বপ্নের কথা
বলে। কর্মের কথা বলে। উদ্যোগের কথা বলে। একটু দেখি:

اٰذْهَبْ اَنْتَ وَاٰخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার
যিকিরে শৈথিল্য করো না। (ত্বাহ: ৪২)

(১). যাও (اٰذْهَبْ)

সব রকমের নেতিবাচকতা ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। ইতিবাচকতাকে প্রতিষ্ঠা করো।
বাতিলকে উড়িয়ে দাও। হকের পতাকাকে বুলন্দ করো। ভেঙে ফেলো
তাগুতকে। দাঁড় করাও আল্লাহর কালিমাকে।

(২). (أَنْتَ وَأَخُوكَ) তুমি ও তোমার ভাই।

ব্যক্তিস্বার্থকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্যষ্টির স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করো। ব্যক্তিতন্ত্রকে ছুঁড়ে
ফেলে দাও। সম্মিলিত স্বার্থকে প্রাধান্য দাও। যৌথ কর্মকৌশল গ্রহণ করো।

(৩). (بِإِيَّائِي) আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে।

অজ্ঞতা নিরক্ষরতাকে গুঁড়িয়ে দাও। জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করো। এলোপাথাড়ি
উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অপরিকল্পিতভাবে কাজ করা নয়। সুপরিকল্পিত
সুব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হও।

(৪). (وَلَا تَيْئَسْ) শৈথিল্য করো না

অলসতা নির্জীবতাকে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দাও। হিম্মত আর আত্মত্যাগকে
প্রতিষ্ঠা করো।

(৫). (فِي زَكْرِيَّيَا) আমার যিকিরে।

বস্ত্ববাদকে গুঁড়িয়ে দাও। রব্বানিয়্যতকে প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহর ইচ্ছাকে
প্রাধান্য দাও।

ইতিবাচকতা, যৌথ উদ্যোগ, পরিকল্পিত নিয়মতান্ত্রিক কর্মকৌশল, উদ্যম,
আল্লাহর যিকির আর ইখলাসের সাথে কাজে নেমে পড়ো। সাফল্য তোমার
পদচুম্বন করবেই! করতে বাধ্য!

মাত্র একটা আয়াত।

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

কলবের নূর

পড়তে এসেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ.। ওস্তাদ প্রথম দেখাতেই বললেন:

-আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তোমার কলবে নূর ঢেলে দিয়েছেন। তুমি এই

নূরকে গুনাহের অন্ধকার দ্বারা নিভিয়ে দিও না।

ইমাম মালেক রহ. একটা আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে শাগরিদকে কথাটা
বলেছিলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন
কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার
শক্তি দেবেন। (আনফাল ২৯)

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন:

-ফুরকান (الفرقان) পার্থক্য করার শক্তিই মূলত 'নূর'। এটা দ্বারাই সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা যায়। বান্দার কলব যত বেশি আল্লহুমুখী হয়, এই 'ফুরকান'ও ততবেশি পরিপূর্ণ হতে থাকে।

পিপাসা

পিপাসা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। পিপাসা থাকলে পানির সন্ধান ঠিকই বেরিয়ে যায়। জ্বিনেরা কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নবীজি সা.-এর সাথে দেখা। নবীজি নিজেই হয়তো তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। জ্বিনেরা নবীজির কথা শুনলো। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে। নবীজির কাছে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলো। একরাতেই! কুরআন নিয়ে তাদের অনুভূতিটা কিভাবে প্রকাশ করলো:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

সূতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। (জ্বিন ১-২)

গ্রহণ করার মতো পাত্র থাকতে হয়। আধার থাকতে হয়। কুরআন শোনার সাথে সাথেই জ্বিনদের মধ্যে ভাবান্তর তৈরি হলো। শুধু তাই নয়, তারা কুরআন নিয়ে তাদাব্বুরও শুরু করে দিয়েছিল। কুরআনের মূল লক্ষ্য আবিষ্কার করে ফেলেছিল:

-এই কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে!

নিজেরা বুঝেই থেমে থাকেনি। আপনজনদের সাথেও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। অগোচরে দাওয়াত দিতে শুরু করেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো: তারা নবীজির কথার চেয়ে কুরআনের কথা বলতে বেশি আগ্রহ বোধ করেছিল। যদিও কুরআন নবীজির কাছ থেকেই শুনে গেছে।

এজন্যই কাফির বা নতুনদেরকে কুরআন দিয়ে দাওয়াত দেয়াটাই বেশি কার্যকর। ফলপ্রসূ। যোগ্য দায়ীরা দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআনকেই বেশি সামনে আনেন। কুরআনের প্রশংসা করেন। কুরআনকে বেশি বেশি তুলে ধরেন। জ্বিনেরাও তাই করেছিল। তার মানে এই নয়, সীরাহ বা সুন্নাহকে অবহেলা করা হবে।

সর্বজ্ঞানী

দুঃখ-কষ্ট আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বান্দার জন্য যা ভালো মনে করেন, দিয়ে থাকেন। আমি বিপদে থাকলে, সেটা তার জানা আছে! তিনি নবীজি সা.-কে বলেছেন:

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আপনি বলে দিন, এটা (এই বাণী) তো নাযিল করেছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জানেন। (ফুরকান: ৬)

তিনি সবকিছু জানেন। তাহলে আমার কষ্টের কথাও জানেন। আমার অপূর্ণতার কথাও জানেন। অতৃপ্তির কথা জানেন। অপ্রাপ্তির কথা জানেন। তিনি যখন জানেনই তাহলে আমার আর দীর্ঘশ্বাস কেন?

ডালো-মন্দের বুঝ

ঘরে থাকলে পিতা-মাতার কথা মেনে চলা উচিত। উচিত বললে হবে না। বলতে হবে: মেনে চলাটা আবশ্যিক। আমার ছেলেবেলায়, আমার কিসে ভালো কিসে মন্দ, সেটা আমার চেয়ে আম্মু-আব্বু বেশি ভালো বুঝতেন। আল্লাহ তা'আলা আমার ছোটবেলা বড়বেলা সববেলাতেই, আমার জন্য কোনটা বেশি উপকারী সেটা বোঝেন। মা-বাবার চেয়ে শত-কোটিগুণের চেয়েও বেশি বোঝেন। সেটা তিনি এভাবে বলেছেন:

عَسَى أَنْ تَكُونُوا شَيْئًا وَمُشْرِكٌ كُفْرًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। (বাকারা ২১৬)

আমার কাছে খারাপ লাগলেই সেটা প্রকৃতপক্ষে খারাপ এমন নয়। এমনকি আমার কাছে কোনো জিনিস ভালো লাগলে, সেটা প্রকৃতপক্ষে ভালো ও উপকারী হবে, এমনও নয়। আমার কাজ হলো আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ইয়াকীন রাখা। দৃঢ়বিশ্বাস রাখা। এই ইয়াকীনের প্রধান দাবিই হলো:
-আমি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বাইরে কোনো কিছুর তামান্না করব না।

দু' দল

পথ সব সময়ই দু'টি! হক আর বাতিল। ঈমান আর কুফর। জান্নাত আর জাহান্নাম। শেষদিনও থাকবে দুটি পথ। থাকবে দু'টি দল। আমি কোন দলে থাকতে চাই, সেটা এখানেই বুকিং দিয়ে রাখতে হবে:

প্রথম দল:

يَوْمَ نَخْزِي الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

(সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুত্তাকীগণকে অতিথিরূপে
দয়াময় (আল্লাহর)-এর কাছে একত্র করবো। (মারয়াম: ৮৫)
আমি এই দলে থাকতে চাই? তাহলে মুত্তাকী হতে হবে।

দ্বিতীয় দল:

وَنُؤْفِكُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثَةً

আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত জন্তর মত হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে
নিয়ে যাব। (মারয়াম: ৮৬)

এই দলে? কস্মিনকালেও না। আমাকে এখনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমি কোন
দলে থাকতে চাই!

গুরুত্বপূর্ণ গুণ

কুরআন কারীমে প্রায়ই দেখা যায় আল্লাহ তা'আলা একসাথে অনেক গুণাবলী
বর্ণনা করেন। অথবা দোষ বর্ণনা করেন। কিন্তু একটা গুণ বা একটা দোষকে
আলাদা করে বাড়তি গুরুত্ব দেন। সূরা আহযাবের দিকে তাকালে আমরা
দেখতে পাই:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী,
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী,
ইবাদতগুজার পুরুষ ও ইবাদতগুজার নারী,
সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,
ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী,
আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী,
রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী,
নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী
এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী
আল্লাহ এদের সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে
রেখেছেন। (৩৫)

সর্বমোট নয় প্রকার মানুষের কথা বলা হয়েছে। নয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি গুণের অধিকারী নারী ও পুরুষের কথা পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ গুণাবলী ছিল 'যিকির'। এখানে এসে আল্লাহ তা'আলা আগের ধারার ব্যতিক্রম করে একটা বাড়তি বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন:

অধিক (كثيراً)।

মানে শুধু যিকির করলেই হবে না। বেশি পরিমাণে করতে হবে। শুধু এখানে নয়, আল্লাহ তা'আলা যখন যাকারিয়া আ.-কে উপদেশ দিলেন, তখনও একই ভঙ্গিতে কথা বলেছেন:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالنَّعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

সে (যাকারিয়া) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ব্যতিরেকে কোনো কথা বলতে পারবে না। এবং তুমি স্মীয় প্রতিপালকের অধিক পরিমাণে যিকির করতে থাক তার তাসবীহ পাঠ করো বিকাল বেলায় ও উষাকালে। (আলে ইমরান ৪১)

আল্লাহ তা'আলা চান আমরা বেশি বেশি যিকির করি। তাকে স্মরণ করি। তার কাছাকাছি থাকি:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, অধিক পরিমাণে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর। (আহযাব: ৪১-৪২)

এতো গেলো মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য কী?

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (নিসা: ১৪২)

কী আশ্চর্য, মুনাফিকও যিকির করে? হোক না কম। আমি তো কম যিকিরও করি না। আমি কি তাহলে মুনাফিকের চেয়েও.....!

সাধারণ পরিস্থিতিতেই নয় শুধু, যুদ্ধকালীন গুরুতর সঙ্গীন মুহুর্তেও আল্লাহ তা'আলা এই হুকুম করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর। (আনফাল: ৪৫)

যিকির এমন ইবাদত যাতে:

ওজু লাগে না।

কিবলামুখী হওয়া লাগে না।

সম্পদ খরচ করতে হয় না।

পরিশ্রম করতে হয় না।

সুনির্দিষ্ট সময় লাগে না।

লাগে একটু সদিচ্ছা আর আল্লাহর তাওফীকের।

নৈরাশ্য

আমরা একটানা কিছুদিন বিপদে বা কষ্টে থাকলে, অস্থির হয়ে পড়ি। নানাধর্মী হতাশা বাক্য আমাদের মুখ দিয়ে বের হতে শুরু করে। উঠতে বসতে ভাগ্যকে দোষ দেই। আশেপাশের দোষ দেই। আল্লাহর বিরুদ্ধেও আঙুল তুলে ফেলি। অথচ এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর নবীগণও পড়েছেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَبِّئُ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফেরগণ মনে করতে লাগল তাদেরকে মিথ্যা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল (অর্থাৎ কাফেরদের ওপর আযাব এল) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম তাকে রক্ষা করলাম। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি টলানে যায় না (ইউসুফ: ১১০)

আয়াতে বলা হয়েছে নবীগণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের নৈরাশ্য আর নবীগণের নৈরাশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। তারা নিরাশ হয়েছিলেন দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে। কাফিররা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করছে না। মনে হয় তারা ঈমান আনবে না। কিন্তু আমাদের নৈরাশ্য আমাদের ব্যক্তিগত পার্থিব বিষয়ে।

মনে নৈরাশ্য আসা খারাপ কিছু নয়। তবে নৈরাশ্য এলেও হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার! সমস্যা যখন কঠিনতর হয়ে ওঠে, সমাধান তখন অতি নিকটে হয়ে যায়। নবীগণ তাদের উম্মতের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তারা ভয় দেখানোর জন্য উম্মতকে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছিলেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ هَكَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

সুতরাং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদেরকে তো আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেব এবং তাদের কোনো রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না (আলে ইমরান ৫৬)

কাফেররা একগুঁয়েমী করেছে। নবীগণের কথায় কান দেয়নি। আল্লাহর আযাবকে ভয় পায়নি। তারা উপহাস করে বলেছে,

فَأْتِنَا بِمَآئِدَتِنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর (আ'রাফ ৭০)

এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ সাথে সাথে আযাব দেন না। আরও সুযোগ দেন। এই সুযোগদানের সময়টা একটু লম্বা হয়ে গেলে, নবীগণের মধ্যে একটু ভিন্ন চিন্তা আসে! তবে কি আযাব আসবে না? অবিশ্বাস নয়, সামান্য উৎকণ্ঠা মাত্র। আর তখনই আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

আমরা সংকটের তীব্রতা দেখে গা ছেড়ে দেব না। একটু পরেই যে আল্লাহর নুসরত আসবে!

সাফল্য

সাফল্য কী? জীবনে কোন্ কোন্ অর্জন থাকলে একজন মানুষকে সফল বলা যাবে? সফলতার আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। সীমারেখা নেই। একটি শিশুর কাছে কাস্তিত একটা খেলনা থাকলেই সে নিজেকে সফল ভাবে। কেউ কেউ মনে করেন, একটা দশতলাবিশিষ্ট বাড়ি থাকলেই জীবনটা সফল! কিন্তু কুরআন কারীম বলছে ভিন্নকথা!

فَمَنْ رُخِّحَ عَنِ النَّارِ وَأُخِلَّ الْجَنَّةَ فَذَاقَ

যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, সে-ই প্রকৃত সফলকাম হবে (আলে ইমরান: ১৮৫)

আমার জীবনটা কুরআনী সফলদের মতো আছে তো? আমার নামটা কি জান্নাতীদের তালিকায় আছে?

বই

ক'দিন আগে বইমেলা গেলো। কত কত বই সেখানে! অসংখ্য-অগণিত বই! শত শত বই। হাজার হাজার বই। এসব বই দেখে, হাতে নিয়ে, পড়তে বসে, একথা কি মনে হয়েছে; দুনিয়াতে কিতাব (বই) বলতে একটাই আছে,

ذَلِكَ الْكِتَابُ

এটি কিতাব! (বাকারা ১)

না, কোনো বই দেখে এমন কথা চিন্তায় আসেনি। বইগুলো যদি আমাকে হিদায়াত দিতে না পারে, জান্নাতের পথ দেখাতে না পারে, তাকওয়ামুখী করতে না পারে, তাহলে সব ভূয়া। হাবা-আম মানসুরা। বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

গো

আমার মধ্যে কি এই আত্মসম্মানবোধজনিত সচেতনতা আছে, প্রতিটি বইকে দেখলেই মনের গহীনে 'যালিকাল কিতাব' (ذَلِكَ الْكِتَابُ)-এর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে?

একটা কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত?

'হিদায়াত দানের শক্তি!'

একজন পুরুষের যেমন প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

-পৌরুষ!

একটি কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যও

-হেদায়াত!

প্রিয় মানুষের মতো অন্য কাউকে দেখলেই যেমন 'প্রিয় মানুষটার' কথা মনে পড়ে, তদ্রূপ প্রতিটি বই দেখলেই মনে ভেসে ওঠে কি 'কুরআন কারীমের' কথা? নিজের মধ্যে তরতাজা ঈমান থাকলে, বই দেখলেই 'কুরআনের' কথা মনে পড়ার কথা। কিন্তু আজো বই পেলে এতটাই বৃন্দ হয়ে যাই, কিতাব তো দূরের কথা, কিতাবের মালিককেও অনেক সময় সাময়িকভাবে বিস্মৃত হই।

সামনে ওয়াজ চলছিল। আমরা তিনজন পেছনে বসে, বক্তার একটা কথা নিয়ে মৃদু আলাপ করছিলাম। এক ভাইয়ের একটাই যুক্তি:

-তাহলে অমুক বড় ব্যক্তিত্ব এটা করেছেন। তিনি কি ভুল করেছিলেন?
-তিনি ভুল করেছিলেন কি করেন নি, সেটা বিবেচ্য নয়, আপনি কুরআন কারীমে আসুন। হাদীস শরীফে আসুন। এই আয়াতটার দিকে একটু তাকান তো!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে চলে এসো। তখন তারা বলে, আমরা যার (অর্থাৎ যে ধ্বিনের) ওপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা! তাদের বাপ-দাদা যদি এমন হয় যে, তাদের কোনো জ্ঞানই নেই এবং হিদায়াতও নেই, তবুও (তারা তাদের অনুগমন করতে থাকবে)? মায়িদা: ১০৪

প্রশ্ন উঠতে পারে:

-তাহলে উনি এতবড় মানুষ হয়ে কুরআন হাদীস বোঝেন নি?

-অবশ্যই বুঝেছেন! কিন্তু সবার কাছে সবদিক স্পষ্ট হয় না। ইজতিহাদি বিষয়ে সবারই একটু এদিক সেদিক হয়ে যেতেই পারে!

-তারমানে আপনিই কুরআন বুঝেছেন!

-ব্যাপারটা তাও নয়। আপনাকে অনুরোধ করবো, আপনি শুধু একটি বারের জন্য, একটু সময়ের জন্য, 'উনি-তিনি' বাদ দিয়ে কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিন! না না নিজের বুঝ দিয়ে কিছুই করতে হবে না। আপনি খাইরুল কুর্রনের দৃষ্টি দিয়েই কুরআনের দিকে তাকান! তাহলেই হবে! আপনি আলিম। ধ্বিনের প্রায় সব বিষয়ে আপনার সুগভীর পারদর্শিতা! ইনশাআল্লাহ শরহে সদর হয়ে যাবে। বুঝ এসে যাবে।

-আমি যার কথা বললাম বা এখন যিনি বয়ান করছেন, তিনি কি আমাদের সালাফ নন?

-ভাই রে! আমি আপনাকে এত কাছের সালাফের কথা বলিনি! বলেছি, ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুগের সালাফদের কথা। খাইরুল কুর্রনের সালাফের কথা।

প্রোপাগান্ডা

গোয়েবলসের মতো ব্যক্তি শুধু হিটলারের আমলেই ছিল, এমনটা নয়। গোয়েবলসা সব সময় ছিল। সর্বযুগে ছিল। সব সমাজে ছিল। যেখানেই হক

গিয়েছে, সাথে সাথে একদল গোয়েবলস দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের কাজ ছিল হকের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো। কুরআন কারীমে এর অসংখ্য প্রমাণ আছে:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

তারা বলল, হে শুআইব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝেই আসে না। (হুদ: ৯১)

শুআইব আ.কে পাঠানো হয়েছিল 'মাদয়ানে'। বর্তমানে সৌদি আরবের পশ্চিমে তাবুক অঞ্চলের কাছে। তার কওমকে আসহাবে আইকাও বলা হয়ে থাকে। আইকা একটা ঘন ডালপালাবিশিষ্ট গাছের নাম। তার এই গাছের পূজা করতো। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল:

-মাপে কম দেয়া।

এরা ইবরাহীম আ.-এর বংশধর। লূত আ.-এর কওমের অবশিষ্ট অংশ। বলা হয়ে থাকে, মূসা আ. ফিরআওন থেকে আত্মরক্ষা করে এদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরা খাঁটি আরব ছিল। তাদের বেস্তমিযি সংশোধন করতে শুআইব আ.-কে পাঠালেন আল্লাহ। তারা কী করলো? সেই চিরাচরিত কৌশল:

-প্রতিপক্ষকে অপবাদ দিয়ে ঘায়েল করা। নাজেহাল করে তোলা। মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া।

মাদয়ানবাসী কী করলো? তারা শুআইব আ.-এর প্রধান শক্তিতেই আঘাত হেনে বসলো:

-তোমার বেশির ভাগ কথাই বুঝি না!

অথচ শুআইব আ.-কে বলা হয়: খতীবুল আম্বিয়া। নবীগণের খতীব। তার ভাষা ছিল অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ। সৌকর্যমণ্ডিত।

বর্তমানেও কি 'আসহাবে আইকা' নেই? আসহাবে মাদয়ান নেই?

-অবশ্যই আছে। তারা কখনো সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। তারা দীনের পক্ষে শক্তিকে কখনো বলে 'সন্ত্রাসী'। কখনো বলে 'খারেজী'। কখনো বলে 'আমেরিকার দালাল'। কখনো বলে 'শী'আদের দালাল' কখনো বলে 'ইহুদিদের দালাল'।

আমাদের দেশেও আছে:

-তেঁতুল হজুর তত্ত্বই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আযাবের ধরন

কারো কারো মনে হতে পারে, কেয়ামতের দিন আযাব হবে শুধু শারীরিক! না, সেদিন আযাবটা মানসিকও হবে। বরং সেটাই হবে বেশি কষ্টকর।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(হে নবী!) তাদেরকে সেই আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যে দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ (এখন) গাফলতিতে পড়ে আছে এবং ঈমান আনছে না। (মারয়াম: ৩৯)

সেদিন যখন আমি মাত্র একটা 'সওয়াবের' জন্য আটকে যাবো, আফসোস করবো, আমি কেন:

আমার প্রতি যে অসদাচরণ করেছে, তার প্রতি সদাচার করলাম না।

মানুষের প্রতি সুন্দরভাবে ওঠাবসা করলাম না।

প্রতিটি কথা মেপে মেপে বললাম না।

কেন মিথ্যা বলেছিলাম।

কেন অমুক সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।

স্বামীর হক আদায় করলাম না।

স্ত্রীর হক আদায় করলাম না।

অমুকের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব করেছিলাম।

এভাবে আফসোস করতে করতে জান পানি হয়ে যাবে! কিন্তু আফসোসের তালিকা শেষ হবে না!

সুন্ধদর্শী

আল্লাহ যামাখশারী রহ. কুরআন কারীমের অনেক গভীরে পৌছতে পারতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে আজীব সুন্ধদর্শিতা দান করেছিলেন। সামান্য একটু ঝলক দেখা যাক:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে তখন:

নিজেদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে,

নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করবে,

টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা (-ও ধুয়ে নেবে)। মায়িদা ৬

যে ধারাবাহিকতায় ওজু সম্পন্ন করা হয়, বর্ণনাতেও তা বজায় রাখা হয়েছে।
কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে:

-মাথা মাসেহ করার কথা বলার পর, পায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, ওজুর সময় 'পা'ও মাসেহ করতে হবে। কিন্তু (أَرْجُلُكَ)-এর নামে নসব মানে যবর পড়ার দ্বারা বোঝা যায়, পা-কে ধুতে হবে। মাসেহ নয়। 'আরজুল'-এর সম্পর্ক পূর্বের 'ইগসিলু' ক্রিয়ার সাথে।

-তাহলে (أَرْجُلُكَ)-কে মুখ ও হাতের সাথে কেন উল্লেখ করা হলো না? তাহলে এ-সন্দেহ তৈরি হতো না!

-বলা যেতে পারে দু'টি কারণে তা করা হয়নি। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

ক. ওজুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

খ. পা ধোয়ার সময় সাধারণত পানি অপচয় হওয়ার অবকাশ বেশি থাকে। তাই মাসেহ-এর পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, পানি কম খরচ করো। মাসেহ-এর মধ্যে পানি খরচের প্রবণতাকে বাঁধ দেয়া হয়েছে। এবার পা ধোয়ার সময়ও তা বজায় রেখো!

দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ

একসাথে থেকেও দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ হতে পারে। তিনবন্ধু মিলে গল্প হচ্ছে। এক বন্ধু বলল:

-একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি!

এক বন্ধু বলল:

-কিছু না খেয়ে?

আরেক বন্ধু বলল:

-এক ওয়াস্ত নামাজও না পড়ে?

ফেরআওনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন। যেতে যেতে লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছলেন। ওদিকে ফেরআওনও বসে নেই। সেও লোক-লস্কর নিয়ে পিছু নিল। প্রায় ধরে ফেলার উপক্রম। বনী ইসরাঈলের জানে পানি নেই:

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْرُكُونَ قَالَ كُلُّا إِنَّ مَعِيَ نَبِيٍّ سَيَهْدِيكَ

তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল:

-এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব।

মুসা বললেন:

-কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক
আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন (৩'আরা ৬১-৬২)

একদল ভয়ে থরহরি কম্প। কিন্তু নেতা?

শত্রু একদম নাকের ডগায়! তবুও কী অটল বিশ্বাস! আমার রব আমাকে পথ
দেখাবেন! তার দিক-নির্দেশনাতে যেহেতু বেরিয়েছি, তিনিই ভালো জ্ঞানেন কী
করবেন! কী ঘটবে! আমার অস্থির হওয়ার কিছু নেই।

আমি বিপদে পড়লে কেন অস্থির হয়ে পড়ি? আমারও বলা উচিত নয়?

কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি
আমাকে পথ দেখাবেন!

গাধামানব

বকা দেয়ার সময় বলা হয় 'গাধা'। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে গাধার সাথে
তুলনা করেছেন। গাধার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

-নির্বুদ্ধিতা। মূঢ়তা। ভীকৃত্য।

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الثَّوَابَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أُنْفًا

যাদের ওপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা
সে ভার বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা,যে বহু কিতাব বয়ে
রেখেছে (জুম'আ ৫)

কেন ইহুদিদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হলো?

-কারণ গাধা তার পিঠে বোঝা বহন করে। কিন্তু বোঝাতে কী আছে সে জানে
না। বুঝতে পারা তো দূরের কথা। এছাড়াও তারা:

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর (এভাবে) জেনে শুনে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে (আলে

ইমরান: ৭৫)

তারা গাধার চেয়েও অধম। গাধা না বুঝে কিতাবের অবহেলা করে। ইহুদিরা
জেনেও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মিথ্যাচার করে। এই দুর্মতি শুধু যে
ইহুদিদের আছে তা নয়। কুরআন কারীমে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই ব্যাপক

অর্থবোধক। নির্দিষ্ট একটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিছক ইতিহাস বলা উদ্দেশ্য নয়। সমস্ত মানবজাতিকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য।

বর্তমানে ইহুদি ছাড়া আরও অনেকের মধ্যেও এই মন্দবৈশিষ্ট্য আছে। তারা জেনেও নে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য, কুরআনের আয়াতকে ব্যবহার করে। এক বিষয়ের আয়াতকে আরেক বিষয়ে জোর করে ব্যবহার করে। ইহুদিরা যেমন গাধা, বর্তমানের এই লোকেরাও যুগপৎ:

-ইহুদিম্বাবসম্পন্ন আর গাধা।

গুনাহের প্রভাব

গুনাহ করার অনেক খারাপ প্রভাব আছে। অন্তরে কাল দাগ পড়ে যায়। ইবাদতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। অন্তর থেকে ঈমানের মিষ্টতা দূর হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল:

لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاكُمْ بِنُورٍ مِنْهُمْ وَنُظِيعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের কোনো গুনাহের কারণে কোন মুসিবতে আক্রান্ত করতে পারি? এবং (যারা হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ করে না) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দেই, ফলে তারা কোনো কথা শুনতে পায় না (আরাফ ১০০)

গুনাহ করলে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়। কুরআন কারীমের তাদ্দাব্বুর নসীব হয় না। কুরআনের মর্মবাণী ধরা পড়ে না। কুরআনের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। আয়াত নিয়ে চিন্তা করার ইচ্ছাশক্তি থাকে না। কুরআন আর গুনাহগারের মাঝে অদৃশ্য এক দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়।

সর্বস্রোতা

একান্তে কানে হেডফোন লাগিয়ে কথা বলছি? কল আসার পর ছাদে চলে গেছি? কেউ শুনবে না?

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرَكُنَا

আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন (মুজাদালা: ১)

গোপন কথাও কি শুনি তিনি শুনছেন। দেখছেন। যতই ফিসফিস করে বলি, আল্লাহ শুনছেন। কাকে লুকিয়ে কথা বলছি?

শয়তানের প্রতিনিধি

অন্যদের কথা বাদ, মুসলমান নামধারীদের মধ্যেই অনেকে আছে, যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে: মার্কস-এঙ্গেল-লেনিন-মাও-এর রচনাবলী প্রচারে। তাদের ভাবাদর্শ-মতাদর্শ প্রচারে। লাল বিপ্লবের নিশান উড়াতে!

কেউ উৎসর্গ করেছে, টলস্টয়-ডিকেন্স-দস্তয়ভস্কিদের গল্প-উপন্যাস অনুবাদে। তাদের সাহিত্যকর্ম সবার কাছে পৌঁছে দিতে।

কেউ উৎসর্গ করেছে, ওয়ার্ডওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ-মায়াকোভস্কি-বোদলেয়ারের কবিতার নান্দনিক দিক সবার কাছে তুলে ধরতে!

এদেরকে এই কাজে কে বাছাই করেছে?

আল্লাহ তা'আলাও বাছাই করেন। কিভাবে?

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

অতঃপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি (ফাতির: ৩২)

আমাদের কারো কি মন চায় না:

-আমার জীবনটা উৎসর্গিত হোক, আল্লাহর তা'আলার 'কিতাবের' জন্য?

-আমার জীবনটা উৎসর্গিত হোক, মানুষকে ছাঁইপাশ সাহিত্য থেকে টেনে নিয়ে আল্লাহর কালামের কাছে নিয়ে আসার জন্য!

উপদেশদাতা

মাঝেমধ্যে দেখা যায় যেচে এসে উপদেশ দিচ্ছেন। তার ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তিনি আমার প্রতি খুবই আন্তরিক। আমার ভালো চেয়েই উপদেশ দিচ্ছেন। তবুও সতর্ক থাকা ভালো। এমন এক আন্তরিক (!) উপদেশদাতাকে বিশ্বাস করার কারণেই আজ আমাদের এই অবস্থা!

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَلِي

আমি কি তোমাকে এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজত্ব লাভ হয়, যা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না? (তুহা ১২০)

কী চমৎকার ভঙ্গি! কী লোভনীয় নসীহত! শুনতে কার না ভালো লাগে! সরাসরি উপদেশও দিচ্ছে না! ভাবটা এমন, আমার বলার দরকার তাই বললাম। গ্রহণ

করা না করা তোমার ব্যাপার! কিন্তু এই মধুমাখা ভঙ্গির ভেতরেই যে কী বিষ লুকিয়ে ছিল, তার পরিণতি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! নইলে আমার এখন জান্নাতের 'ছর' নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটানোর কথা, সেখানে আমি সৌদি-কাতারের অর্থায়নে পরিচালিত মার্কিন বিমান হামলায় শহীদ হওয়া মসুলের শতশত শিশুর জন্য কাঁদছি!

সুতরাং কেউ নসীহত করতে এলেই মুখস্থ তাকে ভালো মানুষ ঠাউরে বসবো না! একটু যাচাই করে নেব!

অপহৃদের বিষয়

দ্বীনের কিছু বিষয় আছে, ব্যক্তিগত কারণে হোক বা সামাজিক কারণে হোক, সে বিষয়গুলোকে কেউ কেউ অপহৃদ করেন। ঠিক অপহৃদ না করলেও বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। অস্বস্তি বোধ করেন। মনে করেন, এটা নিয়ে আলোচনা যত কম করা যায়, ততই ভালো। এমনটা করা বা ভাবা গুনাহ। এ-ধরনের মানসিকতা কখনো বান্দাকে কবীরা গুনাহের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। কখনো কুফর পর্যন্ত:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ

তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপহৃদ করেছিল।

সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন (মুহাম্মাদ ৯)

এমনি একটা বিষয় হলো, একাধিক বিয়ে। এখন নতুন ধারা শুরু হয়েছে, বক্তব্যের ধারা বদলে গেছে:

-আমি অপহৃদ করি না, কিন্তু একাধিক বিয়ে করা ফরজ নাকি ওয়াজিব? এটা একটা মুবাহ কাজ! একাধিক বিয়ে করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে! সুতরাং এটা নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভালো!

কিন্তু নাড়াচাড়া না করতে করতে, এই মুবাহ (বৈধ) বিষয়কে যে ঘৃণা করতে শুরু করেছে মানুষ, তার সমাধান কী? এই ঘৃণা করাটাই কখনো কবীরা গুনাহ, কখনো কুফরি। এই ভ্রান্তি তো দূর করা দরকার!

না হলে, কিছু মানুষ জানবে, একাধিক বিয়ে করা খারাপ। ইসলামে এই খারাপ বিষয় থাকতে পারে না। এ-ধরনের লোককে কুফর বা কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচাতেই এসব আলোচনা বেশি বেশি করা দরকার!

একাধিক বিয়ে করা জরুরী কিছু নয়। কিন্তু একাধিক বিয়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা প্রচারণাকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা জরুরী।

বালা-মুসিবত

আমার ইচ্ছামতো কিছুই হয় না। আল্লাহ তা'আলা যা চান, সেটাই হয়। এর ব্যতিক্রম কিছুই হয় না। বালা-মুসিবত, বিপদাপদও তার পক্ষ থেকেই আসে। এজন্য দুঃসময় এলে ঘাবড়ে যেতে নেই।

يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

কোনো সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন (তালাক ৭)

যখন সময় হবে আমি শত চেষ্টা করেও দুর্যোগ-দুর্দশাকে ধরে রাখতে পারবো না। আমি যদি কুরআনে বিশ্বাস করি, তাহলে শত কষ্টেও হাল ছেড়ে দেয়ার কথা নয়। পৃথিবীর সমস্ত শোকতাপও যদি আমার অন্তরে চেপে বসে, এই আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, শোকের লেশমাত্রও থাকার কথা নয়।

আল্লাহ যখন আমাকে বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করতে চাইবেন, পুরো বিশ্ব মিলেও আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আবার যখন তিনি সংকট দূর করে দেয়ার ফায়সালা করবেন, জগতের সমস্ত পরাশক্তি মিলেও, সমস্যাটা ধরে রাখতে পারবে না।

সংকট থাকলে, আল্লাহ তা'আলা তার পরে সুদিন নিয়ে আসেন-ই। এটা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি। আয়াতটা আমাকে এই শিক্ষাই দেয়।

লাগাম

কোনো কিছুতেই লাগাম ছাড়া হওয়া ঠিক নয়। মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। না বন্ধুত্বে না শত্রুতায়। বলা যায় না, দিন কখন বদলে যাবে, আমি জানি!

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً

অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন (মুমতাহিনাহ ৭)

সম্পর্ক আজ খারাপ তো কাল ভালো হবে না, এই গ্যারান্টি কে দিল? আজ ভালো হলে কাল খারাপ হবে না, এমন নিশ্চয়তাই-বা কোথায়? এই আয়াত আমাকে বলছে:

(ক). কারো সাথে যতই গভীর বন্ধুত্ব হোক, তার কাছে সবকিছু উজাড় করে দিও না। সব রহস্য ফাঁস করে দিও না। তার মানে এই নয়, ভেতরে এক বাইরে আরেক।

(খ). কারো সাথে যতই শত্রুতা থাকুক, আক্রোশ মেটাতে গিয়ে এমন বেপরোয়া কিছু করে ফেলো না, যাতে ভবিষ্যতে লজ্জিত হতে হয়। দু'জনের মাঝে অনুকূল সম্পর্ক তৈরি হওয়ার উপলক্ষ্য আসবেই না, এটা আগাম বলা যায় কী করে? শত্রু হোক বন্ধু হোক, মহব্বতে ও ঘৃণায় ইনসাফ ও ভারসাম্য রাখা জরুরী।

নারীর বৈশিষ্ট্য

একজন নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? কুরআন কারীমে দেখা যাক:

فَجَاءَتْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

কিছুক্ষণ পর সেই দুই নারীর একজন লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে তার (মুসার) কাছে এল। (কাসাস ২৫)

আল্লাহ তা'আলা হাইট-উচ্চতা নিয়ে কিছু বলেন নি, গঠন-আকৃতি বর্ণনার দিকেও যান নি! রঙ কেমন তাও বলেন নি। বরং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাই পরিষ্কার করে বলেছেন। একজন নারীর হায়া (الحياء)-ই যদি না থাকল, আর রইল কী?

প্রিয় বস্তু!

ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে শর্ত কি? আমার জানমাল, ইজ্জত-আবরু সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল প্রিয় হওয়া। আমি পুণ্যের কাজ করি। কিন্তু পুণ্যের নাগাল কি পাই? নাগাল পাওয়ার উপায় কি?

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্যে) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত (আলে ইমরান ৯২)

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, পুণ্যের নাগাল পেতে হলে প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে হবে। আমি কি প্রিয় বস্তু ব্যয় করি বা করার হিম্মত রাখি? নাকি পকেটের সবচেয়ে ছেঁড়া নোটটা বের করি? জীবনে অন্তত একবারের জন্যে হলেও, সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটা আল্লাহর রাস্তায় 'সাদাকা' করা উচিত। খালেস নিয়তে একবার এই কুরআনি আমল করতে পারা মানে? আমি পুণ্যের নাগাল পেয়ে গেলাম। যদি রাব্বের কারীম আমলটা দয়া করে কবুল করে নেন তাহলে! বলাবাহুল্য জীবনে একবারও যদি 'খাঁটি' পুণ্যের নাগাল পেয়ে যাই, বলা যায় না, এই একটা আমলই, সেদিন আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে!

বিবি ও রুজি!

আল্লাহ তা'আলা অবিবাহিত দাসদাসীকে বিয়ে করিয়ে দিতে বলেছেন। বিয়ের উপযুক্ত হলে আর দেবী করা ঠিক নয়। তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিলে, রিযিকের ভয়? আল্লাহ তা'আলা এর জবাব দিচ্ছেন,

لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। (নূর ৩৩)

এটা কুরআনি আশ্বাস। আল্লাহর ওয়াদা। বিয়ের পর দারিদ্রের ভয় থাকবে না। বিয়ে বা বিবি মানেই রিযিক। যত বিবি তত রুজি। বিবি বাড়ার সাথে সাথে রিজিকও বাড়তে থাকবে। প্রথম বিবি যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক নিয়ে আসবে, পরের বিবিরূপে নিজের রিযিক নিয়ে আসবে। সূরা নিসার বিখ্যাত আয়াতে বলা হয়েছে,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে।

একাধিক বিয়ে করলে, বেইনসাফের আশংকা থাকলে?

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অবশ্য যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা তাদের (মানে স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে (ক্ষান্ত থাক)

আমরা বলতে পারি, এক বিবি হোক আর একাধিক বিবি হোক, রিযিকের ঘটতির ভয় নেই। বিয়ের সাথে দারিদ্রের সম্পর্ক নেই বরং বিয়ের সাথে রিযিকের সম্পর্ক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

ذَلِكَ أَتَىٰ أَلَّا تُعْلُوا

এতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশি।

এটা ছিল (أَلَّا تُعْلُوا)-এর সর্বজনমান্য অর্থ। এছাড়া আরেকটা অর্থও আল্লামা সুয়ুতী রহ. তার বিখ্যাত তাফসীরে, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন,

ذٰلِكَ اٰذَنُیْ اَلَا تَعْمَلُوْا

এতে তোমাদের দরিদ্র না হয়ে যাওয়ার (اَلَا تَفْقَرُوْا) সম্ভাবনা বেশি।

মানে বিয়ে করলে দরিদ্র হবে না। সূরা নূরে জানলাম, বিয়ে করলে, রিয়িকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিবেন। সূরা নিসায় জানলাম, বিয়ে করলে গরীব না হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং এই প্রশ্ন অবাস্তব,

'বিয়ে করলে বউ চালাব কী করে?'

এমন প্রশ্ন করা কুরআন বিরোধী কাজ।

আরেকটা বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার, পক্ষপাত না করা বা দরিদ্র না হওয়ার বিষয়টা, আয়াতের সর্বজনমান্য অর্থে এক বিবিকে বিয়ে করা বা দাসীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু (ذٰلِكَ) থেকে যদি এক বিবি বা দাসী উদ্দেশ্য না নিয়ে, নিকাহ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তখন অর্থ দাঁড়াবে, বিয়ে করলে, তোমাদের দরিদ্র না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।